অগ্রযাত্রায় নারী

সংখ্যা-৩০ • বর্ষ-৮

প্রত্যয়
অক্টোবর ২০২২-মার্চ ২০২৩ • সংখ্যা-৩০ • বর্ষ-৮

উপদেষ্টা সম্পাদক
জাকির হোসেন

সম্পাদকমণ্ডলী
প্রশেন চন্দ্র বণিক
ফারমিনা হোসেন

সম্পাদক
ফেরদৌস সালাম

নির্বাহী সম্পাদক
বিদ্যুত খোশনবীশ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোস্তাফিজ কারিগর

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
শাহ আবুল কালাম আজাদ

যোগাযোগ
khoshnobish@burobd.org
01318 230552
01977 220550

www.prottoybd.com

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক
বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন (এফ),
সড়ক-১০৪, গুলশান-২,
ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

সৌজন্য মূল্য : ১০০ টাকা

সম্পাদকীয়

নারীই হবে উন্নয়নের প্রধান শক্তি

স্বাধীনতার বাহান্ন বছরে বাংলাদেশ দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করে ক্রমাগত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই উন্নয়নের পেছনে নারী সমাজের অবদান অনেকখানি। বিশেষ করে নারী তার শ্রমের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে আসছে। নারীরা যতোই শিক্ষিত ও কর্মশক্তিতে পরিণত হচ্ছে দেশ ততোই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাড়ছে নারীর ক্ষমতায়ন, কমছে দারিদ্র্যের হার। বর্তমানে দেশে দারিদ্র্যের হার ২০% এর নিচে নেমে এসেছে। গত কয়েক দশকের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক তৈরি পোশাক শিল্পে নারীর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ ছাড়াও কৃষি, সেবা খাত, খামারবহির্ভূত কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নারীর বলিষ্ঠ ভূমিকা জাতীয় অর্থনীতিকে আরো বেগবান করেছে। অবশ্য আবহমানকাল ধরে নারীরা গৃহস্থালি কর্মে যে অবদান রেখে চলেছে তা অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখলেও অর্থনীতি এবং সামাজিক মানদণ্ডের বিচারে এখন পর্যন্ত অস্বীকৃত ও অপ্রদর্শিত। জাতীয় আয়ে নারীর ভূমিকা প্রায় ২৫% ধরা হয়ে থাকে। গৃহকর্মে নারীর এই অবদানের অর্থনৈতিক মূল্য ধরা হলে তাদের ভূমিকা ৫০% এরও বেশি হবে তাতে সন্দেহ নেই।

তবে বাংলাদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে নারীদের অবদান অধিক গুরুত্বপূর্ণ তারা হলেন এনজিও/এমএফআইয়ের সদস্য এবং ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা নারী। গ্রামীণ স্বল্পশিক্ষিত এই নারীরা ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে রাখছেন বিশেষ অবদান। যে নারীরা একসময় ছিলেন হতদরিদ্র-পরিবার ও দেশের বোঝাস্বরূপ, সেই নারীরাই এখন কর্মশক্তিতে পরিণত হয়েছে। তারা আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেরাই শুধু স্বাবলম্বী হননি, জাতীয় উৎপাদনেও অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এই নারীরাই পরিবারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নত পরিবেশের মাধ্যমে বদলে দিচ্ছেন সামাজিক জীবনযাত্রা। এভাবেই দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছে বলেই দেশের অবস্থান এখন উন্নয়নের সিঁড়িতে। অর্থাৎ সরকারের কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি দেশের বেসরকারি শিল্প খাত, প্রবাসী রেমিটেন্স ও বেসরকারি উন্নয়ন খাতের ভূমিকা দেশকে স্থিতিশীল উন্নয়ন এনে দিয়েছে। এমএফআই খাতের মাধ্যমে দেশের প্রায় ৩ কোটি ৩০ লাখ পরিবার আর্থিক সেবার আওতায় এসেছে। যাদের মধ্যে ৯৩% নারী। ফলে লাখ লাখ নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। আশা করা যায়, ২০৩৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বে ২৪তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে। এক্ষেত্রেও নারীর ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। আয়তনে ছোট এ দেশটির অধিক জনসংখ্যা একসময় ছিল এ দেশের জন্য অভিশাপ। কিন্তু আজ এই জনসংখ্যাই জনসম্পদে পরিণত হতে চলেছে। অতীতে গৃহস্থালির কর্ম ছাড়া নারীরা অর্থনৈতিক কাজের সাথে সেভাবে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ পায়নি। স্বামীর আয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যয়ভার নির্বাহ হতো। এতে দরিদ্র মানুষ আরো হতদরিদ্র হয়ে পড়তো। কিন্তু এই নারীরা যখন থেকে কাজের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে সক্ষম হয়েছে তখন থেকেই দেশের উন্নয়নের চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। এতে পুরুষরা যেমন ভূমিকা রাখছে, তেমনি নারীরাও। কর্ম এবং শিক্ষা-দীক্ষা কোনো ক্ষেত্রেই এখন নারীরা পিছিয়ে নেই। দেশের রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব ও কার্যক্রম থেকে শুরু করে প্রশাসনেও নারীরা আছেন স্বমহিমায়। সচিব থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সব পেশায় নারীর রয়েছে শক্ত অবস্থান। উদ্যোক্তা হিসেবেও শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি আইটি প্রফেশনেও এখন নারীর জয়জয়কার। দেশে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদে নারীরা কর্মরত। সরকারি চাকরিজীবী ১৫ লাখ ৫৪ হাজার ৯২৭ জনের মধ্যে ৪ লাখ ৪ হাজার ৫৯১ জনই নারী। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলর পদে নারী, ব্যাংকিং সেক্টরে নারী ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সেনাবাহিনীতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, পুলিশ প্রশাসনে অতিরিক্ত আইজিপিসহ এমন কোনো কর্ম পেশা নেই যেখানে নারীর অবস্থান নেই। এমনকি বেসরকারি উন্নয়ন খাতের শীর্ষপদসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীরা দায়িত্ব পালন করছেন। নারীরা এভাবে এগিয়ে যেতে সক্ষম হলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে নারীরাই হবে উন্নয়নের প্রধান শক্তি– এটি নিশ্চিত করে বলা যায়।

বুরো বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রত্যয় দেশের বেসরকারি উন্নয়ন খাতের মুখপত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। আমরা আশা করি দেশের সব পর্যায়ের এনজিও/এমএফআই তাদের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের তথ্যনির্ভর চিত্র প্রত্যয়ে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করবেন। এ সংখ্যায় দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, বেসরকারি উন্নয়ন খাতের প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ নারী নির্বাহীবৃন্দসহ নারী রাজনীতিবিদ, ব্যাংকার ও উদ্যোক্তারা সাক্ষাৎকার প্রদান করে প্রত্যয় টিমকে সহযোগিতা করেছেন– তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

অগ্রযাত্রায় নারী

ফেরদৌস সালাম

পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র– কোথাও নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। উন্নয়ন তো বড় বিষয়, স্বাভাবিক জীবনযাপনও নারীর কার্যক্রম ছাড়া অসম্ভব। এমনকি বিশ্বের কথা চিন্তা করলেও একই বাস্তবতা উঠে আসে। বাস্তবতার এই পর্যবেক্ষণ থেকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম যথার্থই লিখেছিলেন, 'বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।'...

এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশসহ দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নয়নে নারীদের এই সহযাত্রাকে খুব একটা ধারণ করা হয়নি বা এখনো তার যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় না। বরং তাদের নানাভাবে পিছিয়ে রাখা হয়েছে। এমনকি নারীকে অনেক ক্ষেত্রে মানুষ না ভেবে শুধু নারী হিসেবেই মূল্যায়ন করা হয়েছে দীর্ঘকাল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের মতো নারীদের অংশগ্রহণ ব্যাপক হলেও তাদের অবদান অনেকটা তিমিরে রাখা হয়েছে। দেশব্যাপী মুক্তিযোদ্ধাদের তারাই আশ্রয় দিয়েছেন, স্নেহ-মমতায় খাবার তুলে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু গল্প-উপন্যাস, সিনেমা-নাটকে কিছু বর্ণনা ছাড়া তাদের সেই স্বীকৃতি এখনো তাদের ছোঁয়নি।

স্বাধীনতার ৫২ বছর অতিক্রান্ত। এই সময়ে দেশের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি। বেড়েছে শিক্ষার হার। দেশে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি শিল্প কারখানা বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে এবং তা চলমান ধারায় রয়েছে। এই উন্নয়নের পেছনে দেশের নারী সমাজের অবদান বিশাল। প্রসঙ্গত একটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি– এই নিকট অতীতেও গ্রামীণ দরিদ্র একজন নারী আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ছিলেন অতি অসহায়। তার কোনো নিজস্ব মতামত দেয়ার স্বাধীনতা ছিল না। গৃহস্থ কর্ম ছাড়া অর্থনৈতিক কর্মশক্তি হিসেবে তার কাজ করার কোনো যোগ্যতা বা সুযোগই ছিল না। ফলে সে ছিল সমাজের বোঝাস্বরূপ। কিন্তু আজকের মূল্যায়নে সেই নারীই এখন এক বড় অর্থনৈতিক শক্তি। তার এই অর্জনের পেছনে সরকারের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া থাকলেও বেসরকারি উন্নয়ন খাতের ভূমিকাও অনেক।

নারীর ক্ষমতায়ন

যে নারীরা ছিলেন অসহায়, শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ-সচেতনতায় অনেক পিছিয়ে, ছিলেন পরিবারের পিতা, স্বামী বা ভাইয়ের উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল- এখন তারা নিজেরাই কর্মপেশার সাথে যুক্ত। নিজেরাই এখন পেশাজীবী। একসময় তারা ছিলেন পরজীবী, এখন নিজেরাই অর্থনৈতিক শক্তি। ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়নের সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ, দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এই নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন চিন্তাই করা যায় না। আশার কথা, নারী সমাজের এক বিশাল অংশ ইতিমধ্যে নিজেরা কর্মক্ষম হিসেবে যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মপেশায় আত্মনিয়োগ করাতেই দেশ ক্রমাগত উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে।

পেশাজীবী হিসেবে নারীরা চিকিৎসক, কৃষিবিদ, প্রকৌশলী, সরকারি আমলা অর্থাৎ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যাংকার, শিক্ষাবিদ, বিমান চালক, সেনা কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মকর্তা, শিল্প শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, এনজিও অর্থাৎ

বেসরকারি উন্নয়ন খাতের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সর্বত্রই রয়েছেন। এমনকি দেশের সর্বশেষ উন্নয়ন অবকাঠামো মেট্রোরেলের চালক হিসেবেও দুজন নারী বাংলাদেশের উন্নয়ন পথযাত্রায় নারীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার সুযোগ পেয়েছেন। একটি কথা বাস্তব সত্য যে, নারীর ক্ষমতায়ন যতো বৃদ্ধি পাবে দেশে ততো বেশি শিক্ষার হার বাড়বে, কুসংস্কার দূর হবে, বাল্যবিবাহ রোধ হবে, সাম্প্রদায়িক শক্তির বিনাশ ঘটবে এবং দেশ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে।

বন্দি গৃহলক্ষ্মী থেকে কর্মলক্ষ্মী

একসময় নারীকে বলা হতো গৃহলক্ষ্মী। তাদের সীমানা ছিল গৃহেই অবরুদ্ধ। স্বাধীনতাপূর্ব বা তৎপরবর্তী দীর্ঘসময় এ দেশের নারীদের শতকরা ৯৫ জনই ছিল অবরোধবাসিনী। একই পরিবারে ভাইবোনেরা একসাথে বড় হতে হতে হঠাৎ করেই দেখা যেতো বোনটি স্কুলে যাওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। অবরুদ্ধ হয়ে গেছে নিজ বাড়ির ভেতর আঙিনার মধ্যেই। এরপর বিয়ে, বিয়ের পর স্বামীর বাড়িতে বন্দি। এমনও দেখা গেছে, বিয়ের সময়ে নতুন বৌকে পালকি বা ডুলিতে তুলে কঠিন পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখায় নিশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ায় অনেকের পালকি বা ডুলিতেই মৃত্যু ঘটেছে। অর্থাৎ নারীকে পর্দানশীন করতে গিয়ে কিংবা তথাকথিত ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে রাখতে গিয়ে তার পায়ে দেয়া হতো পরাধীনতার শেকল।

স্বাধীনতার পর দেশের নারী সমাজকে গৃহের বাইরে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ যেমন ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে তেমনি বেসরকারি খাতের ভূমিকাও অনেক। একসময় কেয়ার বাংলাদেশ, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, প্রশিকা বাংলাদেশসহ বেসরকারি উন্নয়ন খাতের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা যখন ঘরের বাইরে আসা শুরু করলেন, তখন অনেক এলাকায় ধর্মান্ধ পশ্চাৎপদ মানুষ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের ফতোয়াবাজির শিকার হয়ে অনেক গৃহবধূকে ঘর ছাড়া হতে হয়েছে। অপমানে অনেক নারীকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে হয়েছে। পরবর্তীতে সরকার এবং বেসরকারি উন্নয়ন খাতের সমাজ সচেতনতা কার্যক্রমের ফলে এর আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মেয়েরা ছেলেদের মতোই স্কুলে পড়ার স্বাধীনতা পায়, নারীরা লাভ করে কাজ করার সুযোগ।

মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা নারীদের বন্দি গৃহলক্ষ্মী থেকে জাতীয় কর্মলক্ষ্মীতে পরিণত হবার সুযোগ এনে দিয়েছে। এর ফলেই দেশের উন্নয়নে নারীর অবদান প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এমনকি শিক্ষাবঞ্চিত নারীরাও নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী পোশাক শ্রমিক থেকে শুরু করে বেসরকারি উন্নয়ন খাতের সহায়তায় আত্মকর্মসংস্থানসহ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হবার সুযোগে দেশের উন্নয়নে রাখছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

মানব ইতিহাস : নারীই প্রথম কৃষি শ্রমিক

বিকাশমান মানব সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় নারী ও পুরুষের মধ্যে নারীই প্রথম কৃষিকাজের সূচনা করে। তখন পুরুষরা শিকার করতো। কিন্তু এক পর্যায়ে বিশ্বের দেশে দেশে সমাজব্যবস্থায় পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে অর্থাৎ সমাজ হয়ে পড়ে পুরুষতান্ত্রিক এবং নারী বৈষম্যের শিকার হয়। যদিও এ দেশসহ অনেক দেশে কিছু আদিবাসী এবং গোত্র এখনো নারী প্রধান সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থাও মূলত পুরুষতান্ত্রিক। এই সমাজব্যবস্থার মধ্যে নারীরা নানা দিক থেকে পিছিয়ে থাকলেও উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা বিশাল। এ দেশে নারী শ্রম শক্তির পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি। এর মধ্যে প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনায় ১০ হাজারের বেশি যুক্ত। ৮০ শতাংশে মৎস্য, বনায়ন ও কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সাথেও ৩৪% নারী কর্মযুক্ত রয়েছে। তবে দেশের অর্থনীতির মূল স্রোতধারা পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে ৮০% নারী।

একটি কথা আজ স্পষ্ট যে, এ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এটি বাস্তব যে, দেশে নারীর যতো বেশি উন্নয়ন ঘটছে, দেশের উন্নয়নও ততো গতিশীল হচ্ছে। শুধু শহরাঞ্চলের শিক্ষিত নারীরাই নয়, গ্রামের তৃণমূল পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন নারীরাও এখন অর্থনৈতিক শক্তি। তারা শুধু গৃহস্থালি কাজের সাথেই যে যুক্ত তাই নয়, মূল ধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথেও জড়িত। গত কয়েক দশকে শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যহারে বেড়েছে।

বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাব অনুযায়ী ৪২.৫ মিলিয়ন পুরুষ শ্রমবাজারের সাথে যুক্ত, যেখানে নারীর সংখ্যা ১৮.২ মিলিয়ন। ১৯৭৪ সালে দেশে কর্মক্ষেত্রে নারী ছিল মাত্র ৪ শতাংশ। এই হার ১৯৮০ সালের দিকে ৮ শতাংশে ও ২০০০ সালে ২৩.৯ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। তবে শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার ২০১০ সালে দাঁড়ায় ৩৬ শতাংশে। বিবিএস এর পরিসংখ্যানে ২০১৬-১৭ সালের শ্রমশক্তির জরিপে নারীর অংশগ্রহণের হার ৩৬.৩ বলা হয়েছিল। ওই জরিপ অনুযায়ী সে সময় দেশে শ্রমশক্তির আকার ছিল ৬ কোটি ৩৫ লাখ। এর মধ্যে ৬ কোটি ৮ লাখ মজুরির বিনিময়ে কাজ করতো। মোট শ্রমশক্তিতে সে সময় ৪ কোটি ২২ লাখ পুরুষ আর নারী ছিল ১ কোটি ৮৭ লাখ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ২০১৯ সালে তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের হার ৩৮ শতাংশে যা পাকিস্তানে ২৩ শতাংশ। এভাবেই বাংলাদেশের শ্রমবাজারে নারীর সরব উপস্থিতি দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কাবিখা : মাঠ কর্মে নারীর অংশগ্রহণ

স্বাধীনতার পর থেকে দেশের শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারীরা ছাড়া দেশের বাঙালি নারীরা সাধারণত মাঠে কাজ করতেন না। সময় বদলেছে। গ্রামের দরিদ্র নারীরাও এখন সড়কে মাটি কাটার কাজ থেকে শুরু করে শস্যক্ষেত্রে কাজ করছেন। বিশেষ করে আশির দশকে সরকারের কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) এর মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র নারীরা পুরুষদের পাশাপাশি কাজ করার সুযোগ পায়। দলবদ্ধভাবে এসব নারী শ্রমিকরা শুধু সড়কের মাটি কাটার কাজেই নন, এখন তারা ক্ষেত-খামারেও শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন।

কর্মপেশায় প্রায় ২ কোটি নারী

বিবিএসের জরিপ অনুযায়ী কৃষি, শিল্প ও সেবা অর্থনীতির বৃহত্তর এই তিন খাতে কাজ করছেন প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ নারী। তবে উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও নারী কর্মীদের অধিকাংশই শ্রমজীবী। এর বাইরে শিক্ষকতা, চিকিৎসা, ব্যাংকিং, এনজিও খাত, সরকারি চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন পেশায় যুক্ত। এমনকি নারীরা এখন পুলিশসহ বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানে শীর্ষ নির্বাহীসহ বিভিন্ন উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে শ্রমবাজারে নারীদের এক বিশাল অংশ কৃষিকাজে সম্পৃক্ত- যারা ফসল প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। এর পাশাপাশি দেশের গার্মেন্টস শিল্প খাতের নারী শ্রমিকদের অবস্থান প্রায় ৮০%।

তবে উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলেও অধিকাংশই পেশানুসারে শ্রমজীবী। কিছু আছেন শিক্ষকতা, চিকিৎসা, ব্যাংকিং, এনজিও খাতে ও ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত।

মূলত বিশ্বে কৃষির সূচনা নারীর হাতেই। বাংলাদেশেও নারীরা কৃষি উৎপাদনের সাথে শুরু থেকেই জড়িত। একজন চাষি মাঠে যেমন ফসল ফলায়, সেই ফসল বাজারজাত এবং খাদ্যে পরিণত করতে গৃহের নারীদের অবদান ব্যাপক। অন্যদিকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারীরা সমতল ও পাহাড় উভয় স্থানেই মাঠ পর্যায়ে উৎপাদনের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে থাকে।
কিন্তু নারীদের এই শ্রম দেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে যোগ হলেও তাদের শ্রমের জন্য কোনো বেতন বা শ্রমমূল্য পরিশোধ করতে হয় না। বিবিএসের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে সরাসরি আয়মূলক কাজে জড়িত নারীর সংখ্যা ৩৬ শতাংশ আর গৃহস্থালির কাজ করা ৬৪ শতাংশ নারীকে শ্রমশক্তি হিসেবে ধরা হয় না।

বেসরকারি উন্নয়নে নারী জাগরণ

স্বাধীন হবার পর থেকে দেশের শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। এর পেছনে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর ভূমিকা অনেক। শুরুতে কেয়ার বাংলাদেশ নামের একটি এনজিও এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজের সুযোগ পায়। কেয়ারে কর্মরত নারীরা মোটরবাইকে গ্রামে গ্রামে যেতো। এ নিয়ে ধর্মান্ধরা সমালোচনা করতো। বলা যায়, তাদের এই কার্যক্রম কর্মপেশায় দেশের নারী জাগরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যেমন ব্র্যাকের আশাজাগানিয়া নারীদের উপস্থিতি কার্যকর হয়েছে।

গত ৫২ বছরে নারীরা দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন। অফিস-আদালতে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে কলকারখানার শ্রমিকসহ বিদেশের মাটিতেও এ দেশের নারীরা কাজ করছে। আয় করছে বৈদেশিক মুদ্রা। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) এক গবেষণায় বলা হয়েছে, মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) নারীর অবদান ২০ শতাংশ। তবে সংসারের ভেতর ও বাইরের কাজের মূল্য ধরা হলে নারীর অবদান দাঁড়ায় ৪৮ শতাংশে। এর অর্থ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের অবদান প্রায় সমান সমান।

সরকারের সচিব, ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তা, এনজিও খাতের শীর্ষ নির্বাহীসহ সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়েও নারীরা রয়েছেন। তবে কর্মজীবী নারীদের বিশাল অংশ কৃষি ও পোশাক শিল্পের শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন।

দেখা যায় প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ের ৭.৬ শতাংশ নারী আছেন। তবে উপসচিব পর্যায়ে নারীর সংখ্যা ১ শতাংশেরও কম। দেশের সরকারি ও আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত পদের অনেকগুলোই এখনো শূন্য রয়েছে।

তৈরি পোশাক খাত চালাচ্ছে নারীরা

শিল্পায়নে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বিশেষ করে পোশাক শিল্প খাত বাংলাদেশকে বিশ্বের শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলোর কাতারে এনে দিয়েছে। একসময় বাংলাদেশ ছিল কৃষিনির্ভর অর্থনীতির দেশ। শিল্প বলতে ছিল হাতে গোনা কয়েকটি শিল্প কারখানা। তাও পাকিস্তানি শিল্পগোষ্ঠীর ফেলে যাওয়া আদমজী, বাওয়ানীর মতো কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা মূলত হোসিয়ারি ও শাড়ি, লুঙ্গি তৈরি করতেন। স্বাধীনতার পর দেশের শিল্প খাত বিস্তৃত হতে থাকে। আশির দশকে দেশে পোশাক শিল্পের ইন্ডাস্ট্রি বাড়তে থাকে। আর এই শিল্পে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ পান প্রত্যন্ত গ্রামের অশিক্ষিত স্বল্প শিক্ষিত

নারীরা। কাজের মাধ্যমেই দক্ষতা অর্জন করেন তারা। তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশের ফলে কয়েক বছরের মধ্যে অর্থনীতির চেহারা অনেক পাল্টে যায়। বর্তমানে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) পোশাক খাতের অবদান ১১.১৭ শতাংশ। ৪০ লাখেরও বেশি শ্রমিক এই সেক্টরের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৩ শতাংশই আসে পোশাক খাত থেকে।

প্রবাসেও নারী কর্মী

বাংলাদেশের লাখ লাখ নারী প্রবাসে কর্মরত। পোশাক শিল্পের পরই এসব নারীরা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ২০১৯ সালে ১০৪৭৮৬, ২০২০ সালে মহামারির মধ্যেও ২১৯৩৪ জন নারী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজের সন্ধানে বিভিন্ন দেশে গেছেন। ২০২১ সালে ৮০১৪৩ জন নারী কাজ নিয়ে বিদেশে গেছেন। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ১৯৯১ সাল থেকে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৯৩৫৪৬৬ জন নারী কাজ নিয়ে প্রবাসে গেছেন। পুরুষদের তুলনায় মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে মেয়েদের প্রবাসে গমন ব্যয় কম, তাই বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি নারীরা অধিক হারে যাচ্ছেন। নারী শ্রমিক বেশি হওয়ার রেমিটেন্সের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

> দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অঙ্গনে বৃহৎ শিল্পের উদ্যোক্তা হিসেবে নারীর সংখ্যা অল্প হলেও দেশে অসংখ্য নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা রয়েছেন। তারা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। বৃহৎ শিল্পের উদ্যোক্তা নারীদের মধ্যে বেশ কজন আছেন গার্মেন্টস শিল্প খাতের। জাহাজ শিল্প ও ওষুধ শিল্পেও রয়েছেন বেশ কজন। তবে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তারা ছড়িয়ে আছেন দেশব্যাপী। বিশেষ করে বেসরকারি উন্নয়ন খাতের সহায়তায় দেশে এখন ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা অর্ধ লক্ষাধিক– তারা হাঁস-মুরগির খামার, গবাদি পশুর খামার, মৎস্য খামারসহ ছোটখাটো কারখানা গড়ে তুলেছেন।

রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) তাদের গবেষণায় জানিয়েছে করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যেও বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড প্রায় ৪ হাজার কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছিল এবং এ সময় নারী শ্রমিকরা মোট বৈদেশিক মুদ্রার ৬৯ শতাংশ পাঠিয়েছেন, যেখানে পুরুষ কর্মীরা পাঠিয়েছেন ৩০ শতাংশ।

চা শিল্পে নারীদের অবদান

বাংলাদেশের চা শিল্প খাত একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শিল্প। এই শিল্প খাত মূলত নারী শ্রমিকনির্ভর। সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই চা বাগানে নারী শ্রমিকের সংখ্যাই অধিক। বর্তমানে চা বাগানগুলোতে ১ লাখ ২২ হাজারের অধিক শ্রমিক কাজ করে যাদের ৭০ ভাগই নারী।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সার্ভে অব ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ (এসএমআই ২০১৯) জরিপ মোতাবেক বড় আকারের শিল্প কারখানায় পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় এখন নারী শ্রমিকের সংখ্যাই অধিক। এসব কারখানায় শ্রমিকদের প্রায় ৫৫ নারী। এ খাতে শ্রমিকদের ৫৯ শতাংশ স্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করেন এবং এই স্থায়ী শ্রমিকদের ৬৩.২৪ শতাংশ নারী। বর্তমান সময়ে শিল্পে নারীদের অংশগ্রহণ আরো বাড়ছে।

কৃষি খাতে নারী

মূলত বিশ্বে কৃষির সূচনা নারীর হাতেই। বাংলাদেশেও নারীরা কৃষি উৎপাদনের সাথে শুরু থেকেই জড়িত। একজন চাষি মাঠে যেমন ফসল ফলায়, সেই ফসল বাজারজাত এবং খাদ্যে পরিণত করতে গৃহের নারীদের অবদান ব্যাপক। অন্যদিকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারীরা সমতল ও পাহাড় উভয় স্থানেই মাঠ পর্যায়ে উৎপাদনের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে থাকে।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের হিসাব অনুযায়ী দেশে মোট কর্মক্ষম নারীর মধ্যে কৃষিকাজে নিয়োজিত নারীর সংখ্যা ৭১.৫ শতাংশ। তবে এসব নারীরা অধিকাংশই স্বামী বা শ্বশুরের জমি সংশ্লিষ্ট উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। যেমন একজন নারী ধান-গমের বীজ সংরক্ষণ থেকে শুরু করে সেই ধান কেটে আনার পর মাড়িয়ে থেকে ধান ছাড়ানো, ধান সিদ্ধ করা, রোদে শুকাতে দেয়া, বাজার উপযোগী করা ইত্যাদি সব কাজই করে থকে। কিন্তু নারীদের এই শ্রম দেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে যোগ হলেও তাদের শ্রমের জন্য কোনো বেতন বা শ্রমমূল্য পরিশোধ করতে হয় না। বিবিএসের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে সরাসরি আয়মূলক কাজে জড়িত নারীর সংখ্যা ৩৬ শতাংশ, আর গৃহস্থালির কাজ করা ৬৪ শতাংশ নারীকে শ্রমশক্তি হিসেবে ধরা হয় না।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণায় উঠে এসেছে যে, জাতীয় আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় না, নারীদের এমন কাজের আনুমানিক বার্ষিক মূল্য জিডিপির প্রায় ৭৬.৮ শতাংশ সমপরিমাণ। সরকারি হিসেবে জিডিপিতে নারীর অবদান ৩০ শতাংশ। সিপিডি মনে করে নারীদের সংসারের ভেতর ও বাইরের কাজের মূল্য যোগ হলে নারীর অবদান বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮ শতাংশে দাঁড়াবে।

নারীরা যখন ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অঙ্গনে বৃহৎ শিল্পের উদ্যোক্তা হিসেবে নারীর সংখ্যা অল্প হলেও দেশে অসংখ্য নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা রয়েছেন। তারা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। বৃহৎ শিল্পের উদ্যোক্তা নারীদের মধ্যে বেশ কজন আছেন গার্মেন্টস শিল্প খাতের। জাহাজ শিল্প ও ওষুধ শিল্পেও রয়েছেন বেশ কজন। তবে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তারা ছড়িয়ে আছেন দেশব্যাপী। বিশেষ করে বেসরকারি উন্নয়ন খাতের সহায়তায় দেশে এখন ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা অর্ধ লক্ষাধিক– তারা হাঁস-মুরগির খামার, গবাদি পশুর খামার, মৎস্য খামারসহ ছোটখাটো কারখানা গড়ে তুলেছেন। এতে তারা নিজেরা যেমন অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তেমনি অসংখ্য কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এ ধরনের উদ্যোক্তা ক্ষুদ্র শিল্প ও গ্রামীণ পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সূত্রেই বাংলাদেশে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত গড়ে উঠছে।

অনলাইন ব্যবসায় নারী

বিশ্বব্যাপী অনলাইন ব্যবসা অর্থাৎ 'আউটসোর্সিং' ব্যবসায় বাংলাদেশের নারীরা শক্ত ভিত গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এর তথ্য মতে, বর্তমানে দেশে ৩ লাখ মানুষ অনলাইন ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত। যাদের অর্ধেকই নারী ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা। এমনকি এর সাথে গৃহবধূ মহিলারাও জড়িত। বিগত কয়েক বছরে ২১টি জেলায় প্রায় ১০৫০০ জন নারী উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীরা

দেশের উন্নয়নের সাথে ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়নও জড়িত। তৎকালীন পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার ক্রীড়াঙ্গনে নারীদের ক্রীড়াচর্চার সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ। তারপরও পাকিস্তানের জাতীয় গেমসে পুরুষের পাশাপাশি নারী ক্রীড়াবিদগণও অংশ নিয়েছেন। প্রথম বাঙালি অ্যাথলেট হিসেবে পাকিস্তানের জাতীয় গেমসে ১৯৫৫ সালে হাইজাম্পে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন জিন্নাত আহমেদ। ১৯৫৬ সালে ৮০ মিটার হার্ডলসে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন সুফিয়া নেহা বকুল। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর ধীরে ধীরে ক্রীড়াঙ্গনে সম্ভাবনাময় নারীদের পদচারণা বৃদ্ধি পেয়েছে। অদম্য নারী ক্রীড়াবিদ ও খেলোয়াড়রা দেশের দক্ষ মানবশক্তি হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তিকে সমুজ্জ্বল করছেন।

নারী উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নারীও যে পুরুষের পাশাপাশি হাটে-মাঠে-ঘাটে কাজ করতে সক্ষম তা এই উন্নয়ন সংগঠনগুলোই প্রমাণ করে দিয়েছে। এ দেশের নারীরা এখন বোঝা নয়, নারীরা এখন গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক শক্তি। রাজনৈতিক স্তর থেকে উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উন্নয়নে নারীরা রাখছে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। দেশের দারিদ্র্যমুক্তি ঘটছে, দেশের উন্নয়ন হচ্ছে। নারীরও উন্নয়ন হচ্ছে। উন্নয়ন হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন এই নারীর হাত ধরেই।

নারী ক্রিকেটে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। ২০১১ সালে লাভ করেছে 'ওয়ানডে স্ট্যাটাস'। ২০১৮ সালে এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে। সাম্প্রতিক সময়ে সাফ গেমসের ফুটবলে বাংলাদেশের মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশের গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছে।
উল্লেখ্য, নারী ফুটবলারদের অধিকাংশই গ্রামের মেয়ে যারা অতীতে কখনো ঢাকাতেও আসার সুযোগ পাননি। কিন্তু খেলোয়াড় হিসেবে তারা বিশ্ব জয় করেছেন, তারা এখন দেশের মাথার মুকুট।

উন্নয়নে নারী : নারীর উন্নয়ন

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছিলেন, আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের উন্নত জাতি দেব। নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া বলতেন, নারীকে গৃহে অবরুদ্ধ রেখে কোনো জাতি বা দেশের পক্ষে উন্নয়ন সম্ভব নয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও নারীদের উন্নয়নে সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। স্বাধীনতার পর এই নারী উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নারীও যে পুরুষের পাশাপাশি হাটে-মাঠে-ঘাটে কাজ করতে সক্ষম তা এই উন্নয়ন সংগঠনগুলোই প্রমাণ করে দিয়েছে। তার ফলশ্রুতিতেই নারী এমনকি গ্রামের অসহায় দরিদ্র অশিক্ষিত নারীও দেশের শিল্প কারখানায় কাজ করছে। কেউ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থান এবং অন্যের কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি করে দিয়েছে। অর্থাৎ শুধু শিক্ষিত নারীরাই নয়, অশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত নারীরাও যে কর্মশক্তি এবং দেশের উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রাখতে সক্ষম তা প্রমাণ করে দিয়েছে। এ দেশের নারীরা এখন বোঝা নয়, নারীরা এখন গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক শক্তি। রাজনৈতিক স্তর থেকে উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উন্নয়নে নারীরা রাখছে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। দেশের দারিদ্র্যমুক্তি ঘটছে, দেশের উন্নয়ন হচ্ছে। নারীরও উন্নয়ন হচ্ছে। উন্নয়ন হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন এই নারীর হাত ধরেই।

বিশ্বের সব পার্লামেন্টেই নারী সদস্য: বাংলাদেশের অবস্থান ১০৭

বিশ্বের প্রায় সব দেশের পার্লামেন্টেই এখন নারী সদস্য রয়েছেন। ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (আইপিইউ) উইমেন ইন পার্লামেন্ট ২০২২ শীর্ষক প্রতিবেদনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধিদের বিষয়ে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে নির্বাচন হয়েছে এমন ৪৭টি দেশের তথ্যের ভিত্তিতে আইপিইউ বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় এসব নির্বাচনে নারীরা গড়ে প্রায় ২৬ শতাংশ আসনে জিতেছেন।
প্রতিবেদনে পার্লামেন্টে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ওপর ভিত্তি করে ১৮৬টি দেশের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। এতে বিশ্বের ১৮৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৭ নম্বরে, দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয়। বাংলাদেশে ৩৫০ আসন বিশিষ্ট সংসদে ৭৩ জন নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন। নারী প্রতিনিধিদের দিক দিয়ে এই হার প্রায় ২১ শতাংশে। তবে ৩৫০ আসনের মধ্যে ৫০টি সংরক্ষিত মহিলা আসন। বাকি ৩০০ আসনে সরাসরি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন ২৩ জন নারী।
বর্তমান সংসদে সংরক্ষিত আসনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ৪৩, জাতীয় পার্টির ৪, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির ১, স্বতন্ত্র ১ এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ১ জন নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন।

বাংলাদেশের পার্লামেন্ট বৈচিত্র্যে বিরল

বিশ্বজুড়ে কঠিন পথ পেরিয়েই নারীকে সামনের দিকে এগোতে হচ্ছে, নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে হচ্ছে। অনেক দেশে নারীদের ভোটাধিকারও ছিল না। ভোটাধিকার ও সংসদে নারী প্রতিনিধিদের দিক থেকে বাংলাদেশ যথেষ্ট এগিয়ে। দেশের জন্মলগ্ন থেকেই ভোটাধিকার রয়েছে। দেশে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার, সংসদের উপনেতা– এই চারটি শীর্ষ পদেই রয়েছেন নারী। যা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে দেখা যায় না। নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সংবিধানে সরাসরি ও সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনে নারীদের নির্বাচিত করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

দিনা মৃ : ফ্রি ল্যান্সিংয়ে সাফল্য লাভ

টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার পাহাড়ি অঞ্চলের গ্রাম ইদিলপুর। এই গ্রামেরই মেয়ে দিনা মৃ ডিপ্লোমা করেছেন নার্সিংয়ে। কিন্তু যখন জানলেন, ফ্রি ল্যান্সিংয়ের মাধ্যমেও আয় সম্ভব, তখনই সিদ্ধান্ত নিলেন, চাকরির দাসত্ব নয়, স্বাধীনভাবে আয়ের ব্যবস্থা করবেন। স্থানীয় সফরেক আইটি ইনস্টিটিউট থেকে ২০১৯ সালে কম্পিউটার শিখে নিলেন। এরপর আর পেছন ফিরতে হয়নি। তার ভাষায়, প্রথম কাজটা ছিল খুব ছোট, মাত্র ১০ ডলারের। কিন্তু খুব যত্ন নিয়ে করেন। এখন তার ১২ জনের একটি দল রয়েছে। মাসে প্রায় তিন হাজার ডলার আয় করেন তিনি। একই সাথে সফরেক আইটি ইনস্টিটিউটে ইনস্ট্রাক্টর হিসেবেও কাজ করেন। তিনি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নাইজেরিয়া, জার্মানি, সুইজারল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের নানা প্রতিষ্ঠানের কাজ করছেন।■

বিশেষ নিবন্ধ

মো. ফসিউল্লাহ

নারীর শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়ন

নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া শোষণ-শাসনের শৃঙ্খল ভেঙে নারীকে সভ্যতার আলোকবর্তিকা দেখাতে চেয়েছিলেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কাব্যের ছন্দে বিশ্বকে জানান দিলেন।

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বিখ্যাত উক্তি- 'তুমি আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব' যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় দেশ ও জাতির উন্নতি এবং সমৃদ্ধির পথে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে নারী তার সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করার পাশাপাশি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে খবর পাঠ করে, গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করেছিলেন। নারীরা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, বিভিন্ন দূতাবাসে প্রবাসী সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে, নির্যাতন সহ্য করে জনযুদ্ধের সাফল্য নিশ্চিত করেছিলেন। ১৪৭৫৯৮ বর্গকিলোমিটার অধ্যুষিত এলাকার প্রায় ১৭ কোটি লোকের বসবাস যার প্রায় অর্ধেক হলো নারী। জনসংখ্যার এই বৃহৎ অংশকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখে দেশের উন্নয়নের কথা ভাবাই অবান্তর। যদিও স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশে মেয়েদের লেখাপড়া ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। তখন রাষ্ট্রীয়ভাবেও এ দেশে মেয়েদের লেখাপড়ার অগ্রগতির জন্য তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। হাতে গোনা কয়েকটি উচ্চবিত্ত পরিবারের গন্ডির মধ্যেই মেয়েদের লেখাপড়া সীমিত ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ও নারীর ক্ষমতায়নের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ১৯৭২ সালে প্রণীত লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ২৮(২) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে- 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন' এবং সংবিধানের ১৭ (ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে- 'একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।' স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়তে শিক্ষার উন্নয়নে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ এবং সব স্তরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের পাশাপাশি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার এক অন্যতম মাইলফলক। সর্বশেষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক প্রণীত শিক্ষানীতি ২০১০-এ নারী শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে নারী শিক্ষা নামে একটি অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে।

শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ ও সাফল্যের ক্রমোন্নয়ন ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৫১ শতাংশই হচ্ছে ছাত্রী, মাধ্যমিক পর্যায়ে যা আরো কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪ শতাংশের বেশি। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও মেয়েদের অংশগ্রহণ প্রায়

E-9 দেশ	দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার দেশসমূহ	প্রাক-প্রাথমিকে মেয়ে শিক্ষার্থীর শতকরা হার	প্রাথমিকে মেয়ে শিক্ষার্থীর শতকরা হার
১. ব্রাজিল		৪৮.৮৮	৪৭.৯৪
২. চায়না		৪৬.৫৮	৪৬.৪২
৩. মিসর		৪৮.১৭	
৪. ইন্দোনেশিয়া		৪৬.২৬	৪৭.৭৮
৫. মেক্সিকো		৪৯.৫৩	৪৯.০৪
৬. নাইজেরিয়া		-	৪৭.৫০
৭. বাংলাদেশ	১. বাংলাদেশ	৪৯.৮০	৫০.৬৮
৮. পাকিস্তান	২. পাকিস্তান	৪৪.৬৯	৪৪.৫৪
৯. ভারত	৩. ভারত	৪৫.৭৮	৫১.১১
	৪. ভুটান	৫০.৫৯	৪৯.২২
	৫. আফগানিস্তান		৩৯.৪৯
	৬. মালদ্বীপ	৪৮.১৪	৪৮.৭৮
	৭. নেপাল	৪৭.১৬	৫০.৪৫
	৮. শ্রীলঙ্কা	৪৮.৬৪	৪৯.২৩
	৯. ইরান	৪৯.৫২	৫০.৪৩

অর্ধেকের সমান। শিক্ষাক্ষেত্রে শুধু মেয়েদের অংশগ্রহণই বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, সফলতার দিক দিয়েও মেয়েরা অগ্রগামী। বিগত কয়েক বছরের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় মেয়েরা ছেলেদের চেয়েও বেশি ভালো করছে। বিগত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার মেয়েদের উত্তীর্ণের শতকরা হার ছিল ৯৫.৪০, যেখানে মোট পাসের হার ছিল শতকরা ৯৫.১৮ এবং জেএসসি পরীক্ষায় মেয়েদের উত্তীর্ণের হার ছিল ৮৫.৮৩, যেখানে মোট পাসের হার ছিল শতকরা ৮৫.২৮। মাদ্রাসা শিক্ষায়ও মেয়েদের অংশগ্রহণ ও সফলতার হার বেশি। সব পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের সর্বোচ্চ মানদণ্ড জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে।

শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ ও তাদের উত্তরোত্তর অগ্রগতির পেছনে সরকারের যেসব জানুকরি পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য তার মধ্যে সর্বপ্রথম বলতে হয় বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের কথা। বছরের প্রথম দিনে উৎসবমুখর পরিবেশে একযোগে দেশের সব প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতি বছর প্রায় ৩৩ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। ২০১৭ সাল থেকে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতির পাঠ্যপুস্তক ও প্রতি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ সরকারের আরো একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

শিক্ষাক্ষেত্রে ঝরে পড়া রোধ ও মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সরকারের বিভিন্ন রকমের বৃত্তি প্রকল্প শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। প্রাথমিক থেকে স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি-উপবৃত্তি দেয়া হয়। বৃত্তিপ্রাপ্তদের শতকরা ৭৫ জনই ছাত্রী। নারী শিক্ষা উন্নয়নে এ ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। এক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ বন্ধে সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেট/ওয়াশ ব্লকসহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ভবন নির্মাণ এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে স্নাতক (পাস/সমমান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি, দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য আর্থিক সহায়তা, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীদের বিশেষ আর্থিক অনুদান এবং এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় শতকরা ৬৩ ভাগ নারী শিক্ষক রয়েছে যা নারী শিক্ষাকে আরো উৎসাহিত করছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশ প্রথম স্থানে অবস্থান করছে। সব পেশায় নারীর অংশগ্রহণ ও পারদর্শিতা অনুকরণীয়।

বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি জনসংখ্যার ৯টি দেশের শিক্ষাবিষয়ক ফোরাম E-9 ও সার্কভুক্ত দেশসমূহের নারী শিক্ষার তুলনামূলক চিত্র প্রদত্ত ছকে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর সামর্থ্য উন্নীতকরণ, নারীর অর্থনৈতিক প্রাপ্তি বৃদ্ধিকরণ, নারীর মতপ্রকাশ ও মতপ্রকাশের মাধ্যমে সম্প্রসারণ এবং নারীর উন্নয়নে একটি সহিংস পরিবেশ সৃষ্টিকরণের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা নারী শিক্ষা তথা নারী উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

নারী শিক্ষার অগ্রগতির সাথে সাথে এ দেশে নারীর ক্ষমতায়নের পথচলা শুরু হয় যার প্রাথমিক সোপান রচিত হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখার মধ্য দিয়ে, যা বর্তমানে বৃদ্ধি করে ৫০-এ উন্নীত করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় নিশ্চিত করা হয়েছে নারীর প্রতিনিধিত্ব। দেশে এখন প্রায় ১২ হাজার নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি রয়েছেন।

নারীর ক্ষমতায়নে উন্নয়নশীল বিশ্বে বাংলাদেশ আজ রোল মডেল। এর বিশ্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'গ্লোবেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' এবং 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড-২০১৬' এর সম্মানে ভূষিত করা হয়। নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী শিক্ষা উন্নয়নে বিশ্বের বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনেস্কোর 'গ্লোবাল উইমেন্স পিস অ্যাওয়ার্ড' ও 'টি অব পিস'সহ অনেক আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

প্রতিটি শিশুই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ। একমাত্র শিক্ষাই একটি জাতিকে টেকসই উন্নয়নের পথ দেখাতে পারে। আজ যে মেয়েটি শিক্ষিত হবে, সে ভবিষ্যতে নিজ পেশায় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি একজন শিক্ষিত মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সন্তানকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলবে, দেশ পাবে একজন সুনাগরিক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে নারী শিক্ষার অগ্রগতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে যা সারা দুনিয়ায় প্রশংসনীয়।■

● লেখক : এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA)

জাকির হোসেন

নারীর ক্ষমতায়ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকা

দীর্ঘদিন থেকেই দেশে 'নারীর ক্ষমতায়ন' অর্থাৎ Women Empowerment কথাটি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে 'নারীর ক্ষমতায়ন' বলতে আমরা কি বুঝি? নারীর ক্ষমতায়নের অর্থ নারীর নিজস্ব মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করার ক্ষমতা অর্জন। এটি সম্ভব তখনই যখন নারী সমাজ ঘরের বাইরেও নানা অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ পায়। একইভাবে বলা যায়, 'ক্ষমতায়ন' এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তির নিজের জীবন, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সমন্বিগত উৎপাদনে ক্ষমতা সৃষ্টি করে। এটি করতে নারীকে শিক্ষা, কর্মোদ্যোগ কিংবা পেশাজীবী হতে হয়। পেশাজীবী অর্থাৎ চাকরি কিংবা ব্যবসা যেভাবেই হোক না কেন নারী যখন অর্থ উপার্জনে সক্ষম হয় তখন তার মধ্যে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বোধ বা তাগিদ জন্ম নেয়। নারী উপলব্ধি করে অর্থ এবং ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে সে এখন 'মানুষ'। নারীর ক্ষমতায়ন তার নিজস্ব মতামতের একটি ভিত্তি তৈরি করে এবং নিজস্ব মূল্যবোধকে বিকশিত করতে সাহায্য করে। এককথায় বলা যায়, নারীর আর্থিক সক্ষমতা ছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন ঘটে না।

প্রাচীনকাল থেকেই পুরুষ ও নারী মিলেই সমাজ ও সংসার এবং একে অন্যের পরিপূরক। কিন্তু এই বন্ধন বা সম্পর্কের মধ্যেও বাংলাদেশের নারী সমাজ অনগ্রসর থাকায় ছিল ক্ষমতাহীন এবং পরিবারের সদস্য হিসেবে পরাধীন। তাদের নিজস্ব মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না এবং অধিকাংশে ক্ষেত্রে পরিবারগুলো দরিদ্র ও হতদরিদ্র হওয়ায় নারীরা ছিল শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। তৎকালীন পাকিস্তান আমল এবং স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সমাজচিত্র ছিল এমনটিই। শত শত বছর ধরে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যাতে গোনা দু'চারটি পরিবার ছাড়া প্রতিটি পরিবারের নারীরাই ছিল নির্মম অবহেলার শিকার। পরিবারের পুরুষ সদস্য হিসেবে একটি ছেলে যে স্বাধীন আবহ নিয়ে বেড়ে উঠতো, একটি মেয়ে তার ছিটেফোঁটাও পেতো না। বরং মেয়ে বলে শিশুকালেই সে নিজ পৈতৃক পরিবার থেকেই হতে বঞ্চনার শিকার। তার পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার, শিক্ষা এমনকি বিয়ের প্রশ্নেও তার মতের কোনো মূল্য ছিল না।

বাস্তবতা এটাই যে, নারীদের প্রতি বৈষম্য এবং তাদের যথাযথ শিক্ষা ও কর্ম থেকে বঞ্চিত রাখার ফলে পরিবার এবং দেশও দারিদ্র্যের শৃঙ্খল থেকে বেরোতে পারছিল না। কারণ একটি জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী সমাজ যদি অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে বাদ

পড়ে, সেক্ষেত্রে তারা হয়ে যায় জাতির জন্য বোঝাস্বরূপ। ফলে অতীতে এ দেশে শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ মানুষই ছিল দরিদ্র ও হতদরিদ্রের শিকার। এই অসহায় জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করেই শুরু হয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো ভাত ও কাপড়ের নিশ্চয়তা পাবার জন্যই স্বাধীনতার আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নিতে থাকে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষিত নারী সমাজের মতো নিরক্ষর নারী সমাজও অংশ নেয়। কারণ, তাদের মধ্যেও একটা প্রবল আশার আলো জ্বলে ওঠে যে, দেশ স্বাধীন হলে মানুষের দারিদ্র্যের অবসান ঘটবে। এ জন্যই স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের সাথে সাধারণ মানুষ একাত্ম হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণসহ সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছিল। শিক্ষিত ছাত্র সমাজের সাথে নিরক্ষর গ্রামের কৃষক-মজুরও যুদ্ধে অংশ নিতে ও রক্ত দিতে দ্বিধা করেনি।

মুক্তিযুদ্ধে অবকাঠামো ও অর্থনৈতিকভাবে হতদরিদ্র মানুষদের পুনর্বাসন এবং স্বাধীনতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি দেশে ব্র্যাক, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রসহ বেশ কয়েকটি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন কাজ শুরু করে। কেয়ার বাংলাদেশসহ বেশ কয়েকটি বিদেশি উন্নয়ন সংস্থাও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পুনর্বাসনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশ নেয়। এসব সংস্থা উপলব্ধি করেছিল যে, নারীদের উন্নয়ন ঘটলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এ জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের টার্গেট পিপল ছিল মূলত নারী। এরই ধারাবাহিকতায় আশির দশকে দেশে আরো অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন গড়ে ওঠে। এই বেসরকারি উন্নয়ন খাতের মাধ্যমে দেশের নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক অভাবিত বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বিশ্বের দরিদ্রদের প্রায় ৭০ শতাংশ নারী। সেদিক থেকে বাংলাদেশে এই দারিদ্র্যের হার ছিল আরো বেশি। মূলত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নারী উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রমের ফলে গত কয়েক দশকে নারীর শিক্ষা বিস্তারসহ নারী কর্মশক্তির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। পাশাপাশি জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। নারীরা অধিক সচেতন হয়েছে এবং উন্নয়ন ধারায় তাদের অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র অর্থায়ন, রাজস্ব উৎপন্ন, খাদ্য সংরক্ষণ, মানব পুঁজি উন্নয়ন এবং বিকাশমান নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একটি কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

একজন নারী যখন ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে নিজে স্বাবলম্বী হয়, তখন তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসসহ ক্ষমতায়নের চিন্তাভাবনা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সে তখন অধিকার সম্পর্কে অধিক সচেতন হয়, পরিবার কিংবা সামাজিক কোনো কাজের ব্যাপারেও তার মতামত বা কথা বলার অধিকার জন্ম নেয়। বিশেষ করে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহচর্যে এসে ও তাদের সাথে কাজে সম্পৃক্ত হওয়ায় তার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং অন্তর্দৃষ্টিমূলক জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়। তখন সে ক্রমশ যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে। সে তার পরিবার এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবার সক্ষমতা অর্জন করে। এর পেছনে মূল যে বিষয়টি কাজ করে তা হচ্ছে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা ও সক্ষমতা।

একজন নারী ততোক্ষণ অসহায় থাকে যখন সে কর্মোদ্যোম দ্বারা অর্থ উপার্জন না করতে পারে। এ দেশে নারীরা যুগ যুগ ধরে পরিবারের কৃষি ও গৃহকর্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও তারা কখনো এসব কাজের জন্য অর্থ প্রাপ্য হতো না। কারণ, ধরে নেয়া হয় নারী মানেই ভাত-কাপড়ের বিনিময়ে সংসারে এসব কাজ বিনামূল্যে করবে। এমনকি এ সমাজে নারীদের ক্ষেত্রে এখনো এই ব্যবস্থাই বিদ্যমান। তাদের গৃহ কাজের কোনো অর্থমূল্য নেই। আর্থিক মূল্যায়নে নারীদের দেশ ও সমাজের বোঝা হিসেবে মনে করা হতো। কারণ অতীতে একমাত্র পুরুষরাই ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতো। ঠিক এমনই অবস্থায় বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলো ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে।

ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, বুরো বাংলাদেশ, টিএমএসএস, এসএসএস, আরডিআরএসসহ বর্তমানে দেশে ছোট-বড় কয়েক হাজার বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষুদ্র অর্থায়ন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এর নিবন্ধিত এমএফআই এর সংখ্যা ৭৩১টি। এ খাতে কর্মরত রয়েছে ২ লাখ ৮০ হাজারেরও অধিক শিক্ষিত কর্মী যাদের অধিকাংশই নারী। এসব নারীরা তৃণমূল পর্যায়ে দক্ষতার সাথে কাজ করছেন। এই নিকট অতীতেও স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যখন কেয়ার বাংলাদেশ এর নারী কর্মীরা মোটরসাইকেল বা সাইকেলে করে গ্রামে কাজে যেতেন তখন তথাকথিত পশ্চাৎপদ ধর্মান্ধ হুজুররা নানা কথা বলতেন। বলতেন নারীরা এভাবে বেপর্দা হয়ে পুরুষের মতো চলাচল করছে- গজব পড়বে, দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।

পরবর্তীতে যখন ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, বুরো বাংলাদেশসহ উন্নয়ন সংগঠনগুলো গ্রামে গ্রামে নিরক্ষর নারীদেরকে সংগঠিত করে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতন করতে থাকে, তখনো স্বল্প শিক্ষিত ধর্মান্ধরা ক্ষীণকণ্ঠে এর বিরোধিতা করেছে। অবশ্য ততোদিনে তারা উপলব্ধি করেছে যে, এনজিওরা উন্নয়নমূলক কাজ করছে। এসব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বেসরকারি উন্নয়ন

একজন নারী ততোক্ষণ অসহায় থাকে যখন সে কর্মোদ্যোম দ্বারা অর্থ উপার্জন না করতে পারে। এ দেশে নারীরা যুগ যুগ ধরে পরিবারের কৃষি ও গৃহকর্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও তারা কখনো এসব কাজের জন্য অর্থ প্রাপ্য হতো না। কারণ, ধরে নেয়া হয় নারী মানেই ভাত-কাপড়ের বিনিময়ে সংসারে এসব কাজ বিনামূল্যে করবে। এমনকি এ সমাজে নারীদের ক্ষেত্রে এখনো এই ব্যবস্থাই বিদ্যমান।

সংগঠনগুলো সারা দেশের গ্রামে-গঞ্জে কাজ করেছে। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে পিছিয়ে থাকা নারীদের সংগঠিত করেছে, তাদেরকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে।

স্বপ্নহীন এসব নারীদের মধ্যে তারা স্বপ্ন জাগিয়েই শুধু ক্ষান্ত হয়নি, তাদের স্বপ্ন পূরণে অর্থ ও অন্যান্য সহায়তা দিয়ে তাদের কর্মোদ্যোগী করেছে। এই নারীরা যখন ২/৪ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে কিস্তি শোধ করে দেখেছে যে তাদের লাভ হয়েছে, তারা ব্যবসা সম্পর্কে ধারণা পেয়েছে। কেউ কৃষিকাজে লাগিয়েছে। অন্যের জমি বন্ধক নিয়ে সবজি করেছে, কেউ হাঁস-মুরগি-গরু কিনেছে। এভাবে তাদের ঋণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন তাদের প্রায় সবাই স্বাবলম্বী হয়েছে, তারা এখন আর অভাবগ্রস্ত নেই। তাদের জীবনমানের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। সন্তানদের পড়াশোনা করাতে পারছে। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে থাকার সুযোগ পাচ্ছে। তাদের ক্রয়ক্ষমতাও বেড়েছে। তবে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তন হয়েছে তা হচ্ছে তাদের ক্ষমতায়ন হয়েছে। তারা এখন

পারিবারিক বা সামাজিক কার্যক্রমে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখে। আর এই ক্ষমতায়নের সূচনা ঘটেছে এনজিও/এমএফআইদের কার্যক্রমকে ঘিরেই। এ খাতের মাধ্যমে দেশের ৩ কোটি ২৫ লাখ পরিবারকে আর্থিক সেবার মধ্যে আনা হয়েছে যাদের মধ্যে ৯৩% মহিলা। ১ কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে। অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ায় বৃদ্ধি পেয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন।

দেশের এনজিও/এমএফআই খাতের ক্ষুদ্র অর্থায়ন সেবা নারী ও তাদের পরিবারকে ক্ষমতায়ন করতে বড় হাতিয়ারের ভূমিকা পালন করছে। তাদের মধ্যে মর্যাদা, আত্মবিশ্বাস, স্বকার্যকারিতা এবং ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ছে নারীদের ক্রয়ক্ষমতা, বাড়ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। তাদের মধ্যে কাজের একটা গতিশীলতা সৃষ্টি করে দিচ্ছে। একই সাথে আত্ম অধিকারের জন্য আইনি ও প্রশাসনিক সচেতনতাও সৃষ্টি করছে। তাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার সাহস যোগাচ্ছে। আর এসব নারীদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ফলে শুধু গ্রামীণ অর্থনীতিই নয়, জাতীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রমের ফলে গত কয়েক দশকে নারীর কর্মশক্তির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। বাড়ছে নারীর কর্মসাহস ও সৃজনশীলতা।

আরেকটি বিষয় স্পষ্ট যে, শুধু শিক্ষা অর্জিত হলেই নারীর ক্ষমতায়ন হয় না। এই ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন কর্মোদ্যোগ ও পুঁজি– তা পরিমাণে স্বল্প হলেও শিল্পেই এখন লাখ লাখ নারী কাজ করছে, বিদেশেও কাজ করছে হাজার হাজার নারী। সেই সাথে শিক্ষিত নারী সমাজ সরকারের বিসিএস ক্যাডার, সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনীসহ বিভিন্ন সার্ভিসে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করছে। সব মিলিয়ে দেশে নারীর ব্যাপক ক্ষমতায়ন হয়েছে। হ্রাস পেয়েছে শিক্ষা বৈষম্য। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, তিন দশক আগে যে গ্রামীণ নারী মাত্র হাজার টাকা ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগি পালনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তার সাফল্য তাকে শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই এনে দেয়নি বরং তার সন্তানরা স্কুল-কলেজে পড়ে কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার কিংবা বিসিএস ক্যাডারে চাকরি করছে। ওই নারী যদি উদ্যোগী না হতেন, যদি আয় না করতেন তা হলে তার পক্ষে সম্ভব হতো না ছেলেমেয়েদের পড়ানো।

আরেকটি বিষয় যে, নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিগত চার দশকে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এমন কোনো পরিবার নেই যে, সে পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে না, পড়াশোনা করছে না। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি এই সচেতনতা সৃষ্টি করে দিয়েছে মূলত এনজিওরাই। অল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর নারীরাও যে শিল্প শ্রমিকের পেশা গ্রহণ করেছে সেই সাহসও তারা পেয়েছে নারীদের এই জাগরণ থেকেই।

এ কথা উল্লেখের দাবি রাখে যে, বাংলাদেশের নারীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের সব সূচকেই প্রতিবেশী ভারত-পাকিস্তানসহ অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার অনেক হ্রাস পেয়েছে, বাল্যবিবাহের পরিমাণও কমে এসেছে। উত্তরবঙ্গের মঙ্গা অবস্থা দূরীকরণেও সরকারের পাশাপাশি এনজিওদের ভূমিকা ব্যাপক– যেখানে কর্মোদ্যোগী নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিগত চার দশকে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এমন কোনো পরিবার নেই যে, সে পরিবারের ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে না, পড়াশোনা করছে না। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি এই সচেতনতা সৃষ্টি করে দিয়েছে মূলত এনজিওরাই। অল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর নারীরাও যে শিল্প শ্রমিকের পেশা গ্রহণ করেছে সেই সাহসও তারা পেয়েছে নারীদের এই জাগরণ থেকেই।

চলে। দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলো গ্রামীণ প্রান্তিক পর্যায়ের নারী জনগোষ্ঠীকে সেই পুঁজির সরবরাহ করে তাদেরকে কর্মোদ্যোগী হতে অনুপ্রাণিত করেছে, সহায়তা করেছে। এমআরএ নিবন্ধিত এমএফআইরা পৌনে দুই লাখ কোটি টাকারও বেশি ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সারা দেশে লাখ লাখ ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে যা দেশের অর্থনীতিতে নিয়ে এসেছে নতুন প্রাণ। ঘুরে দাঁড়িয়েছে অর্থনীতি। এভাবেই তাদের দারিদ্র্য দূরীকরণ ঘটেছে, তাদের মধ্যে সন্তানের শিক্ষা, সামাজিক সচেতনতা, স্বাস্থ্য ও সুস্থ পরিবেশসম্মত গৃহ উপকরণের তাগিদ তৈরি করছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো প্রমাণ করে দিয়েছে যে, যতো বেশি নারীর ক্ষমতায়ন ঘটবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ততো বেশি ত্বরান্বিত হবে।

বর্তমানে টেকসই অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথেষ্ট এগিয়ে। এর মূলেও ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ের এসব নারীদের অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠা। একই সাথে এটাও বলা বাহুল্য যে, দেশের গার্মেন্টস শিল্পসহ অনেক

পরিশেষে নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত এর কথা স্মরণ করছি। একদিন তিনি নারী শিক্ষার বাতিঘর জ্বালিয়ে ঘরে ঘরে গিয়েছেন মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য। সমাজের অনেকেই তখন তার সমালোচনা করেছে কিন্তু তাকে দমাতে পারেনি। ঠিক একইভাবে দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাও নারীদের কর্ম, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশে জীবনযাপনের লক্ষ্যে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজ করেছে বলেই দেশ আজ অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে। বিস্তৃতি ঘটছে নারীর ক্ষমতায়নের।■

● লেখক : প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক
সুরো বাংলাদেশ

সোহরাব আলী খান

নারী অগ্রযাত্রায় বেসরকারি সংস্থা

নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান তৈরি, পরিবার পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নারীদের সচেতন করা, নেতৃত্ব দেয়ার মতো অবস্থানসহ বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণে বছরের পর বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে এদেশের বেসরকারি সংস্থাগুলো।

যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, বিবাহবিচ্ছেদ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, অ্যাসিড নিক্ষেপসহ নারীর সুরক্ষায় যা করা দরকার তার প্রায় সবই বেসরকারি সংস্থাগুলোর এজেন্ডাভুক্ত কাজ। নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক তথা সামগ্রিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে চার দশকের বেশি সময় ধরে বিরামহীনভাবে একের পর এক উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মসূচি পরিচালনা করছে এদেশের এনজিওগুলো।

নারী তার মেধা, শ্রম দিয়ে যুগে যুগে সভ্যতার সব অগ্রগতি ও উন্নয়ন করেছে সব অংশীদারিত্বে। আর তাই সারা বিশ্বে বদলে গেছে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। এখন নারীর কাজের মূল্যায়ন হচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে নারীর কাজের স্বীকৃতি। একসময় আমাদের সমাজের নারীরা সমাজব্যবস্থা থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। তারা ছিল চরম বৈষম্যের শিকার। ছিল না পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবদান। শিক্ষার আলো থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়ে ঘরের চার দেয়ালে ছিল আবদ্ধ। সে সময় মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাহসী ভূমিকা পালন করেন। তিনি নারী শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে একের পর এক পদক্ষেপ নেন। তিনি বলেছিলেন 'আমরা কেন উপার্জন করিব না? আমাদের কি হাত-পা নেই? বুদ্ধি নেই? কি নেই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকাজে ব্যয় করি সেই পরিশ্রম দ্বারা আমরা কি স্বাধীন ব্যবসা করতে পারবো না?' আজ ভাবুন তো বেগম রোকেয়ার সেই স্বপ্ন আজ পূরণ করলো কে? শুধুই কি সরকারি উদ্যোগ? একেবারেই না। এদেশের বেসরকারি সংস্থা বা এনজিওগুলো মূলত বেগম রোকেয়ার স্বপ্নগুলো বাস্তবে পরিণত করেছে। টিএমএসএসের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপিকা ড. হোসনে আরা বেগমকে দেয়া রাষ্ট্রীয় পদক বেগম রোকেয়া অ্যাওয়ার্ড মূলত বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ অবদানের স্বীকৃতিই প্রমাণ করে। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার বলিষ্ঠকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন সাম্যের বাণী;

"সাম্যের গান গাই-
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই!
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর"।

কবি নজরুল ও বেগম রোকেয়ার চাওয়াগুলো আজ পূরণ হয়েছে। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অধিপতিরা একসময় বলে থাকতেন নারীদের দ্বারা কিছু হয় না, নারীরা শুধু গৃহস্থালি অন্দরমহলের কাজ করবে, সন্তান ধারণ করবে, সন্তান লালন করবে, সারা দিন ঘরের

মতো কাজ করবে, নারীরা শুধু মা, বোন, খালা, মামি, দাদি-নানি হয়ে সবার সেবায় নিয়োজিত থাকবে। আসলেই কি তাই? না, মোটেই না। নারীর অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম। নারীর পরাধীনতা ও অসম অধিকার বিলোপ, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের সুযোগ সৃষ্টি এমনি এমনিই হয়ে যায়নি। এটা অর্জনে বহু উদ্যোগ নিতে হয়েছে, আর সেটা বহু পক্ষ থেকে হলেও বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

নারী জাগরণ

সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিকতা; নারীর অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূচনা হয় ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে, যদিও সেটা ছিল নারীর সত্তা রক্ষের জন্য। ধনতন্ত্রের শুরুতেও নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া সূচিত হয়। রিজেন ও রেশনস নামের প্রবন্ধে ১৬৬২ সালে এক অনন্যা নারী সমস্বরে উচ্চারণ করেন পুরুষের সমান নারীরাও। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইউরোপে নারীর অধিকার, নারীর স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনায় উঠে আসে। ১৯৭২ সালে ব্রিটেনের এক নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য বই লেখেন। ১৮৫১ সালে হ্যারিয়েট টেইলার মিল শিক্ষানবিশ নারী সমাজকে অধস্তনে পরিণত করে এমন সব আইনগত ও রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থা পরিবর্তন করেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে আমেরিকায় নারী আন্দোলন সংগঠিত হয় দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্র ধরে। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে নারী অধিকারের প্রশ্নে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। ১৯০১ সালে ক্লারাজেটকিনের উদ্যোগে গঠিত হয় সোশ্যালিস্ট উইমেনস ইন্টারন্যাশনাল, ভোটের সঙ্গে সমান মজুরি এবং প্রসূতিকালীন বীমার দাবি তুলে বলিষ্ঠভাবে জানানো হয় ৮ মার্চ দিনটাকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা দেবার জন্য। কারণ ১৮৭৫ সালের ৮ মার্চ আমেরিকায় বস্ত্রশিল্পের নারী শ্রমিকেরা ষোল ঘণ্টার পরিবর্তে দশ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট করেছিল, ১৮৯৩ সালে নিউজিল্যান্ডে সর্ব প্রথম নারীর ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, এরপর ১৯০২ সালে অস্ট্রেলিয়ায়, ১৯১৭ সালে রাশিয়ায়, ১৯১৮ সালে ব্রিটেনে, ১৯২১ সালে আর্মেনিয়ায়, ১৯২৯ সালে তিন শর্তে ভারতে নারীদের ভোটাধিকার দেয়া হয়। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নারী অধিকারের প্রশ্নটি গুরুত্ব পেতে থাকে। ১৯৪৯ সালে নারী পাচার ও পতিতাবৃত্তি নিরোধ সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৫২ সালে মহিলাদের রাজনৈতিক কনভেনশন, ১৯৫৬ সালে দাসত্বের বিলোপ সংক্রান্ত সম্পূরক কনভেনশন, ১৯৫৭ সালে বিবাহিত মহিলাদের জাতীয়তা সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৬২ সালে মহিলাদের প্রতি বৈষম্য বিলোপের ঘোষণা পর আসে ১৯৭৫ সালে, পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ। এ বছর মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব নারী সম্মেলন, ১৯৭৬-১৯৮৫ সালে পালিত হয় জাতিসংঘের নারী দশক, ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় নারী সম্মেলন। ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে তৃতীয় নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে লিঙ্গ সমতা, মজুরিবিহীন কাজের স্বীকৃতি, মজুরিযুক্ত কাজের অগ্রগতি, নারীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা, উন্নত শিক্ষার সুযোগ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়। বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত ১৯৯৫ সালের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১২টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে মূলত নারী জাগরণের পথ মসৃণ করার সিদ্ধান্ত হয়, এই ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে- দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সন্ত্রাস/নির্যাতন, যুদ্ধ ও অন্যান্য সংকট, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ক্ষমতা বণ্টন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকার, গণমাধ্যম, পরিবেশ ও উন্নয়ন এবং কন্যা শিশু। মূলত এই ১২টি ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে নারীর অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সব পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই ১২টি ক্ষেত্রেই বেসরকারি সংস্থাগুলো কাজ করে থাকে।

২০১১ সালে বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন নীতিমালা অনুমোদিত হয়, এই নীতিমালায় ৪৯টি বিষয় চিহ্নিত করে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়। এ নীতিমালার আওতায় নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ নারী ও আইন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নারী মানবসম্পদ, রাজনীতি ও প্রশাসন, সম্পদ ও অর্থায়ন, কন্যা শিশুর উন্নয়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারীর কর্মসংস্থান, নারী ও কৃষি, নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, গৃহায়ন ও আশ্রয়- এগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাছাড়াও নারী ও পরিবেশ, নারী ও গণমাধ্যম বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত নারী, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল, আর্থিক ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করে নারী নীতি সাজানো হয়েছে এবং সেভাবেই সরকারের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

নারী জাগরণে বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থা

সরকারের নারী নীতি ২০১১ এর ৪৮ অধ্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার যোগসূত্র গড়ে তোলার বিষয়টি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ক্ষেত্র বিশেষে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক প্রথমে ত্রাণ সহায়তা দিয়ে কাজ শুরু করলেও পরবর্তীতে নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার নিয়ে কাজ করে। পরবর্তীতে প্রান্তিক থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে টিএমএসএস, আশা, যুবো বাংলাদেশসহ বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান বহুবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে এদেশের এনজিওগুলো নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নারীদেরকে শুধু গৃহস্থালি কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রথম দিকে Household Income Generating Activities এ সম্পৃক্ত করা হয়। নারীদেরকে সংসারে আয়ের আওতায় আনার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। তাদেরকে বিভিন্ন বিষয় তথা নারীর স্বাস্থ্য, নারীর শিক্ষা, নারীর অধিকার, নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নারীর সম্পদ অর্জন, নারীর সঞ্চয় প্রভৃতিতে এনজিওগুলো সরকারের পাশাপাশি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে।

দেশব্যাপী বিস্তৃত ক্ষুদ্রঋণের নেটওয়ার্কের আওতায় প্রায় তিন কোটি নারী সরাসরি বেসরকারি সংস্থাগুলো হতে আর্থিক সহায়তা (ক্ষুদ্রঋণ) নিয়ে নিজেদেরকে উৎপাদন ও উন্নয়নের কাতারে শামিল হয়েছে। নিজ কর্মসংস্থান ছাড়াও অন্য আরো নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ডিজিটাল দুনিয়ায় স্থান করে নিয়েছে। ক্যাশলেস সোসাইটি নির্মাণে বর্তমান সরকারের অনন্য উদ্যোগে সহায়তার অংশ হিসেবে গ্রামীণ নারীদেরকেও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে লেনদেন, অনলাইন ব্যবসা পরিচালনা, ক্রিপ্টোলিং এর আওতায় আনে

নারীর ক্ষমতায়ন হওয়ায় সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সুশাসন বৃদ্ধি পেয়েছে, নারীর আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকের নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে এবং এগিয়ে যাচ্ছে অপার সম্ভাবনাময় আর্থ-সামাজিক জীবনে।

বাংলাদেশের নারীর অগ্রযাত্রা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মূল ভিশন হচ্ছে এমন একটা সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে নারী ও পুরুষ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র সমান সুযোগ ও অধিকার লাভ করবে এবং সব মৌলিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের লিঙ্গবৈষম্য থাকবে না। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বেসরকারি সংস্থাগুলো স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করছে।

যুক্ত করা, নগদ লেনদেন কমিয়ে অনলাইন লেনদেনে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরিতে নারীদের সম্পৃক্ত করছে এবং সহায়তা দিচ্ছে বেসরকারি সংস্থাগুলো।

নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে এদেশের এনজিওগুলো বহুমাত্রিক কাজ করছে। কন্যাশিশুকে স্কুলে পাঠানো নিশ্চিত করা, ড্রপআউট রোধে অভিভাবকদেরকে সচেতন করা, কিশোরী ক্লাব পরিচালনা করে নারীর নেতৃত্ব তৈরি, কন্যা শিশুদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি ও উচ্চশিক্ষার সহায়তা দেয়া, বিভিন্ন আয় উপার্জন কর্মকাণ্ডে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেয়া, স্বামীদেরকে সংগঠিত করে সংসার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। পিছিয়ে থাকা নারীদেরকে সচেতন করে তাদেরকে দেশের উন্নয়ন ধারায় শরিক করা। নারী শিক্ষায় বাংলাদেশের অনবদ্য অগ্রসরতায় সরকারের পাশে থেকে এনজিওগুলো দীর্ঘমেয়াদে অবদান রেখে যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষায় নারী শিশু ভর্তির হার ক্রিবেচনায় সমন্বিতভাবে বাংলাদেশ প্রথম হওয়ার রেকর্ডে, দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও তা টিকিয়ে রাখার জন্য দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে আয়ের সাথে সম্পৃক্ত রেখে সফল হওয়ার জন্য নারীর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষায় সহায়তার মাধ্যমে সরাসরি নারীর আত্মনির্ভরশীলতায় আজ যুক্ত বেসরকারি সংস্থাগুলো।

দ্য গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট অনুযায়ী নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ১৪৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৪৭তম। অর্থাৎ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় নারীর ক্ষমতায়নের দিক থেকে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে আছে। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ তথা ভারতের অবস্থান ১০৮, শ্রীলঙ্কার ১০৯, নেপালের ১১১, ভুটানের ১২৪ এবং পাকিস্তানের অবস্থান ১৪৩। নারীর ক্ষমতায়ন হওয়ায় সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সুশাসন বৃদ্ধি পেয়েছে, নারীর আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকের নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে এবং এগিয়ে যাচ্ছে অপার সম্ভাবনাময় আর্থ-সামাজিক জীবনে।

বাংলাদেশের নারীর অগ্রযাত্রা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মূল চিত্রণ যাচ্ছে এমন একটা সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে নারী ও পুরুষ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র সমান সুযোগ ও অধিকার লাভ করবে এবং সব মৌলিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের লিঙ্গবৈষম্য থাকবে না। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বেসরকারি সংস্থাগুলো স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করছে।

দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সম্ভাবনাময় নারীদেরকে উদ্যোক্তা রূপে উদ্বুদ্ধ করা, তাদের প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা দেয়া, কৃষি ও অকৃষিজ উৎপাদনে নারীদের সম্পৃক্ত করা, তাদেরকে ব্যবসার পরিকল্পনা তৈরি শেখানো, উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মোড়কীকরণ ও বাজারজাতকরণ শেখানো। ব্যবসায়/উদ্যোগে প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক সহায়তা দেয়া, আইটি খাত, যোগাযোগ খাত, ব্র্যান্ডিং খাত ইত্যাদিতে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করা ও নারীর কর্মসংস্থানে ব্যাপক সুযোগ তৈরির মাধ্যমে গ্রামে-শহরে সর্বত্র দৃশ্যমান কর্মজীবন তৈরিতে প্রতিনিয়ত সহায়তা দিচ্ছে এদেশের এনজিওগুলো।

বেসরকারি সংস্থাগুলো ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করছে।

বেসরকারি সংস্থা টিএমএসএস এর স্লোগান হচ্ছে 'পরিবারই হোক নারী উন্নয়নের কেন্দ্রস্থল', মূলত পরিবার থেকেই নারীকে সম্মান ও আত্মমর্যাদা নিয়ে বেড়ে ওঠার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে নারীরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে ওঠতে পারে। প্রতি বছর ৮ মার্চ 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস'-এর মাধ্যমে আশা করা যায় সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হবে এবং সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রয়াস বৃদ্ধি পাবে এবং নিশ্চিত হবে নারীর অগ্রযাত্রা। দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সম্ভাবনাময় নারীদেরকে উদ্যোক্তা রূপে উদ্বুদ্ধ করা, তাদের প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা দেয়া, কৃষি ও অকৃষিজ উৎপাদনে নারীদের সম্পৃক্ত করা, তাদেরকে ব্যবসার পরিকল্পনা তৈরি শেখানো, উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মোড়কীকরণ ও বাজারজাতকরণ শেখানো। ব্যবসায়/উদ্যোগে প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক সহায়তা দেয়া, আইটি খাত, যোগাযোগ খাত, ব্র্যান্ডিং খাত ইত্যাদিতে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করা ও নারীর কর্মসংস্থানে ব্যাপক সুযোগ তৈরির মাধ্যমে গ্রামে-শহরে সর্বত্র দৃশ্যমান কর্মজীবন তৈরিতে প্রতিনিয়ত সহায়তা দিচ্ছে এদেশের এনজিওগুলো। সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগও মাঠে ময়দানে, তৃণমূলে

'তুমি যদি কিছু বলতে চাও তা হলে পুরুষকে দিয়ে বলাও, যদি কোন কাজ সম্পন্ন করতে চাও তা হলে নারীকে দিয়ে করা'- কথাগুলো বলেছেন মার্গারেট থ্যাচার। আবার হ্যারিয়েট বেচার বেটা বলেছেন 'নারী হলো সমাজ গড়ে তোলার সহপতি।'

১৯০৫ সালে বেগম রোকেয়ার লেখা 'সুলতানার স্বপ্ন' নামের বইতে বেগম রোকেয়া এমন একটি দেশ চেয়েছিলেন, যেখানে সবকিছুর নেতৃত্বে থাকবেন নারী। আজ অনেকাংশেই তা অর্জিত হয়েছে। এই অর্জনে সরকার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নারীর অগ্রযাত্রায় আরও সাফল্য আসুক, আসুক নারী-নির্যাতন প্রতিরোধে বীর সামাজিকতায় শূন্য সহনশীলতা।

নারী ও পুরুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। উভয়ের সহযোগিতার আসে সমৃদ্ধি। বিশ্বের অর্ধেক মানুষ নারী। তাই অনিবার্যভাবেই সঠিক উন্নয়ন নারীকে বাদ দিয়ে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। নারীর প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততায় তৈরি হোক একটি শান্তির বিশ্ব। নারীর জন্য নিরন্তর শুভকামনা।

● লেখক : উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিএমএসএস

বীর মুক্তিযোদ্ধা আরমা দত্ত এমপি

ভাইস চেয়ার, প্রিপ ট্রাস্ট

সরকারের পাশাপাশি এনজিওদের কর্মোদ্যোগেই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে উঠবে

দেশের বিশিষ্ট উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব ও জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য আরমা দত্তের জন্ম ১৯৫০ সালের ২০ জুলাই বৃহত্তর কুমিল্লার এক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তার পিতা শ্রী সঞ্জীব দত্ত ছিলেন প্রথিতযশা লেখক ও সাংবাদিক। মা প্রতীতি দেবী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী। পিতামহ শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন বিখ্যাত আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ, যিনি তৎকালীন পাকিস্তান অ্যাসেম্বলিতে সর্বপ্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছিলেন। আরমা দত্তের মাতামহ ছিলেন ব্রিটিশ সময়ের 'আইএএস' অফিসার। তিনি ময়মনসিংহ, যশোর, সিলেট ও চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আরমা দত্তের দুই মামা ঘটক ও ঋত্বিক ঘটক ছিলেন দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশেষ ব্যক্তিত্ব।

মেধাবী ছাত্রী আরমা দত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৩ সালে সমাজবিজ্ঞানে বিএ অনার্সে দ্বিতীয় স্থান এবং ১৯৭৪ সালে স্নাতকোত্তরে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি আমেরিকা থেকে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টে Experiment In International Living এর ওপর উচ্চতর ডিগ্রি নেন। আরমা দত্ত ছোটবেলা থেকেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। তিনি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান 'প্রিপ ট্রাস্ট' এর ভাইস চেয়ার। নারী জাগরণে অবদানের জন্য ২০১৬ সালে তিনি বেগম রোকেয়া পদক লাভ করেন। সমাজ উন্নয়নে আলোকিত নারী ব্যক্তিত্ব সংসদ সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আরমা দত্ত প্রত্যয়কে দেয়া সাক্ষাৎকারে যা বলেন তা এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ এই নিকট অতীতেও ছিল দারিদ্র্যপীড়িত এক উন্নয়নশীল জনপদ। বর্তমানে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দেশের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এর পেছনে নারী সমাজের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

আরমা দত্ত : বাংলাদেশ সৃষ্টিলগ্ন থেকে, অধিকার আন্দোলন থেকে নারীদের একটি অসাধারণ ভূমিকা ছিল। সেটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হলো মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে নারীদের এই সম্পৃক্ততা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু হয় ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। সেই ভাষা আন্দোলনেও অসংখ্য নারীর অংশগ্রহণ ছিল। তবে এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীসহ সচেতন নারীরা অংশ নিয়েছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, পাবনা পুরো বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) নারীরা জেগে ওঠে। তাদের সবার নাম আমরা জানি না। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন– ড. সুফিয়া আহমেদ, রোকেয়া কাজী, রওশন আরা বাচ্চু, প্রতিভা মুৎসুদ্দী এরকম বহু নারী আছেন যারা সে সময় বন্দুকের নলের মুখে দাঁড়িয়ে থেকে আন্দোলন শুরু করেন। তারপর ৪৮ থেকে ৫২-তে যখন পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের সরাসরি গুলি করা শুরু করল তখন থেকে নারীরা বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গন থেকে তারা এর প্রতিবাদে সক্রিয় ভূমিকা রাখা শুরু করলো।

শিক্ষাঙ্গন ছাড়াও সে সময় অসাধারণ কিছু নারী ছিলেন যাদের নেতৃত্বে প্রাতিষ্ঠানিক নারী জাগরণের একটা ধারা বইতে শুরু করে। প্রথম নাম হলো কবি বেগম সুফিয়া কামাল; তারপর ইলামিত্র, হেনা দাস, ড. নীলিমা ইব্রাহিমসহ এমন অনেক নাম। সে সময় কিন্তু কোনো এনজিও বা অন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম ছিল না। সুশীল সমাজ থেকে এ জাগরণটা শুরু হয়। সে সময় চেতনার উৎস ছিল যে জনগণকে তাদের প্রাপ্য থেকে ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের শোষণ করা হচ্ছে এবং তারা একচেটিয়াভাবে ক্ষমতা ব্যবহার করছে। সে সময় অনেক নারী নেতৃত্ব আসে। তার মধ্যে নুরজাহান মোর্শেদ একজন।

তারা কিন্তু যুক্তফ্রন্টের সময় সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। তাঁর মধ্যে পাবনার সেলিনা বানু, বদরুন নেছা আহমেদ (যার নামে বদরুন নেছা কলেজ), নুরজাহান মোর্শেদ এ রকম ৭ জন নারী একেবারে সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আবির্ভূত হয়। তিনটি জায়গা থেকে অর্থাৎ রাজনীতি, শিক্ষাঙ্গন এবং সুশীল সমাজ থেকে নারী জাগরণের বিশাল জোয়ার সৃষ্টি হয়। সেই ধারাবাহিকতায় ছেষট্টির ৬ দফা আন্দোলন শুরু। এর ধারাবাহিকতায় আন্দোলন অনেক দানা বেঁধে ওঠে, যেখানে নারীদের অনেক বেশি সম্পৃক্ততা ছিল। '৬৯-৭০ এর আন্দোলনটা ছিল নারী জাগরণের একটা চূড়ান্ত রূপ। এখানে পুরুষ-নারী বলে কিছু ছিল না। সে সময় দেশপ্রেমে কে নারী কে পুরুষ এর কোনো বিভাজন ছিল না।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের স্বাধীনতার ডাকের পরে যখন মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলন শুরু হয় তখন একেবারে বাঁধ ভেঙে যায়। সেই আন্দোলনে আমরা দেখি ছাত্রী নেত্রী ছিলেন আয়শা আপা, মালেকা আপা এমন আরো অনেকে। সে সময় আরো ছিলেন আইভি আপা, মমতাজ আপা, মতি আপা, রাফেয়া আক্তার ডলি আপা– তখন অন্যরকম একটা জাগরণ শুরু হয়ে যায়। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য নারী অংশগ্রহণ করে। আগরতলায় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম যে ক্যাম্প হয় সেখানে হাসপাতাল তৈরি হয়। সেই হাসপাতালে ছিল নারী ডাক্তার, নারী নার্স। উল্লেখযোগ্য হলো কবি সুফিয়া কামালের মেয়ে সুলতানা কামাল, তার বোন টুলু, ক্যাপ্টেন সিতারা– এরা সবাই মিলে ওখানে কাজ করেন।

এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে নারীরা সরাসরি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিরিন বানু এবং তার সাথে আরো অনেকেই ছিল। কিন্তু অনেকেই সম্মুখ ক্ষেত্রে সরাসরি যুদ্ধে না নামলেও অন্যরকমভাবে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তখন দেখি যে সেই ক্ষেত্র থেকে নারীরা নানাভাবে ক্যাম্পে অংশ নিচ্ছে, ট্রেনিং নিচ্ছে, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে। বিশেষ করে শরণার্থীদের সাহায্য করছে যেখানে আমিও সরাসরি কাজ করেছি।

এই যুদ্ধে বিভিন্ন শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করেছিল। তারা গান গেয়ে সবাইকে জাগ্রত করত। মুক্তির গান নামে অসাধারণ একটি ডকুমেন্টারিতে সেই আলেখ্য আমরা দেখতে পাই। শাহীন সামাদ, লুবনা, তাজিন মোরশেদ এরকম বহু মেয়ে তখন গ্রামে-গঞ্জে পায়ে হেঁটে, ভ্যান গাড়িতে চড়ে জাগরণের গান, মুক্তির গান গেয়ে শোনাত। এভাবে তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, দেশের স্বাধীনতার পক্ষে পাশে থেকেছে। এভাবেই ১৯৭১-এ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ শহিদ হয়েছিল। যেখানে ৩ লাখ নারী সম্ভ্রম হারিয়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে নারীদের ওপর কি বিরাট ধরনের যে অত্যাচার হয়েছে সেটি আমরা এখন খুব একটা মনে করি না এবং সেই জায়গাটাকে সম্মানও দেই না। কারণ, আমাদের সমাজটা এখনো সেভাবে তৈরি হয়নি। এটি শুধু কনটেক্সট না, পুরো মনোজগতেই সমস্যা। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এর মূল্যায়ন সেভাবে আসেনি।

এভাবে যখন দেশ স্বাধীন হলো তখন একটা বিধ্বস্ত অবস্থায় আমরা নারীদের

পেলাম কিন্তু নারীরা তখন যোদ্ধার বেশে এসে গেছে। আমি বলি দুর্গার বেশে। দশ হাতে নারীরা দুর্গার মতো আবির্ভূত হন এবং সেক্ষেত্রে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু একটি অসাধারণ সংবিধান সৃষ্টি করলেন। সেখানে পরিষ্কার করে লিপিবদ্ধ করে গেলেন বাংলাদেশে পুরুষ এবং নারী সমান। যা পৃথিবীর অনেক দেশেই নেই। সেই জায়গাটায় আমাদের সম্মান দেয়া উচিত। এরপর বঙ্গবন্ধু একটা নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র করলেন, যেখানে বিশেষ করে ধর্ষিতা নারীরা আশ্রয় পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে সেটি নারীদের জন্য সংস্থা ও মন্ত্রণালয় হয়েছে। একটি অসাবধ কষ্টের কাহিনি, যে কাহিনি আমরা কেউ উচ্চারণ করি না। কারণ আমরা বলতে লজ্জা পাই যে আমাদের নারীরা কি পরিমাণ মূল্য দিয়েছে। তাদের কি কোনো মূল্যায়ন হয়েছে? হয়নি। সেই জায়গা থেকেই দেখছি যে প্রথমবারের মতো নারীর জন্য একটা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রটাই পরে মন্ত্রণালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেই সময় অনেক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল যাদের অনেককেই অ্যাডাপ্টেশন করে পরবর্তীতে নিয়ে যায় এবং অনেক মহিলা পাগল হয়ে গেছে, মৃত্যুবরণ করেছে আমরা তাদের ঠিকানা জানি না, তাদের মনে করি না। এভাবেই শুধু উন্নয়নে নয়, এ দেশ স্বাধীন করতেও নারী সমাজ বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে।

যখন আমাদের এনজিও কার্যক্রম অর্থাৎ সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনের উৎপত্তিটা শুরু হয় সেই উৎপত্তিটা ছিল খুবই চমকপ্রদ। এটির সাথে যে সব নারীরা মুক্তিযুদ্ধের সময় কাজ করেছিল যাদের বয়স ১৬ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে ছিল সেসব নারীরা দেশ ধ্বংসের চূড়ান্ত অবস্থায় শুরু করল একটি কাজ– তিনজন তিনটি কাজ শুরু করে– ১. লুথেরান চার্চ প্রথমে শুরু করে আরডিআরএস রংপুর-দিনাজপুরে। সেখানে বিশাল আকারে ক্ষতি হয়েছিল এবং হতদরিদ্র সেখানে বেশি ছিল। তার সাথে সাথে কাজ শুরু করে কারিতাস। এর পরপরই শুরু করেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র নামে। বঙ্গবন্ধু ডা. জাফরুল্লাহকে সাভারে একটি জায়গা দেন যারা হাত-পা হারিয়ে পঙ্গু হয়েছে তাদের চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতাল করার জন্য। তখন সেখানে একজন বিখ্যাত অর্থোপেডিক ডাক্তারকে নিয়ে আসা হয় এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়। তখন যে মেয়েরা পুনর্বাসন ক্যাম্পে ছিল তারা গণস্বাস্থ্যের নার্স হিসেবে, মোটিভেটর হিসেবে কাজ শুরু করে। এটা হলো একটা দিক। আরেকটি দিক হলো আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার ড. ফজলে হাসান আবেদ– উনি শুরু করেন আরেকটি অসাধারণ কাজ। সেটি হলো সুনামগঞ্জের শাল্লায় অনেক সংখ্যালঘু ছিল, যুদ্ধের সময় হানাদার ও তার দোসররা সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে অস্তিত্বহীন করে দেয়। যুদ্ধ শেষে যখন কাতারে কাতারে লোকজন নিজ গৃহে

শুধু নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রেই নয়, দেশের উন্নয়নেও নারীরা যে কতোভাবে এগিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। তারা দিকনির্দেশনা দিচ্ছে, সংগঠন পরিচালনা করছে, জিডিপি থেকে শুরু করে সব জায়গায় তারা অবদান রাখছে। নারী এবং শিশুদের অধিকার আদায়ে নারীরা সোচ্চার। সেখানে আমরা শুধু তাদের সামাজিক জায়গাটা দেখছি না; তাদের সামাজিক ক্ষমতায়ন দেখছি না, দেখছি তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় আর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। এই তিনটি না হলে নারীর ক্ষমতায়ন হয় না। এভাবেই নারীরা বাংলাদেশে বিশাল অবদান রেখে চলেছে এবং পৃথিবীতে একটি মডেল তৈরি হয়েছে যা সর্বজনস্বীকৃত।

ফিরে আসছিল, তাদের খোলা আকাশ ছাড়া আর কিছু ছিল না। তখন আবেদ ভাই শুরু করলেন রিহ্যাবিলিটেশনের কাজ। শুরু হলো এনজিওর জয়যাত্রা। শুরু হলো সমাজের সর্বস্তরের সবাইকে নিয়ে কাজ করা এবং সরকারের সাথে সাথে বেসরকারি উদ্যোগেও দেশকে কীভাবে পুনর্গঠন করা যায় সেই উদ্যোগ। এটার একটা জোয়ার আসে। সেটা সত্তরের দশকে। তখন আমরা বহু মেয়েরা কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। পাস করে তখন মনে হলো যে, আমরা মাটির মানুষের সাথেই থাকবো। মাটির মানুষের সাথে থাকতে হলে আমাদের তাদের সাথেই কাজ করতে হবে। ছেলে এবং মেয়ে বলে কোনো বিভেদ থাকবে না। রাষ্ট্র গঠনে সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে কীভাবে কাজ করা যায় সেটা ছিল লক্ষ্য। সাধারণ মানুষের একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে দেখতে পেলাম যে, নারী উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ততা। যেটি একটি গভীর আন্দোলন সৃষ্টি করে।

সে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা দেখছি যে শুধু নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রেই নয়, দেশের উন্নয়নেও নারীরা যে কতোভাবে এগিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। তারা দিকনির্দেশনা দিচ্ছে, সংগঠন পরিচালনা করছে, জিডিপি থেকে শুরু করে সব জায়গায় তারা অবদান রাখছে। নারী এবং শিশুদের অধিকার আদায়ে নারীরা সোচ্চার। সেখানে আমরা শুধু তাদের সামাজিক জায়গাটা দেখছি না; তাদের সামাজিক ক্ষমতায়ন দেখছি না, দেখছি তাদের রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। এই তিনটি না হলে নারীর ক্ষমতায়ন হয় না। এভাবেই নারীরা বাংলাদেশে বিশাল অবদান রেখে চলেছে এবং পৃথিবীতে একটি মডেল তৈরি হয়েছে যা সর্বজনস্বীকৃত। নোবেল লরিয়েট অমর্ত্য সেন বলেন, 'বাংলাদেশ ইজ দ্য বেস্ট কেস প্লেস ফর উইম্যান এম্পাওয়ারমেন্ট' এবং এই নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আমরা দেশে-বিদেশে স্বীকৃত।

প্রত্যয় : আপনি দেশখ্যাত একজন উন্নয়নকর্মী ও রাজনীতিবিদ, বর্তমান জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য এবং গ্রিন ট্রাস্টের ভাইস চেয়ার। কোন কোন সমস্যা দেশের নারী উন্নয়নে বাধা হিসেবে কাজ করছে বলে আপনার অভিমত?

আরমা দত্ত : প্রথমত বলতে চাই আমরা অনেক এগিয়েছি। শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীতেই বাংলাদেশের আরএমজি সেক্টর বা গার্মেন্টস খাত দ্বিতীয় বৃহত্তম। সেখানে বাংলাদেশের নারীরা ভিত্তিশিল্পে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অবদান রাখছে। কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য সব জায়গাতে তারা অবদান রেখে চলেছে। রাজনীতিতেও নারীদের পদচারণা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখছি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী, স্পিকার নারী, নারী ডেপুটি লিডার, বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী এবং তার সাথে আছে ৭৩ জন নারী সংসদ সদস্য। যা পৃথিবীর কোনো দেশে নেই। নারীর অবদান, নারীর পদচারণ, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর দাবির কথা নারীর সাথে সাথে পুরুষরাও বলবে। নারীদের কথায় পুরুষরা প্রভাবান্বিত হয়।

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা এখনো পুরোপুরি নারীবান্ধব নয়, কিন্তু সমস্যা আছে। তারপরও বলবো মন্দের ভালো না হলে এতোটা এগোলাম কী করে। পাঁচ লাখ নারী ধর্ষিত হয়েছে, নানাভাবে তারা অত্যাচারিত হয়েছে, অনেক নারীদের মেরে ফেলা হয়েছে। তাদের রক্তের, তাদের হাহাকারের ওপর দাঁড়িয়ে এখনো জানতে পারি না যারা নারী নেত্রী, যারা নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে তাদের কোনো একটা সংকলন নেই। তা হলে আমরা কি করলাম আর অন্যরাই বা কি করছে? ৮ মার্চ এলে ব্যানার টানিয়ে, বেলুন উড়িয়ে শুধু বকবক করছে যার কোনো মূল্যই নেই। পুরুষদেরকে আমরা এখনো সচেতন করতে পারিনি। আবার এনজিও সেক্টরের পুরুষরা অনেক বেশি সচেতন। কারণ, তারা নারীদের সাথে সমভাবে কাজ করে অভ্যস্ত। নারীদেরকে সম্মান করতে তাদেরকে প্রথম থেকেই শেখানো হয়েছে। কিন্তু সরকারি বা অন্য কোনো জায়গায় নারীদেরকে সবসময় অধীনস্থ করে রাখা, সেভাবে সম্বোধন করা এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। কিন্তু আমাদের সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনের পরিবেশটা একটু আলাদা এবং সেখানে অন্যরকম ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। এই সংস্কৃতিটা যদি সমাজের অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে দেয়া যেতো তা হলে আরো ভালো হতো।

প্রত্যয় : বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির আলোকে ভবিষ্যতে রাজনীতিতে নারী জনগোষ্ঠীর অধিকতর সক্রিয় অংশগ্রহণের সম্ভাবনা কতোটুকু বলে আপনি মনে করেন?

আরমা দত্ত : আমি মনে করি বিশাল। কারণ, নারীদের পাশাপাশি পুরুষ ভোটারদের ভোটেও কিন্তু নারীরা নির্বাচিত হয়ে আসছে। এটি একটি বড় সূচক। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাকালে দেখা যাবে যে, মেয়েরা প্রায় শতভাগ শিক্ষিত এবং আমি মনে করি শিক্ষাই আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বিশেষভাবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষে। প্রত্যেকটি ইউনিয়ন পরিষদে ১৩ জন করে মেম্বার আছে, তার মধ্যে তিনজন করে নারী সদস্য। সেখানে প্রায় ১২ হাজার নারী, ইউনিয়ন পরিষদে একেবারে কমিউনিটি লেভেলে ক্ষমতায়ন ঘটেছে। তাদেরকে সমাজ লিডার হিসেবে মানছে।

প্রত্যয় : এ কথা সত্য যে, একটি দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য অনেক বড় অন্তরায়। এ সমস্যাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করছেন? সমস্যার আঙ্গিকে আপনার প্রস্তাবনা কি?

আরমা দত্ত : লিঙ্গবৈষম্য একটি শারীরিক এবং মানসিক সংস্কৃতি, সব দেশেই এটি আছে। আমি মনে করি এই জায়গাটাকে আমরা মানসিকভাবে জয় করতে পেরেছি। তারপরও আমাদের আরো বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। যেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নানাভাবে গুরুত্ব ও প্রতিকারের নির্দেশনা দিচ্ছেন এবং

স্মার্ট বাংলাদেশ এমন একটি কথা যেটি হলো স্মার্ট নারী-পুরুষের সমন্বয়ে একটা রাষ্ট্র যেটি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা। তাঁর সেই স্বপ্নের দেশ গঠনেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরেক ধাপ ওপরে নিয়ে যাচ্ছে যে বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ মানে যে বাংলাদেশ আর অনাহারে থাকবে না, যে বাংলাদেশে কোনো বৈষম্য থাকবে না, যে বাংলাদেশ পৃথিবীর সমস্ত টেকনোলজির সাথে তাল মিলিয়ে আরো উন্নয়নের দিকে এগোবে।

নারীরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তাদের কর্মস্থলে যোগ্যতা প্রমাণ করছে। আগে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদেরকে দেখেছি কিন্তু রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে সেভাবে দেখিনি। আজ আমরা ব্যুরোক্রেসি, আর্মি, পুলিশ, জুডিশিয়ারি, পিস কিপিংয়ে নারীদেরকে দেখছি। আমাদের মেয়েরা এভারেস্ট জয় করেছে, আট হাজার ফিট ওপরে উঠে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছে- ভাবা যায়! নারী উন্নয়নে যে ধারাবাহিকতা এটা একদিনের ঘটনা না। পুরুষদেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে, আগের মতো ঘরে বসে না থেকে স্ত্রীদের বিভিন্ন কাজে সহায্য করে। এটা ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে এবং আরো হবে। আমাদের প্রয়াত বেগম রোকেয়া শাখাওয়াৎ অনেক কথাই বলে গেছেন, তার মধ্যে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। সেটি অক্ষরে অক্ষরে বাংলাদেশের জন্য সত্য। উনি বলেছেন, 'আজ হইতে একশ বছর পরে তোমরা দেখিবা এই বঙ্গদেশে নারীরা ডাইসরয় হইবে, নারীরা ম্যাজিস্ট্রেট হইবে, নারীরা ডাক্তার হইবে, নারীরা সর্বক্ষেত্রে দেশ চালনা করিবে এবং আমি জানি এদিন বেশি দূরে নয়'। সত্যিই আমাদের নারী ডাইসরয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ আমরা নারী ম্যাজিস্ট্রেট দেখছি, নারী জাজ দেখছি, নারী সেক্রেটারি দেখছি, নারী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল দেখছি, পুলিশের এডিআইজিসহ পিস কিপিংয়ে নানা পর্যায়ের কর্মকর্তা দেখছি যারা অগ্রগামী রোল প্লে করছে। কোন জায়গাতে নারীরা নেই? ব্যাংকিং থেকে শুরু করে এনজিও সেক্টর সব জায়গাতেই নারীরা আছে।

প্রত্যয় : স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে নারীর ভূমিকা ও নারীর উন্নয়নে স্মার্ট বাংলাদেশের ভূমিকা এ পারস্পরিক সম্পর্ককে আপনি কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন?

আরমা দত্ত : স্মার্ট বাংলাদেশ এমন একটি কথা যেটি হলো স্মার্ট নারী-পুরুষের সমন্বয়ে একটা রাষ্ট্র যেটি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা। তাঁর সেই স্বপ্নের দেশ গঠনেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরেক ধাপ ওপরে নিয়ে যাচ্ছে যে বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ মানে যে বাংলাদেশ আর অনাহারে থাকবে না, যে বাংলাদেশে কোনো বৈষম্য থাকবে না, যে বাংলাদেশ পৃথিবীর সমস্ত টেকনোলজির সাথে তাল মিলিয়ে আরো উন্নয়নের দিকে এগোবে। শুধু এগোবে না লিডারশিপ দেবে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে ক্লাইমেট চেঞ্জ থেকে আরম্ভ করে এসডিজিতে লিডারশিপ দিচ্ছে। এটাই স্মার্ট বাংলাদেশে নারীর অবদান। সেখানে আমরা দেখতে চাই নারীদের ৫০%-৫০% অবদান। এখানে যেনো কোনো বৈষম্য না থাকে।

দেখুন কোভিডকালে নারীরা ঘরে বসে অনলাইনে ব্যবসা করে তাদের সংসার বাঁচিয়েছে। আমি মনে করি স্মার্ট বাংলাদেশ হবে একটা সম্মিলিত জায়গা যেখানে নারী-পুরুষ দুই কদমে একসাথে এগিয়ে যাবে। তেমনি নারীরা বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে আরো বেশি অবদান রাখবে। বিশেষ করে নারী লিডারশিপের ক্ষেত্রে, ডিসিশন মেকিংয়ের ক্ষেত্রে।

প্রত্যয় : বর্তমানে নারীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্যোক্তাসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। কর্মক্ষেত্রকে নারীবান্ধব রাখার জন্য সরকারের ভূমিকা এবং আপনার নিজস্ব প্রস্তাবনা জানতে চাচ্ছি।

আরমা দত্ত : নারীদের প্রতি বৈষম্য দূর করতে হলে শিশুকাল অর্থাৎ পরিবার থেকে শুরু করতে হবে। তারপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র এর প্রয়োগ ঘটাতে হবে। বর্তমানে এখানে বেশ ঘাটতি আছে। প্রত্যেকটি ধর্মে আছে নারীর অধিকার সব থেকে বড়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলে গেছেন, মায়ের পায়ের তলায় সন্তানের বেহেস্ত। তার মানে নারীকে সব থেকে বেশি মর্যাদা দিতে হবে এবং সেই জায়গা থেকে আমি মনে করি যে, নারীর ক্ষমতায়নে পুরুষদের অনেক মানসিক পরিবর্তন দরকার। বর্তমানে তাদের অনেক মানসিক পরিবর্তন হয়েছে সত্য, তবে আরো হতে হবে। কারণ সে তার সঙ্গী, সে তার সাব-অর্ডিনেট না। একজন নারী একজন পুরুষের ফিলোসফিক্যাল গাইড এবং টিচার। সেই জায়গাটাকে ধারণ করতে হবে। তাই প্রাতিষ্ঠানিক জায়গা থেকে এই ক্ষেত্রগুলোতে আরো গভীরভাবে শিক্ষা নিতে হবে। যেন শিশুমন থেকেই বিভেদ সৃষ্টি না হয়।

প্রত্যয় : দেশে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলো (এনজিও/এমএফআই) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখায় গ্রামীণ নারীরা আত্মকর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ভূমিকা রাখছে। নারীর ক্ষমতায়নে এনজিও/এমএফআই সেক্টরের এই কার্যক্রমকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

আরমা দত্ত : এনজিও/এমএফআই এর এই কার্যক্রমকে আমি মনে করি খুবই ইতিবাচক প্রচেষ্টা। নারীরা প্রতিটি পয়সা কেমন করে উৎপাদনমুখী হতে পারে সেটা দেখে। ফলে আজ মাইক্রোক্রেডিট ইনস্টিটিউটগুলো দাঁড়িয়ে গেছে নারীদের কারণে, এটা আমি মনে করি। বিশেষ করে নারীরা সবসময় ভাবে একটি পয়সাও যেন অপচয় না হয়। এটা ঘরের উন্নয়ন থেকে শুরু করে দেশের উন্নয়নেও লক্ষণীয়। সুতরাং এই জায়গাটাকেই আমি মনে করি যে এমএফআই একটা বড় হাতিয়ার। কিন্তু এটাকে আরো নারীবান্ধব করার প্রয়োজন আছে, এখানে মহিলাদেরকে আরো সম্পৃক্ত করতে হবে। সরকারের পাশাপাশি এনজিও/এমএফআইদের এই কর্মোদ্যোগের মাধ্যমেই আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে উঠবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।■

জাকিয়া সুলতানা

সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে নারীরা

বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জাকিয়া সুলতানা একজন প্রজ্ঞাবান, কর্মোদ্যোগী এবং স্বপ্নদর্শী নিষ্ঠাবান সচিব ব্যক্তিত্ব। তারুণ্যে উজ্জীবিত মেধাবী জাকিয়া সুলতানা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ১০ম ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা হিসেবে ১৯৯১ সালে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। তিনি মাঠ প্রশাসনে বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন।

আত্মপ্রত্যয়ী প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব জাকিয়া সুলতানা শিল্প মন্ত্রণালয়ে যোগদানের আগে সচিব হিসেবে বাংলাদেশে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ২০২১ সালের ১৬ মে শিল্প সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জাকিয়া সুলতানা বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র, বারডেম, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন। ছাত্র জীবনের মেধাবী ছাত্রী জাকিয়া সুলতানার জন্ম ১৯৬৮ সালে নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলায়। তার বাবা খন্দকার আফজাল আলী ও মা আনোয়ারা বেগম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল রিসার্চ (আইপিজিএমআর) থেকে পরীর বিদ্যায় ১৯৮৯ সালে বিএসসি এবং ১৯৯১ সালে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৭ সালে পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন।

জাকিয়া সুলতানা দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজের কর্ম প্রয়াসকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি কর্মসূত্রে পৃথিবীর অনেক দেশ ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছেন। সম্প্রতি প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেধাবী প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো:

প্রত্যয় : বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় নারী সমাজ কতোটা ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন?

জাকিয়া সুলতানা : দেখুন, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। এই নারী সমাজের এক বিপুল অংশ শিক্ষার পিছিয়ে থাকলেও দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। মুক্তিযুদ্ধেও নারীরা সরাসরি যুদ্ধসহ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও খাবার দিয়ে সহযোগিতা করেছে। স্বাধীনতার পর দেশের নারী সমাজ শিক্ষায় অনেক এগিয়ে এসেছে। ফলে ভিন্ন ভিন্ন কর্মপেশায় নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীরা আজ প্রশাসন বলি, স্বাস্থ্য খাত বলি, ইঞ্জিনিয়ারিং, অধ্যাপনা, সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনীসহ পুলিশের অনেক দায়িত্বশীল পদে কাজ করছেন। নারীরা বিমান চালাচ্ছেন, সাম্প্রতিক সময়ের মেট্রোরেলের চালকের দায়িত্বও পালন করছেন নারী। আবার গ্রামে গেলে দেখতে পাবেন মাঠেও নারীরা কাজ করছে, কৃষি উৎপাদন থেকে শুরু করে গার্মেন্টস খাতেও নারী রেখে যাচ্ছে স্বর্ণোজ্জ্বল ভূমিকা। অর্থাৎ দেশ আজ যে এগিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে তার পেছনে নারী সমাজের অবদান ব্যাপক। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীরা এখন সংখ্যায় অধিক এবং ফলাফলে তারা মেধা তালিকায় ভালো স্বাক্ষর রাখছে। আমি মনে করি, দেশের উন্নয়নে নারীরা অনেক অবদান রাখছে।

মধ্যম আয়ের দিকে যাচ্ছে এর পেছনে নারী সমাজের অবদান অনেকখানি।

প্রত্যয় : সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ঘোষণা করেছে। সেক্ষেত্রে নারী সমাজকে কর্ম শক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য কি কি উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন?

জাকিয়া সুলতানা : স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে নারীরা। তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের কারণে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নারীদের পারদর্শী হতে হবে। শিক্ষা, দক্ষতা ও মেধা দিয়ে শিল্প কাজের ক্ষেত্রে সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বিশেষভাবে দক্ষতা অর্জন করতে পারলে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারবে।

বর্তমানে পুরুষের তুলনায় কম সংখ্যক নারী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে পড়াশোনা করেন। দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের পেশাজীবীদের মধ্যে নারীর সংখ্যা মাত্র ১২ শতাংশ। তবে নারীরা এখন গ্রামে বসে মোবাইলের সাহায্যে অনলাইনে ব্যবসা করছে। বিকাশে টাকা লেনদেন করছে। মেয়েরা অনলাইনে ক্লাস করছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুযোগ কাজে লাগিয়ে নারী সমাজকে কর্ম শক্তিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে লেটওয়ার্কিং বাড়ানোর ওপর ইতিমধ্যে নারী উদ্যোক্তাদের সব প্রকার সুবিধা প্রদান করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন

> অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নারীরা সমাজ ও পরিবারে তার অবস্থান দৃঢ় করতে সবসময়ই আগ্রহী। এটা সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম সূচক। দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে গেলে নারী-পুরুষ সবাইকে তার শ্রম, সময়, অর্থ ব্যয় এবং অভিমত ব্যক্ত করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। তবে নারীদের কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে এবং বিশেষ করে এটি হচ্ছে শিল্প খাতে। শিল্প কারখানাকে নারীবান্ধব করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাধীনতার পর নারীরা অধিক সচেতন হয়েছে এবং জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন ধারার তারা সম্পৃক্ত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের এক বিশাল বিপ্লব ঘটে গেছে। স্বাধীনতা মুহূর্তে শিক্ষার হার যেখানে ছিল ১০% এরও নিচে সেখানে এখন এই হার ৭৬% এর বেশি এবং আশার বিষয় নারী শিক্ষার হারও ৭৫% এর ওপরে। আমি বিশ্বাস করি নারীর শিক্ষা যতো বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং তারা যতো বেশি প্রাতিষ্ঠানিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হবে, দেশের উন্নয়ন ততোই ত্বরান্বিত হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয়েছে। আমাদের গার্মেন্টস শিল্প, ওষুধ শিল্প, চা শিল্পসহ দেশের বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় নারীরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কাজ করছে। নারীর কর্মসম্পৃক্ততার ফলেই দেশ আজ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দেশে এখন ছোট-বড় সব পর্যায়ে অসংখ্য নারী উদ্যোক্তা রয়েছে যারা লাখ লাখ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, দেশের জাতীয় উৎপাদনে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। তদুপরি দেশের কৃষি খাতে আবহমানকাল ধরেই নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, বাংলাদেশ আজ যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ থেকে

দপ্তর/সংস্থা বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশনকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিটাককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এতে করে পুরুষের পাশাপাশি নারী সমাজের অগ্রগতি নিশ্চিতকরণের পথ সুগম হয়েছে।

প্রত্যয় : আপনি শিল্প সচিবের দায়িত্বে রয়েছেন। শিল্প-কারখানাকে নারীবান্ধব রাখার ব্যাপারে আপনার প্রস্তাবনা কি?

জাকিয়া সুলতানা : অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নারীরা সমাজ ও পরিবারে তার অবস্থান দৃঢ় করতে সবসময়ই আগ্রহী। এটা সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম সূচক। দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে গেলে নারী-পুরুষ সবাইকে তার শ্রম, সময়, অর্থ ব্যয় এবং অভিমত ব্যক্ত করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। তবে নারীদের কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে এবং বিশেষ করে এটি হচ্ছে শিল্প খাতে। শিল্প-কারখানাকে নারীবান্ধব করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) 'সার্ভে অব ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ' (এসএমআই) নামের জরিপের তথ্য মতে শিল্প প্রতিষ্ঠানে

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলোর সহায়তায় গ্রামাঞ্চলে কিছু সংখ্যক নারী নিজের আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি নানা ধরনের ব্যবসায় নিয়োজিত হয়ে আশাব্যঞ্জক সাফল্য অর্জন করেছেন। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে বলিষ্ঠ অবদান রাখার পরও এসএমই ব্যবসায় নারী উদ্যোক্তারা মূল ধারায় আসতে পারছেন না আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে। এসব প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানে উদ্যোগ নিতে হবে।

কর্মপরিবেশের উন্নতি ঘটছে দিন দিন। নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থানেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সেক্টরে বিদ্যমান কারখানাগুলোতে লিঙ্গ অনুপাত নির্ধারণ করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি। কিছু কিছু শিল্প-কারখানায় নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের অনুপাত নির্ধারিত থাকলেও অনেক শিল্প-কারখানায় তা মেনে কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় না। তবে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা উচিত যে কর্মশক্তির একটি নির্দিষ্ট শতাংশ নারী কর্মচারী হতে হবে।

শিল্প-কারখানাগুলোতে মহিলাদের জন্য আলাদা বিশ্রামাগার, ডে কেয়ার সেন্টার এবং মহিলাদের প্রয়োজন অনুসারে সুসজ্জিত চিকিৎসা সুবিধার মতো মৌলিক সুবিধা থাকা অপরিহার্য। নারী কর্মীদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। আজকাল মহিলারাও দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে বা রাতে কাজ করে। তৎপ্রেক্ষিতে অবশ্যই অফিস প্রাঙ্গণে এবং আশপাশে পর্যাপ্ত নিরাপত্তাকর্মী, নজরদারি ও নিরাপত্তার মধ্যে যথাযথ ব্যবস্থা প্রদানের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

নারী কর্মীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। কমপ্লায়েন্ট, নন-কমপ্লায়েন্ট সব ধরনের কারখানায় বাধ্যতামূলকভাবে নারী সুপারভাইজার থাকতে হবে। পোশাক শিল্প খাতের মূল চালিকাশক্তি বিশাল নারী কর্মীদের স্বাস্থ্যসহ সব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে হয়রানির ঘটনা বন্ধ করার জন্য যৌন হয়রানি কমিটি গঠন করতে হবে যাতে এ ধরনের যেকোনো অপকর্মের প্রতি শূন্য সহনশীলতা প্রদর্শন করা অনেক সহজ হয়। এতে করে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হবে অর্থাৎ একটি নারীবান্ধব শিল্প-কারখানার পরিবেশ স্থাপন সম্ভবপর হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন : দেশে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখায় গ্রামীণ নারীরা আত্মকর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ভূমিকা রাখছে। নারীর ক্ষমতায়নে এই কার্যক্রমকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

জাকিয়া সুলতানা : বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে গ্রামীণ অর্থনীতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। সে কথা আরো একবার প্রমাণিত হয়েছে মহামারি করোনাকালে। খাদ্য সংকটের সম্ভাবনাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার এক অবিশ্বাস্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে কৃষি খাত। কৃষি, শিল্প ও সেবার অর্থনীতির বৃহত্তর এই তিন খাতে নারীরা কাজ করছে। তবে উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ বাড়লেও নারী কর্মীদের বেশিরভাগই শ্রমজীবী। তবে শ্রমবাজারে নারীর একটা বড় অংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত। যেমন কর্মজীবী নারীদের অর্ধেকের বেশি কৃষিকাজে সম্পৃক্ত। নারীরা কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত ২১টি ধাপের মধ্যে মোট ১৭টি ধাপেই কাজ করে থাকেন। ফসলের প্রাক-বপন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে ফসল উত্তোলন, বীজ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণনের সঙ্গে নারীরা কাজ করেন। কর্মক্ষম নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নারী কৃষিকাজে নিয়োজিত রয়েছেন। ঘরোয়া ও গ্রামীণ পরিবেশের হওয়ায় তারা সহজেই এ পেশার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারেন। তাছাড়া বর্তমানে গ্রামাঞ্চলের পুরুষরা অধিক উপার্জনের আশায় শহরকেন্দ্রিক বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হওয়ার কারণে তাদের পারিবারিক কার্যাবলি নির্বাহ করার পাশাপাশি খাদ্য ও সামগ্রিক চাহিদা পূরণের জন্য নারীদের বিভিন্ন ধরনের কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত হতে হচ্ছে। পশুপালন, মৎস্য চাষ, খামার প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজে নারীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখছে।

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলোর সহায়তায় গ্রামাঞ্চলে কিছু সংখ্যক নারী নিজের আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি নানা ধরনের ব্যবসায় নিয়োজিত হয়ে আশাব্যঞ্জক সাফল্য অর্জন করেছেন। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে বলিষ্ঠ অবদান রাখার পরও এসএমই ব্যবসায় নারী উদ্যোক্তারা মূল ধারায় আসতে পারছেন না আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে। এসব প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানে উদ্যোগ নিতে হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি গত ৫০ বছরে আজকের যে সমৃদ্ধ পর্যায়ে পৌঁছেছে তার পেছনে পোশাক শিল্প খাতে নিয়োজিত বিপুলসংখ্যক নারী শ্রমশক্তির অবদান অনস্বীকার্য। তবে পোশাক শিল্প ছাড়াও কৃষি কিংবা সেবা খাত, বিশেষ করে খামারভিত্তিক কৃষি কিংবা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশে গ্রামীণ নারীদের শক্তিশালী ভূমিকা পালনের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার সময় এসেছে। যদি তারা বাজারকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পান, তা হলে এর মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে আরো শক্তিশালী অবদান রাখতে পারবেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সর্বোপরি গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতের জন্য নিরাপদ ও নারীবান্ধব বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

রাফেয়া আক্তার ডলি

সাবেক এমপি ও হুইপ

মুক্তিযুদ্ধে নারীরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে খাবার তুলে দিয়েছে সন্তানতুল্য মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে

রাফেয়া আক্তার ডলি। সাবেক এমপি এবং জাতীয় সংসদের সাবেক হুইপ। টাঙ্গাইলের এক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষিত ও রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান রাফেয়া আক্তার ডলি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুখোড় ছাত্রনেত্রীদের অন্যতম। তিনি ছাত্রলীগ রোকেয়া হল শাখার সভানেত্রী এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহ-সভানেত্রীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে যে ৭ জন নারী এমএনএ নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি তাদের অন্যতম। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি সংগঠক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি রাজপথের লড়াকু নেত্রী। রাফেয়া আক্তার ডলি কথা প্রসঙ্গে জানান, একাত্তরের মার্চের উত্তাল সময়ে তাকে ছাত্রী হলে না থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। তিনি ২৫ মার্চ রাতে বেগম সাজেদা চৌধুরীর সাথে তার ইন্দিরা রোডের বাসায় ছিলেন। সেই রাতে পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্বিচারে গুলি, আগুন, আতঙ্কিত মানুষের আহাজারি এবং হানাদারদের ফ্লাশ লাইটের আলোয় এক বিভীষিকার সৃষ্টি হয়। সেখান থেকে পরে তিনি ঢাকার তার এক আত্মীয়ের বাসায় আত্মগোপন করেন এবং হানাদারদের ফাঁকি দিয়ে গোপনে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর দেশের প্রথম জাতীয় সংসদে তিনি এমপি এবং হুইপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার স্বামী ওয়ালিউল ইসলাম সাবেক সচিব। প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন : আপনি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের এমএনএ ছিলেন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতীয় সংসদের এমপি ও হুইপ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন। আপনি একজন আলোকিত নারী ব্যক্তিত্ব, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক। স্বাধীনতা যুদ্ধে এ দেশের নারী সমাজের অবদান সম্পর্কে বলুন–

রাফেয়া আক্তার ডলি : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল সর্বজনীন যুদ্ধ। পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় শাসন, নির্যাতন, নিপীড়ন এবং অর্থনৈতিকভাবে শোষণের বিরুদ্ধে এ দেশের আপামর মানুষের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তিনি জানতেন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অবাঙালি সেনাদের কাছে অস্ত্র আছে, তারা যেকোনো মুহূর্তে বাঙালিদের ওপর আক্রমণ করতে পারে। এটি ভেবেই তিনি ৭ মার্চ তার ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ঘরে ঘরে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। স্বাধীনতার প্রশ্নে বাংলাদেশের নারী সমাজ বঙ্গবন্ধুর এই নির্দেশনাকে অক্ষরে অক্ষরে পরিপালন করেছেন। তার বড় প্রমাণ মুক্তিযুদ্ধের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোতে বাংলার নারীরা মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তারা নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভাবেননি। ভেবেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয়ের কথা, নিজেদের অভুক্ত রেখে খাবার তুলে দিয়েছেন সন্তানতুল্য মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে। সে সময়গুলোতে বাংলার নারীরা মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের আশ্রয় ও খাবার দিয়ে যে অবদান রেখেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। শত্রু কবলিত দেশের অভ্যন্তরে লড়াকু মুক্তিবাহিনী এই আশ্রয় পেয়েছে বলেই স্বাধীনতা অর্জনের পথ সুগম হয়েছে।

এ ছাড়া দেশের অনেক নারী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, অনেকেই আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সেবা করেছেন, অনেকেই হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসর আলবদর, রাজাকারদের হাতে নির্যাতিত হয়েও মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন তথ্য প্রকাশ করেননি। হানাদাররা যুদ্ধকালে লাখ লাখ নারীর শ্লীলতাহানি করেছে। স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু তাদের অনেককে বীরাঙ্গনার মর্যাদা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদানকে স্বীকৃত করেছেন। তিনি শিক্ষিতদের চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমি মনে করি, মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের নারী সমাজের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন : স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশ একদিকে যেমন ছিল অত্যন্ত দরিদ্র, তেমনি নারী সমাজ ছিল মারাত্মকভাবে উপেক্ষিত। স্বাধীনতার পর নারী সমাজের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর সরকার কি ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন?

রাফেয়া আক্তার ডলি : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ছিলেন একজন দূরদর্শী দার্শনিক ব্যক্তিত্ব। তিনি উপলব্ধি করলেন, অর্ধেক নারী সমাজকে পিছিয়ে রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি প্রথমেই মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। তাদের ভাঙা কলা প্রস্তুতের ট্রেনিং দিয়ে অসহায় হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তর করেছেন। শিক্ষিতদের চাকরির সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তিনি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে সাভারে জমির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই প্রতিষ্ঠানেও নির্যাতিত নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু নিজের অভিভাবকত্বে অনেক মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। তাদের সন্তানদের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। সেই নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রকেই ধীরে ধীরে মহিলা অধিদপ্তরে পরিণত করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় পরে মহিলা ও শিশুদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি মহিলা ক্রীড়া সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন সাজেদা চৌধুরী। আমি শুরু থেকেই এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। আগে বাঙালি মেয়েরা বিশেষ করে মুসলমান মেয়েরা খুব একটা খেলাধুলা করতো না। স্বাধীনতার পর খেলাধুলার ক্ষেত্রে মেয়েদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি হয়। আজ মেয়েরা দেশে-বিদেশে ক্রীড়া নৈপুণ্যের মাধ্যমে ব্যাপক সুনাম অর্জন করছে– দেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করছে। সাফ গেমস ফুটবলে আমাদের নারী ফুটবলাররা জয়ী হয়ে দেখিয়ে দিয়েছে তারা পিছিয়ে নেই। বঙ্গবন্ধুর সরকার সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছেন, ভোটের ক্ষেত্রেও তাদের সমঅধিকার দেয়া হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর সরকার কর্মজীবী নারীদের জন্য ধানমন্ডিতে হোস্টেল করে দিয়েছিলেন যা এখন আরো বিস্তৃত হয়েছে। আরো একটি বিষয়, মেয়েদের খেলাধুলার জন্য আলাদা কোনো মাঠ ছিল না। আমরা দাবি জানানোর পর ধানমন্ডির মাঠটি মেয়েদের দেয়া হয়। সেটি আগে আবাহনী ক্রীড়া চক্রের ছিল। পরে তারা বর্তমানে যে মাঠ সে মাঠে চলে যায়। মেয়েদের এই আলাদা মাঠ নারী ক্রীড়াবিদদের জন্য ব্যাপক সুযোগ বয়ে আনে। সেই মাঠটিই এখন দেশের উল্লেখযোগ্য ক্রীড়াঙ্গন সুলতানা কামাল ক্রীড়া কমপ্লেক্স।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ছিলেন একজন দূরদর্শী দার্শনিক ব্যক্তিত্ব। তিনি উপলব্ধি করলেন, অর্ধেক নারী সমাজকে পিছিয়ে রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি প্রথমেই মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। তাদের ভাঙা কলা প্রস্তুতের ট্রেনিং দিয়ে অসহায় হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তর করেছেন। শিক্ষিতদের চাকরির সুযোগ করে দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু নিজের অভিভাবকত্বে অনেক মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। তাদের সন্তানদের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। সেই নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রই ধীরে ধীরে মহিলা অধিদপ্তরে পরিণত করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় পরে মহিলা ও শিশুদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন : বর্তমানে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দেশের বেশ উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এর পেছনে নারী সমাজের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

রাফেয়া আক্তার ডলি : আপনি ঠিকই বলেছেন। এই দিকটা অতীতেও বিশেষ করে স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে বাংলাদেশ ছিল হতদরিদ্র একটি দেশ। মানুষের দুবেলা দুমুঠো ভাত জুটতো না, পরনে ১/২টার বেশি কাপড় ছিল না। শিক্ষার হার ছিল ১৫% এরও নিচে। এর মূল কারণ ছিল পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর উন্নয়নে অবহেলা ও শোষণ। এজন্য বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বারবার দেশের এই হতদরিদ্র মানুষগুলোর ভাগ্যের উন্নয়নের কথা বলতেন। ভাত-কাপড়ের নিশ্চয়তার কথা বলতেন।

স্বাধীনতার পর দেশে নারী সমাজ শিক্ষা-দীক্ষা ও কর্মের সাথে সম্পৃক্ত হতে থাকে। বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক ধরনের নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে। মেয়েদের শিক্ষার হার এখন ৭৫% এরও বেশি। তাদের অনেকে আজ সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে, সেনাবাহিনী, পুলিশ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ সরকারি-বেসরকারি নানা পেশায় নারীরা গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছেন। আমাদের নারীরা বৈমানিক পদেও রয়েছে এমনকি দেশের সর্বশেষ প্রযুক্তির মেট্রোরেলের চালক হিসেবেও রয়েছেন নারী।

এখন তো ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্যোক্তা হিসেবে অনেক নারীই বিশাল বিশাল

> আমার মতে নারী এবং পুরুষ আলাদা কোনো স্বত্তা নয়, আমরা সবাই মানুষ এবং সমান অধিকার সংরক্ষণ করি। এখানে একজন আরেকজনের পরিপূরক। সৃষ্টিকর্তাই বিশ্বের প্রয়োজনে নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। দেশ ও সমাজ অনেক এগিয়েছে, আমরা বেশি সংখ্যক মানুষ শিক্ষার সুযোগ পেয়েছি। তারপরও আমি বলবো যে, অনেক পুরুষের মধ্যেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসেনি। এর ফলে এখনো নারীদের খাটো করে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কোথাও কোথাও নির্যাতনের শিকার হয় নারী। একসময় যৌতুক সমস্যা ছিল মারাত্মক, মেয়েদের প্রতি অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনা ছিল ব্যাপক। কিন্তু দেশের কঠোর আইন ও তা কার্যকর হবার ফলে এ ধরনের অপরাধের পরিমাণ প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে।

শিল্প গ্রুপ পরিচালনা করছেন। অন্যদিকে আজ যে পোশাক শিল্প খাত বাংলাদেশের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে সেই পোশাক শিল্পে শতকরা ৮০ শতাংশেই নারী শ্রমিক। তাদের পরিশ্রমে এই শিল্প প্রতিনিয়ত দেশের অর্থনীতিকে বেগবান করে চলেছে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে দরিদ্র অর্থনীতির দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। এনজিও সেক্টরের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্র নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পেরেছে, তাদের আত্মকর্মসংস্থানসহ অনেকেই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠেছেন। কেউ গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগির খামার করে দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখছেন। আবার অনেক নারীই বিদেশে কাজের সুবাদে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করছেন। দেশ স্বাধীন হবার ফলেই মানুষ নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়নে উদ্যোগ নিতে পারছে– বিশেষ করে নারী সমাজের এক বিশাল অংশ এখন অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। আমি মনে করি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে নারী সমাজের ভূমিকা বিশাল।

প্রত্যয় : স্বাধীনতার পর দেশে নারীদের সমান অধিকার প্রদান করা হয়। আপনি বলছেন তখন থেকেই নারীরা শিক্ষা থেকে শুরু করে সব পর্যায়ে এগিয়ে আসতে শুরু করে–এভাবে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি কীভাবে কার্যকর হতে থাকলো?

রাবেয়া আক্তার ডলি : আপনি ঠিকই বলেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার সংগ্রাম আন্দোলনে শুধু পুরুষরাই নয়, নারীরাও রাজপথে নেমে আসে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও মিছিলে অংশ নেয়। এটি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময়ও ঘটেছিল। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে মিছিলে নেমেছে। পুলিশের ব্যারিকেড উপেক্ষা করেছে। সেই পাকিস্তান আমলেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ছাত্রদের পাশাপাশি থেকে আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নিয়েছে, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর ডাকে দেশ গড়ার কাজে অংশ নিয়েছে। এরপর নারীরা যখন থেকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হতে শুরু করেছে, স্বাবলম্বী হয়েই নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠা করতে পারছে তখন থেকেই নারীর ক্ষমতায়ন কার্যকর হতে শুরু করেছে। তবে গার্মেন্টস শিল্প ও এনজিও সেক্টরের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সাফল্য এসেছে। পরবর্তীতে নারীরা যখন থেকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে থাকে তখন থেকেই নারীর ক্ষমতায়ন কার্যকর হয়। নারীর ক্ষমতায়ন এখন দৃশ্যমান।

প্রত্যয় : বর্তমানে নারীরা ব্যাপকহারে কর্মপেশার সাথে সম্পৃক্ত। তারপরও লিঙ্গবৈষম্যের বিষয়টি চোখে পড়ে। এর ফলে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তাহীনতার মধ্যেও পড়তে হয়। কর্মক্ষেত্রকে নারীবান্ধব রাখার ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি?

রাবেয়া আক্তার ডলি : আমার মতে নারী এবং পুরুষ আলাদা কোনো স্বত্তা নয়, আমরা সবাই মানুষ এবং সমান অধিকার সংরক্ষণ করি। এখানে একজন আরেকজনের পরিপূরক। সৃষ্টিকর্তাই বিশ্বের প্রয়োজনে নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। দেশ ও সমাজ অনেক এগিয়েছে, আমরা বেশি সংখ্যক মানুষ শিক্ষার সুযোগ পেয়েছি। তারপরও আমি বলবো যে, অনেক পুরুষের মধ্যেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসেনি। এর ফলে এখনো নারীদের খাটো করে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কোথাও কোথাও নির্যাতনের শিকার হয় নারী। এক সময় যৌতুক সমস্যা ছিল মারাত্মক, মেয়েদের প্রতি অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনা ছিল ব্যাপক। কিন্তু দেশের কঠোর আইন ও তা কার্যকর হবার ফলে এ ধরনের অপরাধের পরিমাণ প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে। আইন হওয়ায় অল্প বয়স্ক মেয়েদের বিয়ের সংখ্যাও অনেক কমে গেছে।

আমি মনে করি এ জন্য আইনের পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন করতে হবে। তাদের ভাবতে হবে নারীরা শুধু নারী নয়, তারাও মানুষ। এদিক থেকে আরেকটি কথা না বললেই নয় যে, দেশের এনজিও খাতের কর্মপরিবেশ বেশ সুন্দর। সেখানে লিঙ্গবৈষম্যের এই সমস্যাটি নেই, তাদের অফিসগুলোতে এ ব্যাপারে অভ্যন্তরীণ আলাদা কমিটি রয়েছে। আমি মনে করি সরকারি-বেসরকারি সব কর্মক্ষেত্রেই এ ধরনের ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

প্রত্যয় : আপনি মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক। বর্তমান সরকার স্মার্ট বাংলাদেশের ঘোষণা দিয়েছে। এক্ষেত্রে নারীদের জন্য কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেয়া প্রয়োজন?

রাবেয়া আক্তার ডলি : বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। গ্রামের একটি স্বল্প শিক্ষিত মহিলাও মোবাইল ব্যবহার করতে পারেন। বিদেশে ছেলেমেয়ের সাথে ইন্টারনেটে কথা বলতে পারছেন; টাকা পাঠালে তা সহজেই তুলতে পারছে। শিক্ষিত মেয়েরা ঘরে বসে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারছে। আমি মনে করি বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বেশ এগিয়েছে। প্রযুক্তিতে নারীর সুযোগ আরো বাড়াতে হবে। যেসব মেয়েরা দেশের কারখানা বা বিদেশে চাকরি নিয়ে যায়, তাদের উপযুক্ত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত নারীদের প্রযুক্তির সাথে যুক্ত করতে হবে। পোশাক কারখানাসহ অন্যান্য শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত মেয়েদের সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির ব্যাপারে প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, এর মাধ্যমেই আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ এর বাস্তবায়ন সম্ভব করতে পারবো।■

খুশী কবির

সমন্বয়কারী, নিজেরা করি

কৃষিসহ জাতীয় উন্নয়নের সব ক্ষেত্রে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে

বাংলাদেশের আলোকিত সমাজকর্মী, নারীবাদী ও পরিবেশবাদী নারীদের অন্যতম একজন খুশী কবিরের জন্ম ১৯৪৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর একটি প্রগতিশীল, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত মুসলিম পরিবারে। তার বাবা আকবর কবির ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা, মা সেলিমা জেবুন্নেসা। খুশী কবিরের প্রাথমিক শিক্ষা করাচির একটি কনভেন্ট স্কুলে। তিনি ১৯৬৪ সালে এসএসসি এবং ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চারুকলায় স্নাতক হন। অধ্যয়ন শেষে তিনি একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থায় যোগদান করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে তিনি ব্র্যাকে যোগদান করেন। ব্র্যাকের কর্মসূত্রে তিনি প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সাথে মেশার সুযোগ পান। তিনি তখনো জিন্স প্যান্ট পরতেন, ভেবেছিলেন গ্রামের মানুষ তাকে সেভাবে গ্রহণ করবে না। কিন্তু তারা তাকে আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করেছিল।

১৯৮০ সালে খুশী কবির 'নিজেরা করি' এর সাথে যুক্ত হন। খুশী কবিরের নেতৃত্বে বর্তমানে এটি ৩৮ উপজেলায় ১২৮২টি গ্রামে ২১৩৬৯০ জন ভূমিহীন নারী ও পুরুষকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। নিজেরা করি একটি 'প্রচলিত কর্মী' এনজিও হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দরিদ্রদের সমস্যার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। অ-ঋণ নীতি, সামাজিক সংস্কৃতি, কর্মীদের জনস্বার্থী ভূমিকা, লিঙ্গ সমতার দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। খুশী কবির একজন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। নারী অধিকার ও পরিবেশবিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি সরব। তিনি অ্যাসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিজ ইন বাংলাদেশ (এডিএবি) এর একজন উদ্যোক্তা। প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে নারীবাদী ব্যক্তিত্ব খুশী কবির যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ এই নিকট অতীতেও ছিল দারিদ্র্যপীড়িত এক উন্নয়নশীল জনপদ। বর্তমানে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দেশের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এর পেছনে নারী সমাজের ভূমিকা কতোখানি বলে আপনি মনে করেন?

খুশী কবির : নারীদের নিয়ে এমন একটি সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ার জন্য ধন্যবাদ। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এই স্বাধীন হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ অঞ্চলে চরমভাবে শোষণ ও বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল। মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করেছিল, তারা এ অঞ্চলে তেমন কোনো উন্নয়ন করেনি। এ দেশ ছিল খুবই পশ্চাৎপদ। অন্যদিকে যুদ্ধকালীন সময়ে প্রচুর অবকাঠামো ধ্বংস করা হয়েছে। রাস্তাঘাট, কালভার্ট, ব্রিজ ধ্বংস করা হয়েছিল আর ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। আমাদের কোষাগার থেকে পাকিস্তানিরা সব টাকা লুট করেছিল। এই দেশটি যখন স্বাধীন হয় তখন তা একটা ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়েছিল। শুধু মানুষের একটা স্বপ্ন, প্রেরণা এবং সাহস নিয়ে তারা দেশ স্বাধীন করেছিল। স্বাধীনতার পরও পরাজিত শক্তি এই বিজয়কে ভালো চোখে দেখেনি। যুদ্ধ মুহূর্তে বিরোধীতাকারী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্ট করে বলেছিল যে, এ দেশ হলো একটি তলাবিহীন ঝুড়ি।

তারা বলেছিল, এটি এতই বিধ্বস্ত একটি দেশ যে, এদেরকে কোনো সাহায্য দিলেও এরা কোনোদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। আপার কথা আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি। ১৯৭২ সাল থেকে আমি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থের সাথে জড়িত। তখন দেখেছি আগে নারীদের ব্যাপারে একটা ধারণা ছিল যে, নারীরা ঘর থেকে বের হয় না, যে কাজগুলো করে তা ঘরের আঙিনায় করে। তাদের উন্নয়নের কথা চিন্তা করলে শুধু বড়জোর সেলাই মেশিন ছাড়া আর কিছু চিন্তা করত না। তাও হাজারে দুয়েকজন। বাইরে থেকে না কিনে ঘরে বলে বাচ্চাদের জামা-কাপড় সেলাই করত আর বাইরে থেকে কোনো নারী এসে তাদের জামা-কাপড় সেলাই করে নিয়ে যেতো, তাদেরকে দোকানে যেতে হতো না। অর্থাৎ কর্মজীবী নারীর উন্নয়ন বলতে এটুকুই বোঝানো হতো।

কিন্তু আমরা দেখেছি যে, এ দেশে নারীদের কৃষিতে অবদানও অনেক বেশি। আমি একটি উদাহরণ সবসময় দেই যে, তখন মাঠের কাজ পুরুষরা করত, আর মাঠ থেকে ফসল কেটে বাড়িতে আনার পর বাকীসব কাজ করতে হতো নারীকেই। হাঁস-মুরগি, ছাগল পালনসহ সব কিছু নারীর কাজ ছিল। এই কাজগুলোর একটা অর্থনৈতিক মূল্য আছে। তারা কিছু কাজ করছে, খাওয়াচ্ছে, পুষ্টি জোগাচ্ছে এবং এর মাধ্যমে কিছু আয়ও করছে। সে মা গেলেও তার স্বামী তারই উৎপাদিত পণ্য বাজারে নিয়ে যাচ্ছে।

আরেকটি উদাহরণ দেই যে, দেখা যাচ্ছে ধানের মূল্যের চেয়ে চালের মূল্য অনেক বেশি-প্রায় দ্বিগুণ। সেই শুরু থেকে বীজ ধান সংরক্ষণ এবং মাঠ থেকে ধান কেটে আনার পর মাড়াই করা, সেদ্ধ করা, শুকানো, ভাঙানো সবই কিন্তু নারীর কাজ। এই চালের দাম ধানের চেয়ে দ্বিগুণ হলো, এর যে অর্থনৈতিক অবদান আছে সেটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

১৯৭৪ সালে যে দুর্ভিক্ষ হলো, লাখ লাখ লোক না খেয়ে মারা গেলো; তখন জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, সরকার– তারা কিছু কর্মসূচি নিয়েছিল 'ফুড ফর ওয়ার্ক' অর্থাৎ কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি বা 'কাবিখা'। যখন এই কাবিখা প্রোগ্রাম নিয়েছিল প্রথমে তারা ধরে নিয়েছিল এটাতে শুধু পুরুষরাই কাজ করছে। কিন্তু অনেক দরিদ্র, তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা নারী এই কর্মসূচিতে কাজ করেছিল। আমি তখন জামালপুর অঞ্চলে কাজ করেছি কয়েক দিন। তখন সিস্টে দেখলাম যে, প্রায় নামগুলোই অমুক বেওয়া, অর্থাৎ তাদের স্বামী নেই। তখন ইউনিসেফ একটা প্রজেক্ট নিয়েছিল যেখানে নারীদের জন্য আলাদা করে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি দেয়া হয়েছিল সূর্যমুখী, ভুট্টা, গম ইত্যাদি চাষ করার জন্য। আমি তখন বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকে সংশ্লিষ্ট থাকায় এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত ছিলাম। তখন দেখলাম, অনেক নারী কর্মী বাচ্চাদেরকে চরে অনিরাপদভাবে রেখে আসত, ফিরে গিয়ে দেখত যে অনেক সময় তাদের বাচ্চাকে শিয়ালে মেরে ফেলেছে। এই রকম করুণ অবস্থা ছিল। এটা ১৯৭৪ সালের দিকের ঘটনা। তখন কিছু গ্রামের দরিদ্র নারীরা বের হতে শুরু করেছে। এ ব্যাপারে সে সময় একটা স্টাডি করা হয়েছিল যার কথা এখন কেউ বলে না। সেটা রুবি গজনবি আর..... করেছিল। সেখানে তারা গবেষণা করে প্রত্যেকটা জায়গায় গিয়ে দেখেছে নারীরাও কাজ করছে। কিন্তু সেখানে যে সরকারি কর্মকর্তারা ছিল তারা এটাকে গ্রহণ করতো না। তাদের কথায় নারীরা ঘর থেকে বের হয় না। কিন্তু এই নারীদের তো আর কোনো উপায় নেই। অনেক পুরুষের সাথে আমার কথা হয়েছে। তারা বলত, আপা আমরা স্ত্রী-সন্তানদের এই কষ্ট সহ্য করতে পারিনি যে, আমার স্ত্রী-সন্তানরা না খেয়ে আছে। এ জন্যই সংসার ছেড়ে পালিয়েছি। আমি বলতাম, আপনি তো চলে গেছেন কিন্তু আপনার স্ত্রী তো না খেয়ে সন্তানদের জন্য খাবার সংগ্রহ করতো। কচু-ঘেচু যা যা পেতো তাই নিয়ে আসতো। তারা যে কি খেয়ে বাঁচতো আমি তা দেখেছি। তাদের নিদারুণ করুণ অবস্থা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। নারীরা সন্তানদের নিয়ে বেঁচে

থাকার জন্য যে সুযোগই পেয়েছে, কাজ করে খাদ্য জোগাড় করার জন্য সে কাজই শুরু করেছে। এরপর কিন্তু একটা পরিবর্তন এলো। তখন নারী রান্নার কাজের পাশাপাশি কৃষি শ্রমিক হতে আরম্ভ করলো।

স্বাধীনতার মুহূর্তেও মুক্তিযুদ্ধে নারীরা ব্যাপকহারে অংশগ্রহণ করেছে। কমসংখ্যক নারী হয়তো হাতে অস্ত্র নিয়েছে কিন্তু অধিকাংশ নারীই মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য সরবরাহ করেছে, আশ্রয় দিয়েছে, তথ্য দিয়েছে। তারা জানতো যে, মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার ফলে তাদের ওপর হামলা হবে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে, ধর্ষণ করা হবে, মেরে ফেলবে। তারপরও তাদের কর্মকাণ্ড তারা অব্যাহত রেখেছে।

যেহেতু নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতির কথা বললেন, তাই আমি বলবো যে, প্রাকৃতিক পর্যায় থেকে দারিদ্র্য থেকে নারী উঠে আসার জন্য সে যে কাজই পেয়েছে তাই করেছে, সেখানে সে নারী-পুরুষ দেখেনি। সে দেখেছে তার কাজটা দরকার, বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো-পড়ানোর জন্য। তার মধ্যে

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো কাজ করতে শুরু করেছে। তারা গ্রামে-গঞ্জে কাজ করতে গিয়ে গ্রামীণ নারীদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করার সুযোগ লাভ করেছে।

প্রশ্ন : আমাদের রাষ্ট্র বা প্রশাসনের লোক তারা কি বুঝত না যে, যেহেতু নারীরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তা হলে তারাও মাঠে-ঘাটে কাজ করতে পারে?

খুশী কবির : প্রথমে যখন কাবিখার উদ্যোগ ছিল, যখন ইউনিসেফ কিছু বিশেষ কর্মসূচি দিল নারীর জন্য, তারপর যে স্টাডিগুলো হলো, সেমিনার হলো, বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া হলো– তখন তারা স্বীকার করেছে যে এদেশে নারীরাও কাজ করতে পারে। আর ১৯৭৫ এ আন্তর্জাতিক নারী বছর ছিল, এর আয়োজন করেছিল মেক্সিকো। তারপর থেকে এটা প্রতিষ্ঠিত হলো যে, নারীদের আলাদাভাবে বিশেষ কর্মসূচি দিতে হবে সরকারের পক্ষ থেকে। এরপরই প্রথমে নারী অধিদপ্তর হলো। এর আগে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র চালু করেন। যেসব নারীরা ধর্ষণের শিকার হয়েছিল এবং পরিবার গ্রহণ করছিল না, তাদেরকেই এখানে রাখা হতো। সেটাকেই পাঁচাত্তরে নারী অধিদপ্তর করা হলো।

সে সময়ে এটা ছিল একটা বড় বিপ্লব। আর আরেকটা হলো আশির দশকে বাংলাদেশে প্রথম গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি শুরু হলো। এটা প্রথমে শুরু করেছিলেন নুরুল কাদের খান 'দেশ গার্মেন্টস' নামে। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি দেশ গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠার পর সেখানে নারীদের প্রাধান্য দিলেন। এরপর তো গার্মেন্টস সেক্টরই আমাদের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক সেক্টর। তখন নারীদের যে এত বড় সুযোগ তৈরি হলো কাজের জন্য গ্রামাঞ্চল থেকেও নারীরা চলে আসতে শুরু করল। নারীরা একদিকে কৃষি শ্রমিক হয়ে গেল, এনজিওরাও নারীদেরকে মাইক্রোক্রেডিট দিতে শুরু করল। আমি বলবো যে এসব কিছু মিলে নারীদের একটা জায়গা সৃষ্টি হলো, যেখানে নারী কাজ করতে পারছে এবং যেহেতু তারা একটা সুযোগ পেল, এই সুযোগটাকে তারা সঠিকভাবে সততার সাথে এবং দায়িত্বের সাথে পালন করে দেখালো যে নারী সক্ষম।

প্রশ্ন : এই যে পরিবর্তনটা হলো এর জন্য তো কোনো আন্দোলন করতে হয়নি। নাকি রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক কমিটি তাদের জন্য একটা সুযোগ করে দিয়েছে?

খুশী কবির : জাতিসংঘ যে নারী বছর বা দশক করেছে সেটা আমাদের নারীদের আন্দোলনের ফল। এটা আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের ফসল। আর আমরাও এটি নিয়ে যথেষ্ট কাজ করেছি এবং নারী সংগঠনগুলো এ ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছিল। আমরা যারা গ্রামে থাকতাম, গ্রামে কাজ করতাম আমাদের অভিজ্ঞতাগুলোকে সেমিনারে তুলে ধরেছি।

> নারীবাদী হলো সমতায় বিশ্বাস। পিতৃতন্ত্রকে পরিবর্তন করাই হলো নারীবাদ। নারীবাদী হলো যারা সমাজে নারী এবং পুরুষকে সমানভাবে দেখে। সেটা পুরুষরাও কিন্তু নারীবাদী হতে পারে। আবার অনেক নারী আছে যারা নারীবাদী না। মূলত বলা হয় আমাদের সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের বিপরীত একটি উগ্র ধারণা। আসলে বিষয়টা মোটেও তেমন নয়। অনেকে বলে যে পিতৃতন্ত্রের বিপরীত এক নাম মাতৃতন্ত্র। আমরা বলি না– সমার্থক। কিছু কিছু নারীবাদী আছেন যারা মনে করেন যে পরিবর্তন আনতে হলে আমাদেরকে উগ্র হতে হবে। না হলে নারীরা তাদের স্থান পাবে না।

প্রশ্ন : আজকের প্রেক্ষাপটে আমরা দেখি যে সর্বত্রই নারীরা আছেন– প্রশাসনে সচিব থেকে শুরু করে বৈমানিক, আর্মি, পুলিশ সবক্ষেত্রে। আপনি কি বলবেন?

খুশী কবির : নারীর অগ্রগতির পেছনে আমি বলবো যে সরকারের বিরাট ভূমিকা আছে। কারণ, সরকার যদি অ্যালাউ না করতো তা হলে সম্ভব হতো না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারী সমাজের ব্যাপক ভূমিকা থাকার পরও একটা কিন্তু আছে। অর্থাৎ ব্যবস্থা যেটা আছে সেটা পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অনেক নারী উদ্যোক্তা আছে যারা ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণটা রয়েছে পুরুষের হাতে। এখন সচিবের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু একসময় এটা ছিল না। যখন যে নারী এ পর্যায়ে যাচ্ছে তখন সে নিজেকে প্রমাণ করত যে, সে নারী না সে পুরুষের সমান কাজ করতে পারে।

আমি নিজেও যখন গ্রামে গেছি তখন পরিবারসহ অনেকেই বলতো আমি গ্রামে টিকতে পারবো না, কাজ করতে পারবো না। তখন আমাকে তা প্রমাণ করতে হয়েছে যে আমি পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে কম কাজ করব না। বরং অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি কাজ করে দেখিয়েছি। নারীদের উন্নয়নে, তাদেরকে সবক্ষেত্রে নিয়ে আসার পেছনে প্রথম অবদান হচ্ছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের। প্যারামেডিকসে সব নারীদেরকে নিয়েছিল। তাদেরকে দিয়ে নারীদের সব চিকিৎসা করাতো। এরপর ব্র্যাকের একটা ভূমিকা ছিল। এর আগে কেয়ার এবং আরডিআরএস এর একটা ভূমিকা ছিল। তারপর অন্যরা শুরু করেছে।

প্রশ্ন : আপনি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা নিজেরা করি এর সমন্বয়ক। কোন কোন সমস্যা দেশের উন্নয়নে বাধা হিসেবে কাজ করছে বলে আপনার অভিমত?

খুশী কবির : অনেক বাধা কাজ করছে। প্রথম হলো যারা আমাদের দিকনির্দেশনা করেন অর্থাৎ পলিসি মেকার, তাদের মানসিকতা, চিন্তার জায়গাটায় এখনো পুরুষতান্ত্রিকতা রয়ে গেছে। মাঝখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছর বাদ দিলে সেই ১৯৯১ সাল থেকে আমাদের নারী প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন। তারপরও সেই নীতিনির্ধারকদের ধারণা নারী যোগ্যতর কোনো দায়িত্ব নিতে পারবে না। যদিও অসংখ্য নারী ইউএনও, ডিসি, সচিব খুব এফিসিয়েন্টলি কাজ করে যাচ্ছে। তারপরও তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি। যার পরিবর্তন আমরা দেখছি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে। অর্থাৎ নারীকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয় না। বই-পুস্তকেও আমরা দেখছি একটা বৈষম্যমূলক আচরণ। সেখানে নারীদের উজ্জ্বল দিকগুলো তুলে ধরা হয় না।

স্কুলের খেলার মাঠেও মেয়েদের খেলাধুলার সুযোগ কম। যে দুয়েকটা জায়গায় মেয়েদের খেলার সুযোগ দেয়া হয়েছে যেমন ফুটবল, ক্রিকেট সেখানে মেয়েদের সাফল্য আশ্চর্যজনক। কিন্তু ৯৯ ভাগ স্কুলে সেই সুযোগটা নেই। আপনি যদি ঢাকা থেকে মফস্বল শহরের দিকে তাকান তা হলে দেখবেন যতগুলো মাঠ আছে, ক্লাব আছে সব ছেলেদের।

প্রশ্ন : আমরা যে পৃথক গার্লস স্কুল বা গার্লস কলেজ করছি সেটা কি ভালো?

খুশী কবির : না, এটা খারাপ না। যদি ওই স্কুল-কলেজে মেয়েদেরকে মেয়ে হিসেবে গড়ে না তোলে। তাদেরকে যদি দেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে তা হলে সেটা খুবই ভালো। আর কো-এডুকেশনের বিষয়ে আমি মোটেও দ্বিমত করি না বরং আমি মনে করি কো-এডুকেশন ভালো। কারণ, মেয়েরা তখন ছেলেদের সাথে প্রতিযোগিতা করে দেখাতে পারে। কিন্তু স্কুলগুলোতে কি শেখানো হচ্ছে আর শিক্ষকদের মানসিকতায় যাতে বিভেদ না থাকে সে বিষয়টি দেখতে হবে।

প্রশ্ন : এ কথা সত্য যে, একটি দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য অনেক বড় অন্তরায়। এ দেশে এ সমস্যাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করছেন? সমস্যার আঙ্গিকে আপনার প্রস্তাবনা কি?

খুশী কবির : লিঙ্গবৈষম্য সব জায়গাতে আছে। প্রথমে বাড়ি থেকেই শুরু হয়। একটি মেয়ে শিশু জন্মানোর পর থেকেই তাকে বোঝানো হয় যে এই বাড়ি তার বাড়ি না। তাকে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে। তাকে শেখানো হয় জোরে কথা বলবে না, তর্ক-বিতর্ক করবে না। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তোমাকে সে বাড়ির মানুষের মন জয় করতে হবে। তাকে বুঝিয়েই দেয়া হলো যে বাবার বাড়ি তার বাড়ি না আবার স্বামীর বাড়িও তার না– তার শ্বশুরের বাড়ি।

প্রত্যয় : এসব কারণেই কি যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে কি না?

খুশী কবির : যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে অনেক কারণে। নারী আলাদা থাকবে সে কারণে না। সে আলাদা বাড়ি করলেও সেখানে নারীর কর্তৃত্ব থাকছে না, তার স্বামীর বাড়ি স্বামীর কর্তৃত্ব বজায় থাকছে। যৌথ পরিবার ভেঙে যাবার পেছনে অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। একটি যৌথ পরিবারে অনেক খরচ। সবাই এখন আত্মকেন্দ্রিক হয়েছে। এখন অর্থনৈতিক অবস্থা, কাজের অবস্থা, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করানো এসব নানা বিষয়ের কারণে যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। আবার একক পরিবার হলে যে নারীর খুব লাভ হচ্ছে সেটাও না। সবচেয়ে বড় অভাব হচ্ছে আমাদের চিন্তার, হওয়া দরকার। আমি একজন নারীবাদী হিসেবে এবং একজন উন্নয়ন কর্মী হিসেবে মনে করি নারী এবং পুরুষ উভয়ের সাথে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। পুরুষতান্ত্রিকতার সাথে বড় হওয়ার কারণে নারীরাও এটা বিশ্বাস করে এবং মনে করে এটাই বাস্তব। অনেক পুরুষ আছে যারা মনে করে পরিবর্তন দরকার। আমরা পরিবারে, সমাজে একসাথে থাকি, কাজ একসাথে করছি, রাস্তাঘাটে আমরা একসাথে চলাফেরা করছি। এই পরিবর্তন যদি না আসে শুধু যদি নারীদেরকে বলা হয় তা হলে এটা যথেষ্ট নয়। নারী এবং পুরুষ উভয়ের পরিবর্তন হতে হবে। অভাব হয়েছে এটাই।

প্রত্যয় : নারীবাদী শব্দটার অর্থ কি? অনেকে মনে করে যে, নারীবাদী একটি উগ্রচিন্তা এবং হাস্যকর জিনিস–

খুশী কবির : নারীবাদী হলো সমতার বিশ্বাস। পিতৃতন্ত্রকে পরিবর্তন করাই হলো নারীবাদ। নারীবাদী হলো যারা সমাজে নারী এবং পুরুষকে সমানভাবে দেখে। সেটা পুরুষরাও কিন্তু নারীবাদী হতে পারে। আবার অনেক নারী আছে যারা নারীবাদী না। মূলত বলা হয় আমাদের সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের বিপরীত একটি উগ্র ধারণা। আসলে বিষয়টা মোটেও তেমন নয়। অনেকে বলে যে পিতৃতন্ত্রের বিপরীত এক নাম মাতৃতন্ত্র। আমরা বলি না– সমার্থক।

আমি মনে করি প্রত্যেকটা পাবলিক বাসে একটা সিসি ক্যামেরা থাকা উচিত, একটা অভিযোগ বাক্স থাকা উচিত। যার ওপর হয়রানি হচ্ছে সে যদি তার অভিযোগ ঐ বাক্সে ঢুকিয়ে দেয় অথবা তাকে যদি ঢুকাতে না দেয়া হয় তখন সে যদি কমপ্লেইন করে তা হলে শুধু প্যাসেঞ্জার না; ওই বাস কোম্পানি, চালক, হেল্পার এদেরকেও শাস্তির আওতায় আনতে হবে। এটার জন্য একটা আলাদা কোর্ট থাকা উচিত।

মানসিকতার। নারীকে আমরা বস্তু হিসেবে দেখি, পুরুষের অধীনে দেখি, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা যতদিন আমাদের মাথায় ঢুকে আছে ততদিন পর্যন্ত নারীর সমঅধিকার আসবে না এবং সমতার ব্যাপারে ধর্মকেও ব্যবহার করা হয়। আমি সব ধর্মের কথাই বলবো। অনেক ধর্মে সমতার কথা উল্লেখ থাকলেও আবার অনেক ধর্মে তা নেই। সমাজটা হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক আর ধর্ম পালন করছি তা আমার চিন্তার বা বিশ্বাসের জায়গা থেকে। কিন্তু আমার চলাফেরার ব্যবস্থা হচ্ছে সমাজ যেটা বলছে। এই জায়গাতে একটা পার্থক্য আছে। যুগের সাথে বিজ্ঞান এবং ধর্মকে আমি সাংঘর্ষিকভাবে দেখি না। কেননা বিজ্ঞানের অনেক আগেই ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। পৃথিবী সৃষ্টি এটা বিশ্বাস করা হয় কিন্তু বিজ্ঞান বলছে পৃথিবী অনেক আগেই সৃষ্টি হয়েছে। আমি বলবো যে তখনকার সময়ে এটা সঠিক ছিল আর বিজ্ঞান এখন অনেক এগিয়ে গেছে। ধর্মকে যুগের সাথে পরিবর্তন করতে হবে।

আমি বলবো যে, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো চিন্তার ক্ষেত্র আর মানসিকতা। দ্বিতীয় হলো যারা আমাদের নীতিনির্ধারক তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। আর যারা প্রয়োগকারী সংস্থা তাদের বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট কিছু কিছু নারীবাদী আছেন যারা মনে করেন যে পরিবর্তন আনতে হলে আমাদেরকে উগ্র হতে হবে। না হলে নারীরা তাদের স্থান পাবে না।

প্রত্যয় : স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় নারীদের কোন কোন ক্ষেত্রে অবদান রাখার সুযোগ আছে? এ ক্ষেত্রে সরকার কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে?

খুশী কবির : সরকার চেষ্টা করছে। আমি আগেই বলেছি যে সরকারের নীতি-নিয়ম বা কোর্টের অর্ডার যারা বাস্তবায়ন করে তাদেরকে বিষয়টা বুঝতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ করতে গেলে বিশেষ করে ই-কমার্সে নারীদের ভূমিকা এখন অনেক বেশি। কোভিডের সময় তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে। বিশেষ করে ফুড ডেলিভারি, পোশাক সেল ইত্যাদি পণ্যের জন্য যখন কোভিডকালীন সময়ে লকডাউনের কারণে যারা কেউ দোকানে যাচ্ছিল না তখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে এসব বাণিজ্য হচ্ছিল। সেখানকার উদ্যোক্তাদের অধিকাংশই নারী ছিল। আর এখনকার ইয়াং জেনারেশন অনেক মেধাবী, বিশেষ করে প্রযুক্তিজ্ঞানে তারা অনেক এগিয়ে, সুযোগ পেলে তারা যেকোনো কাজই করতে পারে।

প্রত্যয় : গ্রাম পর্যায়ে মেয়েরা এখন স্কুল-কলেজে আসার সুযোগ পাচ্ছে কি?

আমি একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ দেখে যেতে চাচ্ছি। এ বৈষম্য শুধু নারী-পুরুষের না প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে– শ্রেণিগত, জাতিগত, গণতন্ত্র, ধর্ম সবক্ষেত্রে একটি বৈষম্যহীন সমাজ দেখতে চাচ্ছি। আমি মানুষকে সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা এই জিনিসগুলো দেখতে চাচ্ছি। আমি দেখতে চাচ্ছি এমন একটা বাংলাদেশ যে স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল একাত্তরে। মুক্তিযুদ্ধের আলোকে একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রত্যাশা করছি।

খুশী কবির : ওরা সুযোগ পায় কিন্তু বড় অন্ধকারটা যাচ্ছে নিরাপত্তাহীনতা। বাল্যবিবাহের জন্য প্রাথমিক এবং সেকেন্ডারি স্কুল দেখা যাচ্ছে যে মেয়েদের ড্রপআউট অনেক বেশি। আর প্রত্যেক শিভানাতার সাথে আলাপ করলে দেখা যাচ্ছে যে, নিরাপত্তাহীনতার কথাই বলেন।

প্রত্যয় : স্মার্ট বাংলাদেশ মানে কি টেকনোলজিক্যাল স্মার্টনেস? তা কিন্তু না সৃষ্টিভঙ্গিগত একটা স্মার্টনেসের বিষয় এর সাথে জড়িত। তা হলে এটাই যদি আমাদের সৃষ্টিভঙ্গি হয় যে, কোর্টে মেয়েদের প্রমাণ করতে হবে যে, তার চরিত্র কেমন তা হলে এটা কি স্মার্ট সৃষ্টিভঙ্গি হলো?

খুশী কবির : ইতিমধ্যে কোর্ট একটা অর্ডার দিয়েছে যে তার চরিত্র জানা যাবে না। অপরাধটা কে করল সেটা জানার বিষয়। সেই জিনিসটাই বা কতোজন মানবে বা গ্রহণ করবে?

প্রত্যয় : বর্তমানে নারীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্যোক্তাসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। কর্মক্ষেত্রকে নারীবান্ধব রাখার ব্যাপারে আপনার প্রস্তাবনা জানতে চাচ্ছি।

খুশী কবির : প্রস্তাবনা হচ্ছে যে, এখানে হাইকোর্টের যে অর্ডারটা আসছে যে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে একটা কমিটি থাকা উচিত হয়রানি, নিপীড়ন থেকে রক্ষার জন্য। বহুজন থাকা উচিত ওই প্রতিষ্ঠানের বাইরের ব্যক্তির– এটার কার্যকারিতাটা যেন ঠিকমতো হয়। আমাদের প্রতিষ্ঠানেও আমরা একটা ছোট কমিটি করেছি যে, এটা হলো একটা অভ্যন্তরীণ কমিটি। যে এখানে কমপ্লেইন করতে পারবে। কমপ্লেইনের জায়গাটা যদি প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান– শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ে প্রত্যেকটা কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরিতে, প্রত্যেকটা অফিসে এরকম একটা জায়গা থাকে যে, এখানে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে, মানুষ যেতে পারে। আমার মনে হয় এটার খুবই দরকার।

আমি মনে করি প্রত্যেকটা পাবলিক বাসে একটা সিসি ক্যামেরা থাকা উচিত, একটা অভিযোগ বাক্স থাকা উচিত। যার ওপর হয়রানি হচ্ছে সে যদি তার অভিযোগ ঐ বাক্সে ঢুকিয়ে দেয় অথবা তাকে যদি ঢুকাতে না দেয়া হয় তখন সে যদি কমপ্লেইন করে তা হলে শুধু প্যাসেঞ্জার না; ওই বাস কোম্পানি, চালক, হেলপার এদেরকেও শাস্তির আওতায় আনতে হবে। এটার জন্য একটা আলাদা কোর্ট থাকা উচিত।

প্রত্যয় : দেশে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখায় গ্রামীণ নারীরা আত্মকর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ভূমিকা রাখছে। নারীর ক্ষমতায়নে এই কার্যক্রমকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

খুশী কবির : নারীর ক্ষমতায়ন এটা এককভাবে বলতে পারে না যে এটা আমাদের জন্য হয়েছে। এটা সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হয়েছে এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো যদি গ্রামে কাজ না করত, নারীর পাশে না দাঁড়াত তা হলে কিন্তু আজ এ অবস্থায় নারীরা গ্রামেও আসত না। এখন আমি দেখছি যে অনেক ক্ষেত্রে গ্রামে সালিশে নারীরা সালিশকার হচ্ছে, যেটা আগে ছিল না। জনপ্রতিনিধি তো হচ্ছেই। এখানে তাদের জন্য কোটা আছে আবার কোটা ছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তারা জয়লাভ করছে। এক্ষেত্রে এনজিও সেক্টরের একটা বড় অবদান আছে। কেননা এনজিওরা মাঠে থেকে সরাসরি নারীদের সাথে কাজ করেছে। এখানে সরকারের ভূমিকা আছে, অন্যদেরও ভূমিকা আছে।

আমি যেটা বলবো যে, নারীদের সুযোগ করে দেয়ার জন্য আর সেই সুযোগটা সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য এনজিওদের অনেক গভীর ভূমিকা আছে।

প্রত্যয় : বাংলাদেশ ক্রমাগত উন্নয়নের ধারায় অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। আপনার জীবদ্দশায় কি ধরনের বাংলাদেশ আপনি দেখে যেতে চাচ্ছেন?

খুশী কবির : আমি একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ দেখে যেতে চাচ্ছি। এ বৈষম্য শুধু নারী-পুরুষের না প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে– শ্রেণিগত, জাতিগত, গণতন্ত্র, ধর্ম সর্বক্ষেত্রে একটি বৈষম্যহীন সমাজ দেখতে চাচ্ছি। আমি মানুষকে সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা এই জিনিসগুলো দেখতে চাচ্ছি। আমি দেখতে চাচ্ছি এমন একটা বাংলাদেশ যে স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল একাত্তরে। মুক্তিযুদ্ধের আলোকে একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রত্যাশা করছি।■

ড. হোসনে আরা বেগম

নির্বাহী পরিচালক, টিএমএসএস

এনজিওরা সেবার মানসিকতা নিয়েই এই সেক্টরে এসেছিল

দেশের বেসরকারি উন্নয়ন খাতের শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ যা টিএমএসএস হিসেবে সুপরিচিত। এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. হোসনে আরা বেগম এর জন্ম বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের পাশে ঠেঙ্গামারা গ্রামে ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে। তার পিতা সোলাইমান আলী পাইকার ও মাতা জোবাইদা বেগম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হোসনে আরা বেগম একজন দেশখ্যাত সমাজকর্মী, শিক্ষাবিদ এবং একজন উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব। তিনি তার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ অশোকা ফেলোশিপ, বেগম রোকেয়া পদকসহ অসংখ্য স্বীকৃতি ও সম্মাননা লাভ করেছেন। কলেজে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু হলেও সমাজকর্মী হোসনে আরা ১৯৮০ সালে নিজ শহর বগুড়াতে ১২৬ জন ভিক্ষুকের মুষ্টি চালের মাধ্যমে সংগৃহীত ২০৬ মণ চাল নিয়ে দেশের অন্যতম বড় বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ একাধিক কল্যাণের স্বার্থেই সংগঠনটির জন্ম। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ডিএফআইডি, নেদারল্যান্ডস গভর্নমেন্ট এবং আমেরিকানসহ আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো এ সংগঠনটিকে অর্থায়ন করে। এ সংগঠনটি দারিদ্র্য নিরসনে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের পাশাপাশি টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ, রাফাতুল্লাহ কমিউনিটি হসপিটাল, ফাইভ স্টার মম ইন হোটেল, দুটি সিএনজি স্টেশন, তিনটি পেট্রোল পাম্প, বহুতল ভবন তৈরি করে ফ্ল্যাট বিক্রয়, রিয়েল এস্টেট ব্যবসা চালু করেছে। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলাতেই টিএমএসএস এর শাখা রয়েছে। দেশের ছোট-বড় ১ লাখ ১২ হাজার সমিতি টিএমএসএসের আওতাভুক্ত। বগুড়ায় টিএমএসএস এর প্রধান কার্যালয়ে প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এই আলোকিত নারী ব্যক্তিত্ব যা বলেন, তা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

প্রত্যয় : যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে টিএমএসএস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার বাস্তবায়ন কতোটা সফল হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

ড. হোসনে আরা বেগম : কতোটা বাস্তবায়ন করতে পেরেছি তার উত্তরে বলবো, প্রায় শতভাগই করতে পেরেছি। মূল বাস্তবায়ন হলো চেতনাগত বাস্তবায়ন। টিএমএসএস এর জন্ম হয়েছিল নারী, অবহেলিত মানুষ, অবহেলিত পরিবার, গরিব-দুঃখী, আবাল-বনিতা-বৃদ্ধা যারা নানাভাবে সমস্যাগ্রস্ত তাদের উন্নয়নের জন্য। আমরা মনে করছি জিনিস দিয়ে, ত্রিলিফ দিয়ে তাদের উন্নয়ন করা যাবে না। এটি টেকসই হবে না। তাদের মানসিক চেতনার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। যে চেতনার মাধ্যমে তারা ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। এটা করতে হবে তাদেরকে ভালোবাসা দিয়ে তারাও যাতে সমাজের উন্নয়নে অন্যকে ভালোবাসেন। তবে এমন ভালো মানুষ কত জনকে করতে পেরেছি এর পরিসংখ্যান দিলে আমার সহকর্মীবৃন্দ বা টিএমএসএস পরিবার আমরা যারা আছি তারা হয়তো হতাশাগ্রস্ত হতে পারি, তাই সেটি বলতে চাচ্ছি না। তারপরও বলবো আমরা সেই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করেছি এবং এই ধারা অব্যাহত আছে।

তবে আমরা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মানবিক যে অর্জন, মূল্যবোধের যে অর্জন, নীতি নৈতিকতার যে অর্জন প্রত্যাশা করেছিলাম তা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে হয়নি।

প্রত্যয় : আপনি যে চেতনার কথা বললেন এটি দেশ এবং উন্নয়ন সমাজব্যবস্থার। এক্ষেত্রে দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো এই চেতনাকে ধারণ করে এগিয়ে যেতে পেরেছে কি?

ড. হোসনে আরা বেগম : বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর জন্ম হয়েছে সমাজসেবা বিভাগের নিবন্ধন নিয়ে সেবা করার উদ্দেশ্যে। এর মূল লক্ষ্য ছিল আমরা ভলান্টারি সেবা দেবো। এখন সেই ভলান্টারিজম সেভাবে নেই। এই সেক্টরে আমরা যারা কাজ করি তাদের বেতন, ভাতা, চাকরিবিধি, ইনক্রিমেন্ট, প্রমোশন, পেনশন, গ্র্যাচুইটি সব কর্মসংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো। এনজিও প্রতিষ্ঠানের জন্মই হয়েছিল সেবার উদ্দেশ্যে, টিএমএসএস এরও জন্ম হয়েছিল একদম মানবিক সেবার উদ্দেশ্যে। একান্তভাবে জন্ম হয়েছিল রাস্তার ভিক্ষুকদের নিয়ে এবং সেখানে আমাদের কথা ছিল যে, আমরা মানুষের সেবা করবো, একান্ত আপন ভেবে, নির্লোভভাবে, অত্যন্ত দরদের সাথে। এ সেক্টরে আমাদের উন্নয়ন এবং তাদের উন্নয়নকে একাকার করে দেখবো। আমার বিশ্বাস আমরা সবাই লক্ষ্য অর্জনে চেষ্টা করে যাচ্ছি।

প্রত্যয় : সেক্ষেত্রে টিএমএসএস যদি নিজে না দাঁড়াতে পারে, নিজের বৈষয়িক, আর্থিক কাজগুলো সম্পন্ন করতে না পারে তা হলে তো সে অন্যের জন্য কাজ করতে পারবে না বা অন্যদের সেবা করতে সক্ষম হবে না–

ড. হোসনে আরা বেগম : সে জন্যই তো বলছি, দুর্বিক, আর্থিক, সম্পদগত, অবকাঠামোগত এগুলোর কথা যদি বলেন, তা হলে তো আমি প্রথমেই বলেছি যে শতভাগ। কিন্তু এই শতভাগ দিয়ে নীতি-নৈতিকতার উন্নয়ন কতো হয়েছে, সততার উন্নয়ন কতো হয়েছে, ভদ্রাচারের উন্নয়ন কতো হয়েছে এর পরিসংখ্যান বলে আমি হতাশাগ্রস্ত করতে চাই না।

প্রত্যয় : যে উদ্দেশ্য আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের এনজিও সেক্টর যাত্রা করেছিল যেমন আপনি ঠেঙ্গামারাতে ভিক্ষুকদের কথা চিন্তা করে করেছিলেন কিন্তু পরে অন্য কোনো এনজিও ওই পর্যায়ের চিন্তাটাকে আর ধরে রাখতে পারেনি বলে আপনার মনে হয়?

ড. হোসনে আরা বেগম : আমরা বেসরকারি উন্নয়ন খাতের অনেক প্রতিষ্ঠানই কর্পোরেট এর মতো হয়ে গেছি। বাংলাদেশের এনজিও সেক্টরের প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই এই পরিবর্তন হয়েছে। টিএমএসএস তবুও এটাতে থাকার চেষ্টা করছে। এই চেষ্টা করতে গিয়ে সর্বমহলে– আমাদের রেগুলেটরি অথরিটি, পিকেএসএফ, এনজিও ব্যুরো এবং আরো অন্যান্য উন্নয়ন সাথী তারাও বলছে আপনি স্রোতের বিপরীতে যেতে পারবেন না। এই সেক্টর যেদিকে যাচ্ছে, আপনিও সেভাবে চলুন।

এনজিওরা সেবার মানসিকতা নিয়েই এই সেক্টরে এসেছিল। সব সেবাই এখানে ইনকামমাল ওয়েতে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সবাই যখন কর্মশীল হয়ে যাচ্ছে সেখানে সেবা তো বড় কথা নয়। গরিবকে কতটা সেবা দিলাম, দারিদ্র্য নিরসনে কতটা অবদান রাখলাম সেটা বড় কথা নয়। তবে আমরা কি ছিলাম, কি হতে চাচ্ছিলাম, কি হওয়ার কথা ছিল– তা যে হতে পারিনি এ ভাবনা আমাদের অনেককেই কুরে কুরে খায়।

প্রত্যয় : এক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন যে, সরকার আপনাদের সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেয়ার কারণেই এই অবস্থা?

ড. হোসনে আরা বেগম : সরকার আমাদের মানসিকতা উন্নয়নের জন্য যতটা নিয়ন্ত্রণ করছেন তার থেকে বেশি নিয়ন্ত্রণ করছেন ব্যাংকিং পরিচালনার ক্ষেত্রে। সরকার আমাদের ইথিকস অডিট করে না। আমাদের যে একটা ইথিক্যাল অডিট করা উচিত ছিল যে সেটা ঠিক আছে কি না? এটা সরকারও করে না বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগীরাও করে না।

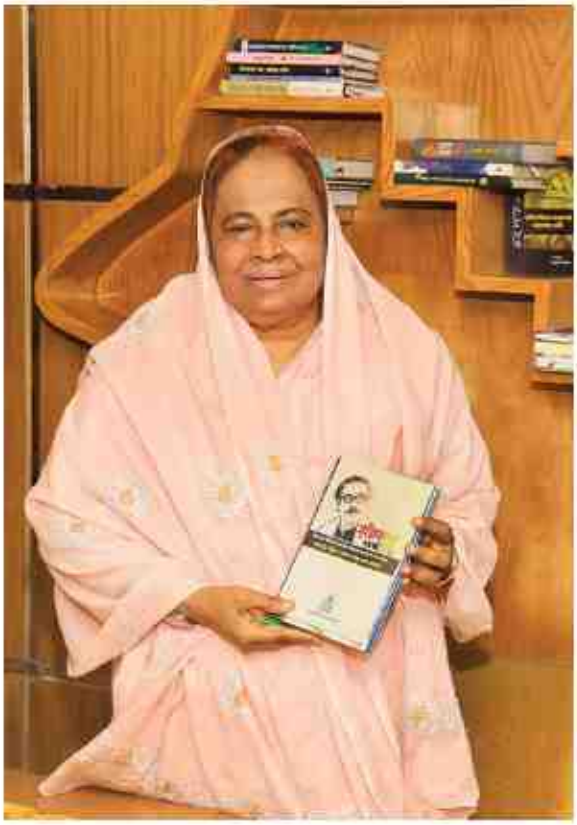

এটা আমাদের সরকার, জাতি বা আমাদের কমিউনিটির মধ্যেই যে নেই তা নয়। বিশ্বের কোথায় যাচ্ছে মানুষের যে দৌড়, তাদের যে যাত্রা এই যাত্রার

লক্ষ্য হলো– নিজে ভালো থাকি। যেমন মধ্যপ্রাচ্য থেকে যারা ফিরে এসেছে তাদের যে কাহিনি বিশেষ করে তাদের সাথে যে রূঢ় আচরণ করা হয় এখানে কি ইথিক্যাল অডিট বলে কিছু আছে?

প্রত্যয় : বিগত দুই দশকে বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এর পেছনে নারী সমাজের ভূমিকা কতোখানি বলে আপনি মনে করেন?

ড. হোসনে আরা বেগম : আমি মনে করি নারী সমাজের ভূমিকা অনেক বেশি। তাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, ছাড় দেয়ার মানসিকতা, তাদের ধৈর্য, সহ্য, কষ্ট সহিষ্ণুতা অনেক বেশি। যার ফলে উন্নয়নের যে চিত্র, পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ-জাতি এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উন্নয়নের যে ভিত আমার দৃষ্টিতে নারীরাই এতে অধিক অবদান রেখেছে এবং সেটি ধরে রেখেছে।

প্রত্যয় : বেসরকারি উন্নয়ন খাত যখন বাংলাদেশে কাজ শুরু করেছে, আগে

দেশের স্বাস্থ্য খাতে টিএমএসএস এর অবদান পুরোনো ও ব্যাপক। ১৯৯৫ সালে উত্তরবঙ্গের দরিদ্র মানুষদের স্বল্পমূল্যে চিকিৎসাসেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বগুড়ার ঠেঙামারা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় ১০ শয্যাবিশিষ্ট রাকাতুল্লাহ কমিউনিটি হাসপাতাল। ২০০৮ সালে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই হাসপাতালকে প্রথমে ২৫০ ও পরে ৮৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। সম্প্রতি ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট ক্যান্সার সেন্টার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ ও রাকাতুল্লাহ কমিউনিটি হাসপাতাল এখন ১ হাজার শয্যাবিশিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুগঠিত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ফলে শুধু উত্তরবঙ্গই নয়, দেশের বিভিন্ন জেলার মানুষ চিকিৎসাসেবা নিতে আসে এই হাসপাতালে। দরিদ্র মানুষের জন্য বিনামূল্যে ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য স্বল্পমূল্যে আধুনিক ও উচ্চমান সম্পন্ন চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয় এখানে। মাত্র ৫০ থেকে ১০০ টাকা ফি দিয়েই যে কেউ আউটডোর চিকিৎসাসেবা নিতে পারেন এই হাসপাতাল থেকে। ভবিষ্যতে একটি কার্ডিয়াক ও একটি ট্রমা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনাও রয়েছে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের। টিএমএসএস মেডিকেল কলেজে বর্তমানে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১ হাজার। সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী এখানে অধ্যয়ন করছেন সার্কভুক্ত দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী।

যখন নারীরা গৃহকর্ম থেকে বাইরে কাজ করতো না কিন্তু আজ সর্বত্র নারীদের একটা অবস্থান সূচিত হয়েছে। সেখানে আপনাদের সেক্টর কীভাবে উন্নয়নটা করছে?

ড. হোসনে আরা বেগম : এখানে এনজিও সেক্টরের অনেক সফলতা আছে। কর্মক্ষেত্রে নারীর যে অবাধ বিচরণ, নারীর স্বকীয়তা, স্বাধীনতা, নারীরা যে মানুষ এটা এই সেক্টরের ফলে বিকশিত হয়েছে, এই সেক্টরের কারিশমাটাই এখানে। ১৯৭৪ সাল থেকে আমি সংগঠন দেখে আসছি। একসময় যত সহায়তা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রয়োজন হতো, সেবার যত প্রয়োজন হতো এটার আর প্রয়োজন হচ্ছে না নারীদের অনেক উন্নয়ন হওয়ার ফলে। মূলত এনজিওদের কারণেই সম্ভব হয়েছে। সরকারও এক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে। এনজিওদের এই বিকাশে সব সরকারের সহযোগিতা আছে।

প্রত্যয় : আপনি কি মনে করেন যে, নারীরা গত ৩০ বছরে এনজিও সেক্টরে কাজ করার ফলে ভালোভাবেই উন্নতির দিকে এগিয়েছে? তাদের স্তরের উন্নয়ন হয়েছে, চিন্তার উন্নয়ন হয়েছে, সুযোগের উন্নয়ন হচ্ছে?

ড. হোসনে আরা বেগম : আমাদের আন্তরিকতার সাথে সেবা দেয়ার কথা ছিল কিন্তু সেই সেবাটা দিচ্ছি না। সেবাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে যাচ্ছে। নারীরাই সেবা নেয়ার মতো অবস্থানে আছে, আর যিনি সেই অবস্থানে নেই তিনিও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে পেয়ে যাচ্ছেন।

প্রত্যয় : কোন কোন সমস্যা দেশের উন্নয়নে বাধা হিসেবে কাজ করছে বলে আপনি উপলব্ধি করেন?

ড. হোসনে আরা বেগম : দেশের উন্নয়নে বাধা হিসেবে কাজ করছে সহমর্মিতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, অন্যের প্রতি ভালোবাসা– এর পরিমাণ অনেক কমে গেছে। পক্ষান্তরে বেড়ে গেছে প্রতিযোগিতা ও প্রতিহিংসা। এই প্রতিযোগিতা-প্রতিহিংসা উন্নয়নের পথে বাধা। এর সাথে আরেকটি ইস্যু হচ্ছে দুর্নীতি। এই দুর্নীতি সামাজিকভাবে যতটা ঘৃণিত হওয়ার কথা ছিল সেটা হয়নি। সমাজ হয়তো ওইভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারেনি বা যাকে করতে পেরেছে তাকে ঘৃণা করার মতো শক্তি-সামর্থ্য সমাজের নেই। ফলে ঘৃণাও করছে না। সে টাকা খরচ করলেই নেতা হয়ে যাচ্ছে। তার টাকা যে দুর্নীতি করে অর্জিত সেই টাকা নিতে কারো ঘৃণা লাগছে না।

প্রত্যয় : একসময় আপনারা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করেছেন, লড়াই করেছেন প্রতিবন্ধতা থেকে মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। এখন কি আপনার মনে হয় যা আপনাদের এই সেক্টরের উচিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা?

ড. হোসনে আরা বেগম : অবশ্যই উচিত। ইফিকস এর উন্নয়নে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করা উচিত। আমাদের অনেক কাজ করা উচিত। কিন্তু আমরা তো প্রস্তুত না। তবে সামাজিক সচেতনতার জন্য আবার একটি বিপ্লব ঘটাতে হবে। আমি আশাবাদী এই বিপ্লবে এনজিওরা অংশ নেবে। দুর্নীতি দূর করার জন্য এবং মানুষকে মানবিক হওয়ার জন্য, মূল্যবোধ, সৃষ্টিতন্ত্রি সহায়ক করার জন্য যে কার্যক্রম-তৎপরতা– এখানে এনজিওদের মনোনিবেশ করতে হবে।

প্রত্যয় : সরকারের পাশাপাশি আপনারা দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনসমূহ নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীদের উন্নয়নে কাজ করছেন। তারপরও নারী সমাজ এখনো অনেক পিছিয়ে। এক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

ড. হোসনে আরা বেগম : পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য সরকার যদিও সহায়ক ভূমিকা রাখছে, তারপরও সমাজে একশ্রেণির মানুষ এখনো রয়ে গেছে তারা মনেপ্রাণে নারীকে সামনে এগিয়ে দেয়াটাকে সঙ্গত মনে করে না এবং এই শ্রেণির মানুষ খুব যে কমছে তা নয় বরং বাড়ছে। কিন্তু এটা সত্য যে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা তাদের নীতিবোধ এর ওপরে আমরা কাজ করছি না। তাদেরকে সচেতন করছি না।

একটি জিনিস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, গত ১৫ বছর আগে কতোটি বোরখা-হিজাবের দোকান ছিল আর এখন কতো? এই সময়ে মানুষও বেড়েছে সেই শ্রেণিও হিসাব করলে দেখা যায় এখন প্রচুর বোরখা-হিজাব বিক্রি হচ্ছে। আমি পর্দানশীন হওয়ার বিপক্ষে না কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে হারে পর্দানশীন হচ্ছে, যে হারে মাদ্রাসা শিক্ষা বাড়ছে, মসজিদ বাড়ছে, সেই হারে কি আমরা ধার্মিক হচ্ছি? সেই হারে কি মানবিক হচ্ছি? আমরা

সামাজিক হচ্ছি। কিন্তু শুধু সামাজ পড়ছি, সামাজের মূল উদ্দেশ্য কায়েম করছি না। আমাদের মানবিক উন্নয়ন ঘটছে না, আমরা আদর্শিক মানুষ হচ্ছি না কিন্তু আমরা ধর্মের লেবাস, ধর্মের অবয়ব, ধর্মের বাণী এগুলো পড়ছি কিন্তু মানবিক হচ্ছি না। মানবিক যদি হতাম তা হলে আদালতেও মানুষ কমে যেত। তখন পুলিশ, আনসার, গার্ড এদেরও খুব বেশি প্রয়োজন হতো না। যে হারে মসজিদ, মাদ্রাসা, ধর্মীয় পোশাক বাড়ছে সে হারে তো অপরাধ প্রবণতা কমছে না।

এখন বাধা হলো এই গোষ্ঠী যাদের এগুলো করার কথা তারাও অর্থনৈতিকভাবে করে না। যারা খাঁটি মুসলমান তারা মানুষকে সঠিক ধর্মের কথা শোনাতে চায়, কিন্তু হাদিয়া দিতে পারবে না, হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যেতে পারবে না, সেখানে তো বড় মাওলানা সাহেবরা যেতে আগ্রহ প্রকাশ করবে না। ধর্মের প্রয়োজনে নয়, বরং তিনি বেশি টাকা রোজগার করলে বংশ পরম্পরায় তারা ভালো থাকবেন, সবাই শেষ পর্যন্ত এটিই চিন্তা করে।

প্রত্যয় : একসময় নারীদের স্বাধীনতার কথা বলতে গিয়ে ধর্মীয়দের রোষের মুখে পড়েছিলেন। সেখান থেকে কি আপনারা এখন কিছুটা উঠে আসতে পেরেছেন?

ড. হোসনে আরা বেগম : হ্যাঁ, সেখান থেকে অনেকটা উঠে আসতে সক্ষম হয়েছি। একসময় আমরা এই বগুড়াতেই বের হতে পারিনি। আমাদের অনেক অফিস ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। তাদের কথা হচ্ছে, মেয়েরা ঘরের বাইরে যাবে কেন? তারা কাজ করবে কেন? মেয়েদের পড়াশোনার দরকার নেই। তারা ঘরেই থাকবে এসব বলা হতো। একসময় আমাকে বলত আমি খ্রিস্টান হয়ে গেছি। এখন সেই অবস্থা নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

প্রত্যয় : নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কি না? সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য এনজিও নেতৃবৃন্দ বা এনজিও নেটওয়ার্কগুলো কি ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

ড. হোসনে আরা বেগম : আমার ব্যক্তিগত মত হলো খোদ রাষ্ট্র থেকে নারীদের প্রতিবন্ধকতা দূর করার কিছুই নেই। কিন্তু পারিপার্শ্ব থেকে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়। সেটাকে প্রটেস্ট দেয়ার মতো কলাকৌশল বা ক্ষমতা রাষ্ট্রের বোধ হয় নেই। আমার সহকর্মী আমাকে যন্ত্রণা দেবে সেটা রাষ্ট্র কীভাবে দূর করবে? আমার ঊর্ধ্বতন আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, কিন্তু পলিসিতে তো যন্ত্রণা দেয়ার কথা উল্লেখ নেই। আমি যদি পোস্টিং নেই তা হলে আমার ঊর্ধ্বতন বলতে আমি জনকল ছেড়ে দুজনকে চেয়েছি। তিনি দিলেন মহিলা। অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গির এখনো কোনো পরিবর্তন হয়নি।

টিএমএসএস এর পলিসি হলো– একজন মহিলা হলেও মনেপ্রাণে সম্মান দিতে হবে। মনেপ্রাণে তাকে ফল হিসেবে সম্মান করতে হবে। শুধু কৌশল করে তার থেকে আদায় করা নয়, তাকে মায়ের মতো, ঊর্ধ্বতন বসের মতো সম্মান করতে হবে। এটি তো আমি বাস্তবায়ন করতে পারছি না, এক্ষেত্রে আমি ব্যর্থ। একইসাথে এ ব্যাপারে আমি রাষ্ট্রকেও দোষ দিতে চাই না।

নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরিতে মানুষের মোটিভেশন এবং মানসিক পরিবর্তন আসতে হবে। মাইন্ড সেট চেঞ্জ হতে হবে। একজন নারীকে সন্তান প্রতিপালন থেকে পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। তারপর সে অফিসে আসছে। যেখানে একজন পুরুষ সেবা নিয়ে এসেছে আর একজন নারী সেবা নিয়ে এসেছে– এরপর দুজনের পারফর্মেন্স যখন সমান চাওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে নারীর ওপর জুলুম করা হচ্ছে না? ফলে নারী এখানে একটু কম

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে কৃষিক্ষেত্রে সৃষ্টিমূলক কর্মসূচি ও প্রকল্প পরিচালনা করছে টিএমএসএস। টেকসই খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে সংস্থাটি শস্যবীজ উৎপাদন ও বিতরণ, যন্ত্রে চাষ, কার্যকর সেচ ব্যবস্থা, গৃহ প্রাঙ্গণে বাগান ও আবাদি জমির মান উন্নয়নে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি খাতের পাশাপাশি গবাদি পশু পালন ও পোল্ট্রি শিল্পে বড় পরিসরে ঋণ প্রদান করে বেসরকারি এই উন্নয়ন সংস্থাটি। শুধু ঋণ বিতরণই নয়, কৃষি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ পদ্ধতি জনপ্রিয়করণ ও এর বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি দাতা সংস্থার অর্থায়নে সংস্থাটি এর ঋণগ্রহীতাদের জন্য পরিচালনা করছে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। টিএমএসএস এর এসব উদ্যোগের ফলে গ্রাহক পর্যায়ে যেমন সাফল্য এসেছে তেমনি সমৃদ্ধ হয়েছে জাতীয় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা। সংস্থাটির ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে তাদের কৃষি কর্মসূচির আওতাভুক্ত ছিলো ৮ হাজার ৭৮০ শতাংশ জমি, ধান উৎপন্ন হয়েছে ২১ হাজার ২৪০ কেজি, পাট উৎপন্ন হয়েছে ২ হাজার ৭৩৯ কেজি এবং সবজি ও আলু উৎপন্ন হয়েছে যথাক্রমে ৩৫ হাজার ৬৫৫ ও ৪৪ হাজার ৪৫ কেজি। আর এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে ১৬৬৬ জন এবং পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে ২৩ হাজার মানুষ।

যদি অর্জন করে ওই পরিসংখ্যান ধরেই নারীর ওপর কলম ধরা হচ্ছে। আর এটা হলো মানসিক নির্যাতন।

প্রত্যয় : আপনি আমাদের দেশে এনজিও খাতে বেগম রোকেয়ার মতো সাবলীল কিছু কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। আপনি যে এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছেন, এতে আপনি কতোটা সন্তুষ্ট?

ড. হোসনে আরা বেগম : আর্থিক, সম্পদগত, অবকাঠামোগত, পরিবেশগত উন্নয়নে আমি স্যাটিসফাইড। কিন্তু ইথিকস বেজ আর মানুষের প্রতি মানুষ যে দয়ার্দ্র হয়ে সেবা দেবে এখানে আমার আনস্যাটিসফেকশন আছে।

প্রত্যয় : আপনি দীর্ঘদিন ধরে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ শিক্ষার উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। এই কাজে নিয়োজিত থেকে আপনি কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন?

ড. হোসনে আরা বেগম : সারা বাংলাদেশে আমাদের গ্রুপ আছে, সমিতি আছে, সেখানে সমিতির আলোচনার মাধ্যমে একটা ইনফরমাল শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ফরমাল এডুকেশনে আমাদের ১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে।

বিসিএল অ্যাভিয়েশন

বিসিএল অ্যাভিয়েশন একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি যদেও এটি টিএমএসএস-এর একটি সিস্টার কনসার্ন। টিএমএসএস-এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক ড. হোসনে আরা বেগম ২০১৬ সালে যাত্রা শুরু করা বিসিএল অ্যাভিয়েশনের চেয়ারম্যান। রবিনসন-৬৬ মডেলের দুটি হেলিকপ্টার নিয়ে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে এই অ্যাভিয়েশন সার্ভিস। কর্পোরেট ফ্লাইট, জরুরি রোগী পরিবহন ও ব্যক্তিগত ভ্রমণেরও সুযোগ রয়েছে এই অ্যাভিয়েশন প্রতিষ্ঠানটির সেবার আওতায়। দেশের বাইরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাইলট ও প্রকৌশলীদের দ্বারা পরিচালিত হয় বিসিএল অ্যাভিয়েশনের সব ফ্লাইট। ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রতিষ্ঠানটির আছে ১৬ হাজার ফুয়ার ফিট এর একটি হ্যাঙ্গার ও ৮ হাজার ৭০০ ফুয়ার ফিটের টারমাক। বাংলাদেশের অ্যাভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে হেলিকপ্টার সেবার চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকায় অদূর ভবিষ্যতে সর্বাধুনিক মডেলের আরো একাধিক হেলিকপ্টার যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির।

ইউনিভার্সিটি, মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ডেন্টাল কলেজ–এগুলোতে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। আমাদের মেডিকেল কলেজে দরিদ্রদের জন্য একটা কোটা আছে। এই কোটাতে অসচ্ছল-মেধাবী দরিদ্রদেরকেই পড়াতে হবে। আমি তো ১০ ভাগ দরিদ্রও ওই কোটায় নিতে পারি না। শিক্ষার্থী নির্বাচনের শুরুর এক মাস আগে থেকে এবং পরবর্তী তিন মাস আমার অশান্তিতে ঘুম হয় না। বিরাট বড় ধনী মানুষের সন্তানরা ঢুকে যাচ্ছে এবং তাদেরকে নিতে বাধ্য হচ্ছি, আমার সিপনেচার দিতে হয় সেখানে।

অথচ এটা গরিবের কোটা সেখানে গরিবদেরকেই নিতে পারছি না। আমার সহকর্মীরা বলছেন যে, ম্যাডাম কলেজটা রক্ষা করেন। এখন কলেজ রক্ষা করার জন্যই এটা মেনে নিতে হচ্ছে। আবার যাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভর্তি করানো যেতো, তাদের কাছ থেকে অর্ধেক টাকা নিয়ে ভর্তি করা হচ্ছে ফলে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে, যেটা দিয়ে গরিবদেরকে দেয়া যেতো।

প্রশ্নঃ সেক্ষেত্রে সরকারের কোনো সহযোগিতা চাচ্ছেন কি না? অর্থাৎ আপনারা ৫% রাখবেন, সরকারেরও তো একটা নীতি আছে–

ড. হোসনে আরা বেগম : সরকার বলে যে ওটাই তো গরিবের জন্য রেখেছি। গরিবদেরকে নিতে পারছেন না সেটা আপনার ব্যর্থতা। এটা হতে পারে যে, সরকারি সাপোর্টটা একটু বাড়িয়ে একদম গরিবের পরিবারে যাবে। পরিবার সরকার হলে তারাই টাকা দিয়ে পড়াবে। তখন এখানে সরকারের সিলেকশনে ডাইরেক্ট ইনভলবমেন্ট থাকবে। এছাড়া আমাদের বাকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো হলো টেকনিক্যাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। টেকনিক্যাল প্রডুকেশনের রেজাল্ট খুবই ভালো। যারা পাস করে বের হচ্ছে দেশে-বিদেশে সবারই চাকরি হচ্ছে। দেশে আপাতত টেকনিক্যাল প্রডুকেশনকে আরো বাড়ানো প্রয়োজন। আমার ধারণা এক্ষেত্রে সরকারেরও পরিকল্পনা আছে। কেরানি সিস্টেম শিক্ষা যাতে না থাকে, উৎপাদনমুখী, জীবনভিত্তিক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন শিক্ষা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন অথরিটি (এনএসডিএ) এর মাধ্যমে এগুলোর উন্নয়ন ঘটানোর জন্য সরকার বহুমুখী চেষ্টা করছে।

প্রশ্নঃ আপনি একজন নারী উদ্যোক্তা। আপনি জানেন যে, অসংখ্য নারীর মধ্যপ্রাচ্যে কাজের সুযোগ আছে এবং তারা যাচ্ছেও। কিন্তু যাওয়ার পর সেখানে নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে ফলে অন্য যারা যাবে তারা আর এই প্রতিবন্ধকতার ভেতর যেতে চাচ্ছে না। নিরুৎসাহিত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন এখান থেকে যারা নারী কর্মী হিসেবে যাবেন তাদের জন্য স্পেশালি ১ মাস, ৩ মাস, ৬ মাসের ট্রেনিং নিয়ে পাঠালে সেখানে তাদের কাজের পরিধিটা বাড়ে? সেই ধরনের চেষ্টা কি আপনাদের আছে?

ড. হোসনে আরা বেগম : সরকারের উচিত এই দায়িত্বগুলো এনজিওদের দেয়া। কারণ এনজিওদের নেটওয়ার্ক প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এমএসডিএ এবং বিশ্বব্যাংকের প্রকল্প অ্যাসেটের মাধ্যমে সরকারকে আমরা একটা প্রোপোজাল দিয়েছি।

প্রশ্নঃ আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।

ড. হোসনে আরা বেগম : আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো ইথিকস ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করা। দেশের সব জেলাতে আমাদের কার্যক্রম নেই। তাই সব জেলাতে সমহারে ইথিকস ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে কাজের বিস্তার ঘটানোর পরিকল্পনা আছে।

প্রশ্নঃ আপনি কি মনে করেন সারা দেশেই আপনি শাখা করবেন কিন্তু ইথিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হয়নি, সেটা ভালো নাকি অল্প জায়গায় ইথিক্যাল ডেভেলপমেন্ট করে কাজ করা ভালো?

ড. হোসনে আরা বেগম : ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট বিষয়টা এক জায়গায় করা যাবে না, কারণ এর প্রাচীর বা ওয়াল থাকতে পারবে না। আমাদের বর্তমান সমাজ হলো ইন্টারনেটিড এবং মোবাইল সমাজ। এখানে ডেভেলপমেন্ট যদি অল্প একটুও হয় তবুও সর্বত্রই হতে হবে। তা হলেই সেটা টেকসই হবে।

প্রত্যয় : আমাদের দেশ যদিও এখনো পিছিয়ে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী, বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী, স্পিকার নারী– এ পর্যায়ে এসে দেশের যে সার্বিক চিত্র আপনার সামনে, সেটা কি আশান্বিত আপনার দিক থেকে? তাছাড়া প্রশাসনে, পুলিশে যেভাবে নারীরা আছেন সেভাবে রাজনীতিতে নেই কেন?

ড. হোসনে আরা বেগম : আমি আশান্বিত। রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ কম হওয়ার কারণ হচ্ছে তাদের সেভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা গড়ে ওঠেনি।

প্রত্যয় : আপনি কি ভবিষ্যতে রাজনীতি করার চিন্তা করছেন?

ড. হোসনে আরা বেগম : না। ভবিষ্যতে রাজনীতি করার চিন্তা আমার নেই। আমি যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে এনজিওতে ঢুকেছি সেখানে এটাও প্রতিশ্রুতি ছিল যে কোনোদিন রাজনীতি করবো না। তবে সুস্থ ও স্বচ্ছ ধারার রাজনীতির সহায়ক হিসেবে থাকবো।

প্রত্যয় : এফএনবি নেটওয়ার্ক নিয়ে কিছু বলবেন?

ড. হোসনে আরা বেগম : এফএনবি'র নেটওয়ার্ক আরো সবল হওয়া দরকার, সক্রিয় হওয়া দরকার। একটা কথা মানতে হবে যে, সরকার খুবই শক্তিশালী। আমি মনে করি, এনজিও/এমএফআইদের ক্ষেত্রে সরকারের সুদৃষ্টি যতোটা থাকা দরকার তা নেই। একসময় এডাবের প্রতি সরকারের বেশ সুদৃষ্টি ছিল। যখন আবেদ ভাই ছিলেন, রাশেদা কে চৌধুরী ছিলেন তখন পর্যন্ত এডাব ঠিক ছিল। পরে তারুক ভাই আসার প্রথম দিকেও ঠিক ছিল এরপর রাজনীতি সম্পৃক্ত হওয়ার পরে সরকার থেকে দূরে সরে গেল।

প্রত্যয় : তা হলে কি করলে এফএনবিও এডাবের মতো সরকারের আস্থা অর্জন করতে পারবে?

ড. হোসনে আরা বেগম : নিরপেক্ষ, অগ্রণী, সেক্টরবান্ধব এবং জাতীয় পর্যায়ের যারা আছেন তাদের নেতৃত্বে আসতে হবে। যেমন এখন জাকির ভাই আছেন। উনি ঠিকই আছেন কিন্তু উনি একা থাকলে হবে না। বোর্ডের সবাইকে থাকতে হবে। যেমন ধরুন আমার সংগঠন সারা বাংলাদেশে কাজ করে কিন্তু ঢাকায় আমার অবস্থান নেই। ফলে আমার যোগাযোগ মন্ত্রী এবং পাওয়ার বডির পার্সনের সাথে তেমন নেই। অনেকের আছে। তাদের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে এবং মনোযোগে তাদের কন্ট্রিবিউশন বাড়াতে হবে। এটাই হলো আমার পরামর্শ।■

ড. হোমায়রা ইসলাম

নির্বাহী পরিচালক, শক্তি ফাউন্ডেশন

কর্মজীবী নারীর সন্তানদের দেখার জন্য সাপোর্ট সিস্টেম প্রয়োজন

বাংলাদেশের বেসরকারি উন্নয়ন খাতের অন্যতম উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব হোমায়রা ইসলাম শক্তি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক। উদ্যমী, আত্মপ্রত্যয়ী ও পশ্চাৎপদ নারী সমাজের উন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ ড. হোমায়রা ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ. ডিগ্রিসহ এমফিল ও পিএইচডি করেছেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল 'নারীর ক্ষমতায়ন'। অধ্যয়ন শেষে তিকারুননিসা নুন স্কুলে ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে পেশাজীবন শুরু করলেও তিনি এক পর্যায়ে মাইক্রো ফিন্যান্স প্রতিষ্ঠান শক্তি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এর নির্বাহী পরিচালক। শক্তি ফাউন্ডেশন মূলত জেন্ডার ইস্যুসহ নারীর ক্ষমতায়নে নেতৃত্ব উন্নয়ন, কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট এবং এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ড. হোমায়রা ইসলাম ওমেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকিং (WWB) এর বোর্ড ট্রাস্টি, ইনাফি এর নির্বাহী পরিষদের এশিয়া চ্যাপ্টারের সদস্য, ভায়োসিটিক অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর সদস্য, উৎস বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিষদ সদস্য। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেল্থ সায়েন্সেস (BUHS), National Caucus for Womens Economic Empowerment Bangladesh এর সদস্য এবং Coalition of the Urban Poor (CUP) এর প্রতিষ্ঠাতা কো-অর্ডিনেটর।

ড. হোমায়রা ইসলাম এর আগে মানবিক সাহায্য সংস্থা (MSS) এর প্রজেক্ট ডিরেক্টর এবং CIRDAP এর রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি কর্মসাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ASHOK Fellow, ওমেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকিংয়ে Excellence In Leadership Award 2022 এবং Citi Microentrepreneurship Award 2011 লাভ করেছেন। প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন : শক্তি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাকালে সমাজে নারীর অবস্থান এবং তিন দশক পর আজকে নারীর অবস্থান তুলনা করতে বললে কী বলবেন?

ড. হুমায়রা ইসলাম : দেখুন, তিন জেনারেশনের মহিলাদের মন-মানসিকতা কিন্তু তিন রকম। প্রথম যুগে আমরা যাদেরকে নিয়ে কাজ করেছি তারা ছিল সামাজিকভাবে খুবই পিছিয়ে পড়া। তারা তাদের বাড়ির মধ্যে, পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তাদের তেমন কোনো আয় ছিল না। তাদের কোনো মতামত ছিল না, শুধু আর্থিকভাবে না, সামাজিকভাবেও। এক কথায় বলতে গেলে তারা একটি দারিদ্র্যজালে আবদ্ধ ছিল। এসব দরিদ্র পরিবারের মহিলাদেরকে নিয়ে আমরা প্রথম যুগে যখন কাজ করেছি তখন মূল কাজটি ছিল তাদেরকে ঘর থেকে বের করে আনা এবং আর্থিক স্বাধীনতার স্বাদ দেয়া।

মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টরে কাজ করতে গিয়ে আমরা তাদের জন্য দুটো কাজ করেছি। একটি হলো শুরুতে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে আমরা তাদেরকে ঘর থেকে বের করে এনেছি। ফলে তার একটা পরিচিতি হলো, একটা নাম হলো। এর আগে সে কারো মা, কারো স্ত্রী হিসেবে পরিচিত ছিল। যখন আমরা তাদেরকে মাইক্রোফাইন্যান্সে সম্পৃক্ত করলাম প্রথমেই তাদেরকে একটা আইডেন্টিটি দিলাম, তার যে একটা নাম আছে সেই স্বীকৃতিটা দিলাম। এটা তাদের জন্য একটি বিশাল পাওনা ছিল। অর্থাৎ আমাদের বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো পিছিয়ে থাকা গৃহবন্দি নারীদের একটি নিজস্ব সত্তা দিতে পেরেছি।

এখন টেলিভিশন বা পত্রপত্রিকায় সফল নারী উদ্যোক্তাদের গল্প আমরা শুনি। তখন আমার উপলব্ধি হয় যে এটাই হচ্ছে আমার প্রাপ্তি। এই সফল উদ্যোক্তা নারীটি কে? সে হতে পারে একটি গাভি পালন করে এখন তার একটি ফার্ম আছে, এই নারীটি হতে পারে সে বিউটি পার্লারে কাজ করে এখন তার একটি বিউটি পার্লার আছে। এখন যেসব নারীদের আমরা দেখি যাদের সাফল্যের কারণে আজ তারা বিভিন্ন পর্যায়ে অ্যাওয়ার্ড লাভ করছে– এদের মায়েরাই ছিল আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্মের ঋণগ্রহীতা এবং তাদের মায়েরা ছিল আমাদের প্রথম প্রজন্মের ঋণগ্রহীতা– যাদেরকে আমরা ঘর থেকে বের করে এনেছিলাম। সুতরাং নিজের সাফল্য বা কৃতিত্ব আমি কিন্তু এদের সফলতার মধ্যে দিয়েই দেখতে পাই এবং আমার সাথে যারা কাজ করে তাদেরকে বলি যে, টেলিভিশনে এই যে সফলতার গল্পটি দেখতে পাচ্ছো এটিই তোমাদের কাজের ফসল। এটি কিন্তু হঠাৎ করে এ জায়গায় আসেনি।

সম্প্রতি আমি একটি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করলাম। সেখানে পাঁচটি সেক্টর থেকে ১০ জন তরুণ উদ্যোক্তা এলো। এর মধ্যে একজনের একটি বুটিক আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি বুটিক করলেন কেন? সে বলল, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন দেখতাম আমার মা আমাদের জন্য খুব সুন্দর করে জামা-কাপড় সেলাই করত। সেলাই করা মূলত তার শখ ছিল। কিন্তু আমি যখন বড় হলাম তখন চিন্তা করলাম যে মায়ের এই কাজটা তো আমিও করতে পারি। তবে অর্থের বিনিময়ে। অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রজন্মের মায়ের কাছে যেটি ছিল শখের, ঠিক সেই কাজটিকে তৃতীয় প্রজন্মের মেয়ে অর্থের বিনিময়ে ব্যবসায়িকভাবে চালু করল। এটি একটি উদাহরণ।

আমি যখন প্রথম প্রজন্মদের নিয়ে কাজ করেছি তখন তাদের মধ্যে অনেক ভয় ছিল। তাদেরকে ৩ হাজার টাকা ঋণ দিয়ে কাজ শুরু করি। এই পরিমাণ টাকা তাদের কাছে অনেক বড় ছিল। তারা হয়তো দু'চারশ টাকা নাড়াচাড়া করেছে, কিন্তু তিন হাজার টাকা একসাথে দেখেনি। তারা যখন এই টাকা বিনিয়োগ করে প্রথম উপার্জন করলো তখন সে তার উপার্জনের অর্থ ইচ্ছামতো খরচ করতে পারল। তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম আপনারা যে আয় করলেন এতে আপনাদের জীবনে কি পরিবর্তন এসেছে? উত্তরে কেউ বলতো, একসময় বাচ্চাকে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি, খাওয়াতে পারিনি, এখন অন্তত খাওয়াতে পারছি। কেউ বলতো আমার স্বামী চলে গেছে এখন যে আয় করছি– সে আবার ফিরে এসেছে, বাচ্চারা তাদের বাবাকে ফিরে পেয়েছে এমন অনেক গল্প। এভাবে আস্তে আস্তে তারা এগোতে লাগল। প্রথমে তিন হাজার, এরপর পাঁচ হাজার, সাত হাজার, দশ হাজার। পরবর্তী প্রজন্ম কাজ করছিল বিশ হাজার, ত্রিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে। আর বর্তমান প্রজন্ম কাজ করছে লাখ লাখ টাকা দিয়ে। এই যে একটা গতি এটাও এক ধরনের সম্প্রসারণ।

আমাদের প্রথম প্রজন্মের সদস্যরা যখন টাকা নাড়াচাড়া করেছে চিনাবাদাম, মুড়কি বা ভাজাভুজির ব্যবসা করার জন্য তখনই তারা শিখল কীভাবে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হয়। বাণিজ্যিক লেনদেন কীভাবে করতে হয়। তখন এক ছটাক চিনাবাদাম বা আনুমানিক ৫০টি চিনাবাদাম দিয়ে এক ঠোঙার মূল্য যদি ৩ টাকা হয় তখন সে শিগগিরই শিখে গেল যে ৪০টি চিনাবাদাম দিয়েও এক ঠোঙা করা যায় এবং যার বিক্রয়মূল্য ওই ৩ টাকাই কিংবা আর একটু বেশি। এখানেই তার মার্জিনটা এসে গেলো। যেটি বড় বড় শিল্প ব্যবসায়ীরা করে। ব্যবসায় প্রাথমিক জ্ঞান সে সেখান থেকেই লাভ করেছে। তারপর তারা টাকা জমানো বা সেভিংস করা শিখলো। সবচেয়ে বড় কথা টাকা জমালে মাকে টাকা পাঠানো যায়। মেয়েদের মা-বাবাকে টাকা দিয়ে সেবা করার একটা ইচ্ছা থাকে কিন্তু তার নিজের উপার্জন যদি না থাকে তা হলে অন্যের টাকা পাঠানো খুব কঠিন। মা তার মেয়ের পাঠানো টাকায় হয়তো ওষুধ কিনছে বা অন্য কোনো কাজ করছে, কারো কাছে হাত পাততে হচ্ছে না। এটাও কিন্তু নারীর ক্ষমতায়নের একটি বিষয়। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারেও কিন্তু তার একটা সামাজিক স্বীকৃতি আসে। সে যখন ব্যবসা করছে তখন হয়তো তার স্বামীকে বলল, আমাকে চকবাজার থেকে ৫০টি শাড়ি এনে দাও। এই যে যোগাযোগ এগুলো কিন্তু ব্যবসায়িক কথাবার্তা। প্রতিদিনের পারিবারিক আলোচনার বাইরেও এ ধরনের আলোচনা হয় ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা সুসম্পর্ক তৈরি হয়। যার ফলশ্রুতিতে ধীরে ধীরে লিঙ্গবৈষম্যটাও কমে আসছে।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন যে, এই যে একজন নারী উপার্জন করছে তার উপার্জিত টাকা কি তার স্বামীর কাছে যাচ্ছে নাকি কোনো উৎপাদনমুখী খাতে খরচ করছে?

ড. হুমায়রা ইসলাম : আপনি যখন আয় করছেন বা আমরা যখন আয় করছি

তখন এই টাকাটা আমরা সংসার বা পরিবারের জন্যই খরচ করছি। মহিলা বলতে গিয়ে তাকে আমরা এতো বেশি একঘরে করে ফেলেছি যে পুরুষ যখন আয় করে তখন কিন্তু তাকে প্রশ্ন করা হয় না আপনি আপনার টাকাটা স্ত্রীকে দিচ্ছেন কি না? পুরুষরা ঠিকই তার স্ত্রীকে টাকাটা দিচ্ছে, বাচ্চার লেখাপড়ার জন্য খরচ করছে, সংসারের জন্য খরচ করছে। তবে মহিলারাও কিন্তু স্বামী-সন্তান-সংসারের জন্য খরচ করে। মাইক্রোফাইন্যান্সের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা এই যে নারীকে বলছি তুমি পরিবারের পার্ট না তুমি একক। অর্থাৎ সে আর নির্ভরশীল নয়, ফ্যামিলিটাকে আমরা বিভাজন করে দিচ্ছি। তাই আমি বলবো যে গত দশকে নারীর ক্ষমতায়নে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে।

প্রশ্ন : বিগত দুই দশকে বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এর পেছনে নারী সমাজের ভূমিকা কতোখানি বলে আপনি মনে করেন?

ড. মোবাশ্বেরা ইসলাম : যে নারীটি এমএফআইতে চাকরি করছে সে কিন্তু নিজের উন্নয়নের জন্য, নিজের ক্যারিয়ারের জন্য, নিজের একটা স্বপ্ন পূরণের জন্য কাজটি করছে। সে পিছিয়ে থাকতে চায় না, সে এগিয়ে যাচ্ছে। আর যে নারীটি এমএফআই থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসা করছে তারও কিন্তু একই উদ্দেশ্য যে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। আমরা বলি যে, ব্যবসায়িক এলায় বা ফেজিং। সে কথাটাকে যদি প্রতিষ্ঠানের প্রসঙ্গে বলি যে নারীটি আজ শক্তিতে কাজ করছে, যুগোতে কাজ করছে বা অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে তারাও কিন্তু ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করছে। এ বিষয়ে আমি খুব একটা ভিন্নতা দেখি না। এ যুগের নারীরা অনেক ক্ষমতাপ্রাপ্ত। প্রথমত তারা শিক্ষিত, দ্বিতীয় হচ্ছে তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী। যে অর্থ তারা উপার্জন করছে সেটি খরচ করে তাদের স্বাদ-আহ্লাদ পূরণ করছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, দুই শ্রেণির নারীরাই এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : সরকারের পাশাপাশি আপনারা দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনসমূহ নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীদের উন্নয়নে কাজ করছেন। তারপরও নারী সমাজ এখনো অনেক পিছিয়ে। এক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

ড. মোবাশ্বেরা ইসলাম : প্রথমত আমি মনে করি না যে, নারী সমাজ পিছিয়ে আছে। আমি বলেছি যে, তিন দশকে তিন প্রজন্মের নারীদের নিয়ে আমি কাজ করেছি। এখনকার নারীরা প্লেন চালাচ্ছে, ট্রেন চালাচ্ছে, সেনাবাহিনী, সচিবালয়, ব্যবসা, প্রশাসনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই কাজ করছে। কোথাও তারা পিছিয়ে নেই। কিন্তু যে গতিতে অগ্রসর হওয়ার কথা সেই গতিতে হয়তো হচ্ছে না।

আমি বলবো সরকার অনেক সহায়ক। মেয়েদের পড়ালেখার সুযোগ দিচ্ছে, বৃত্তি দিচ্ছে, প্রণোদনা দিচ্ছে। সরকার যেটা করতে পারে সেটা হলো পুরুষদেরকে নিয়ে যে কতগুলো ভুল ধারণা আছে সেগুলো ভাঙতে পারে। আমরা প্রতিবন্ধকতা শুধু নারীদের বেলায় বলছি, তখন সব দায়-দায়িত্ব কিন্তু নারীদের দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু একটা সমাজে নারীর পাশাপাশি পুরুষেরও দায়িত্ব আছে। যেমন কোনো পুরুষের স্ত্রী যদি কোনো কর্মসংস্থানের সাথে জড়িত থাকে। তখন তাকে সাপোর্ট দিতে হবে, তাকে উপলব্ধি করতে হবে সংসারটা দুজনেরই। আমার মনে হয় এখনকার নারীরা এসব বিষয়গুলো কেয়ার করে না। যারা কেয়ার করে তারা বের হতে পারছে না।

একটা কারণ হচ্ছে যে, নারীরা যখন কাজে আসে তখন তাদের মাথায় একটা চিন্তা থাকে যে তাদের সন্তানকে কে দেখবে। তাদের জন্য একটা সাপোর্ট সিস্টেম দরকার। আমি মনে করি, সরকারিভাবে এই সাপোর্ট সিস্টেমটা ব্যাপকভাবে থাকা দরকার। প্রথমত নারীদেরকে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে কাজের সুযোগ দিতে হবে। পাশাপাশি সেই নারী যেন স্বাচ্ছন্দে তার কাজটি করতে পারে এবং তার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যেতে পারে সেই সাপোর্ট সিস্টেমটা তাদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে।

আগে যখন যৌথ পরিবার ছিল তখন নারীদের কর্মক্ষেত্রে এলে তার সন্তানকে নিয়ে চিন্তা করতে হতো না, কারণ বাচ্চাকে দেখাশোনার জন্য কেউ না কেউ ছিলই। কিন্তু এখন একক বা ছোট পরিবার হওয়ার কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। আবার এখনকার পরিবারে মা, শাশুড়ি থাকলেও দেখা যায় তারাও চাকরি বা ব্যবসা করছেন অথবা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত আছেন যে কারণে তারা বাচ্চার দেখাশোনা করতে পারছেন না। সে কারণেই রাষ্ট্রীয়ভাবে একটা সাপোর্ট সিস্টেম দেয়া দরকার। তাদের জন্য ডে কেয়ার সিস্টেমের ব্যবস্থা অবশ্যই করা দরকার।

প্রশ্ন : সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, নারীর ক্ষমতায়নের ফলে যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। এখন অনেক পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সেটাই মনে করে। এর পেছনে তারা কারণ হিসেবে দেখছে যে নারীরা এখন চাকরি করে স্বাবলম্বী হচ্ছে, এনজিওরা নারীদেরকে চাকরি দিয়ে, টাকা- পয়সা দিয়ে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিচ্ছে, অতঃপর তারা পড়ালেখায় এগিয়ে যাচ্ছে। যে কারণে এখন বিচ্ছেদ বেড়ে গেছে। আগে এক পরিবারে ৪ জনের জায়গায় এখন ১ সন্তান নিচ্ছে। তারপরও সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে। এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন?

ড. মোবাশ্বেরা ইসলাম : এটা নারী বলে নয়। এটা হলো সময়ের ধারাবাহিকতা এবং সময়ের চাহিদা। আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বিদেশে যাচ্ছে। সেখানে একজন পুরুষ যখন ৫০/৬০ হাজার টাকা আয় করে তখন তার ইচ্ছে হয় তার কিছু কনজাম্পশন প্রোডাক্ট থাকুক। একটা ছোট বাসা, টেলিভিশন, ফ্রিজ থাকুক। বাচ্চাটা ভালো স্কুলে পড়ালেখা করুক। এটা শুধু নারীর ইচ্ছা না পুরুষেরও ইচ্ছা এবং পুরুষরাই কিন্তু নারীদের প্রথম বলেছে যে চলো আমরা আলাদা হয়ে যাই। যতক্ষণ না পুরুষ চাইবে কোনো নারীর সাধ্য নেই আলাদা হবে।

প্রশ্ন : নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কি না? সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য এনজিও নেতৃবৃন্দ বা এনজিও নেটওয়ার্কগুলো কি ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

ড. মোবাশ্বেরা ইসলাম : আমি বলবো সরকার অনেক সহায়ক। মেয়েদের পড়ালেখার সুযোগ দিচ্ছে, বৃত্তি দিচ্ছে, প্রণোদনা দিচ্ছে। সরকার যেটা করতে পারে সেটা হলো পুরুষদেরকে নিয়ে যে কতগুলো ভুল ধারণা আছে সেগুলো ভাঙতে পারে। আমরা প্রতিবন্ধকতা শুধু নারীদের বেলায় বলছি, তখন সব দায়-দায়িত্ব কিন্তু নারীদের দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু একটা সমাজে নারীর পাশাপাশি পুরুষেরও দায়িত্ব আছে। যেমন কোনো পুরুষের স্ত্রী যদি কোনো কর্মসংস্থানের সাথে জড়িত থাকে। তখন তাকে সাপোর্ট দিতে হবে, তাকে উপলব্ধি করতে হবে সংসারটা দুজনেরই। আমার মনে হয় এখনকার নারীরা এসব বিষয়গুলো কেয়ার করে না। যারা কেয়ার করে তারা বের হতে পারছে না।

প্রশ্ন : আপনার দৃষ্টিতে নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কি বোঝায়? অর্থাৎ কি কি করলে নারীর ক্ষমতায়ন হতে পারে? বাংলাদেশে নারীদের জন্য আলাদা কোনো ব্যাংক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

ড. মোবাশ্বেরা ইসলাম : নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে একটা মানুষের বেঁচে থাকার যে অধিকার সেটি যখন একজন নারী পায় তখন সে ক্ষমতায়ন হয়। অধিকার বলতে বুঝি, আমার জীবন আমি আমার মতো পরিচালনা করবো। আমার

আমি মনে করি না যে, নারী সমাজ পিছিয়ে আছে। আমি বলেছি যে, তিন দশকে তিন প্রজন্মের নারীদের নিয়ে আমি কাজ করেছি। এখনকার নারীরা প্লেন চালাচ্ছে, ট্রেন চালাচ্ছে, সেনাবাহিনী, সচিবালয়, ব্যাংকসহ প্রশাসনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই কাজ করছে। কোথাও তারা পিছিয়ে নেই। কিন্তু যে গতিতে অগ্রসর হওয়ার কথা সেই গতিতে হয়তো হচ্ছে না।

মতো করে পরিচালনা করতে গেলে ছোটবেলা থেকেই আমার মধ্যে যে সম্ভাবনাগুলো আছে সেগুলোকে বিকশিত করতে হবে। আমি আমার মতো করে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঘুরতে পারব, আমার ইচ্ছে অনুযায়ী যেকোনো কাজ করতে পারবো, কেউ আমার ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেবে না- এটাই হলো নারীর ক্ষমতায়ন।

প্রশ্ন : আপনি শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। আপনি শিক্ষাক্ষেত্রে না থেকে উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করলেন কেন? বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে নারীবান্ধব করার ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি?

ড. হোমায়রা ইসলাম : আমি যখন পিএইচডি করছিলাম তখন আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সেই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধু চিন্তা করলেন কীভাবে নারীদেরকে মেইন স্ট্রিমে আনা যায়; সেখানে নারীদের নিয়ে আলাদা একটা অধ্যায়ই ছিল এবং জাতীয়ভাবেও একটা চিন্তা ছিল।

আমি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বেশ কয়েকটি বৈঠকে গিয়েছিলাম। সেখানে টেবিলে সবাই পুরুষ। ১৯৯২ সালে একটি প্রবল সাইক্লোন পরবর্তী প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ক একটি কনফারেন্সে তারা অনেক তথ্য শেয়ার করেছিল কিন্তু নারীদের কি পরিমাণ কষ্ট হয়েছিল সে বিষয়ে তারা কোনো আলোকপাত করেনি। অথচ সেই সাইক্লোনে নারীরাই বেশি মারা গিয়েছিল। কারণ, ঝড়ের পূর্ব মুহূর্তে যখন মাইকিং করা হয় তখন পুরুষরা বেরিয়ে গিয়েছিল কিন্তু নারীরা তাদের গৃহপালিত হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগলসহ সংসারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসছিল তখন অনেকেই শাড়ি পায়ে পেঁচিয়ে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। শুধু শাড়ির কারণে তারা বাঁচতে পারেনি। এই কথাগুলোও যে মাইকিংয়ের বিষয় ছিল এবং মহিলারা যে কীভাবে সাঁতার করে সেই বিষয়টি উঠে আসেনি।

সে সময়ে নানা দিক বিবেচনা করে দেখলাম যে শিক্ষকতা তো করাই যায়, সেটা এক ধরনের কিন্তু ব্যাপক হারে যদি সমাজসেবা করতে পারি যেহেতু আমার বিষয় ছিল নারীর ক্ষমতায়ন সে কারণেই উদ্যোগী হয়ে এই পেশায় আসা।

প্রশ্ন : আমাদের দেশের বেসরকারি সংস্থা কিংবা সরকার যে পদ্ধতি ও গতিতে নারী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে তা কতটুকু ফলপ্রসূ বলে আপনি মনে করেন?

ড. হোমায়রা ইসলাম : অনেক। চারদিকে তাকালেই সেটি বোঝা যায়। গ্রামের স্কুলগুলোতেও বাচ্চারা কম্পিউটার, বিজ্ঞানসহ সব বিষয়েই খুব সুন্দরভাবে এগোচ্ছে। ফলাফল ভালো করছে। লেখাপড়ার একটা আগ্রহ এসেছে এবং লেখাপড়াই হচ্ছে উন্নয়নের ভিত্তি। নারীরা পিছিয়ে আছে বললে আমার খুব খারাপ লাগে। আমি তো কোথাও দেখি না। আমার বাসার গৃহকর্মীর বাড়ি সিলেটে। সেখানে তার দুই বাচ্চা রেখে অর্থ উপার্জনের জন্য ঢাকায় এসেছে। বাড়িতে তার স্বামী বাচ্চা দুটোকে দেখাশোনা করে কিন্তু সে মোবাইলের মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবেই বাচ্চা দুটোকে ঢাকায় বসে গাইড করছে। সে যেহেতু মোবাইল ব্যবহার করছে, ইন্টারনেট ব্যবহার করছে তার তো পিছিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

প্রশ্ন : পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য আপনার তথা শক্তি ফাউন্ডেশনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।

ড. হোমায়রা ইসলাম : আমি মনে করি নারীদেরকে বেশি বেশি প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত করতে হবে। বিশেষ করে তাদের উপার্জিত অর্থের গোপনীয়তা খুব দরকার। কেননা যখন পরিবারের কিংবা বাইরের কেউ জানতে পারে যে তার কাছে উপার্জন করে টাকা জমেছে তখন কিন্তু এই টাকাটার ওপর সবার চোখ পড়ে। যখন প্রযুক্তি ব্যবহার করবে তখন সে-ই শুধু জানবে তার অ্যাকাউন্টে কত টাকা জমা আছে। ফলে তার অর্থ নিজের আয়ত্তেই থাকবে। আবার আমরা যারা প্রোভাইডার, প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদেরকে অর্থায়ন করতেও অনেক সুবিধা হবে। সে কারণে প্রযুক্তির ওপরই ফোকাসটা বেশি দরকার।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন, যে জনগোষ্ঠী নিয়ে আপনারা কাজ করেন তারা সবাই কিন্তু ব্যাংকে যায় না, তাদের জন্য সামর্থ্যবান এনজিওগুলোর সমন্বয়ে কি একটি এমএফআই ব্যাংক হতে পারে?

ড. হোমায়রা ইসলাম : আমরা যেই জনগোষ্ঠীদের নিয়ে কাজ করছি সেটি হচ্ছে একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত। ব্যাংকিং সেক্টরের কিছু ধারাবাহিকতা আছে, প্রোসিডিউর আছে, প্রসেস আছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে সেখানে এই জনগোষ্ঠীর সাথে লেনদেন করা কঠিন হবে। আমাদের শক্তি হচ্ছে যে লেনদেনের বাইরেও আমাদের সদস্যদের সাথে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক তৈরি করছি। যখনই ব্যাংক বলছি তখন কিন্তু একটা কাঠামো তৈরি হয়ে যাচ্ছে। অনেক কাগজপত্র যুক্ত হচ্ছে, অনেক আইনি বিষয় যুক্ত হচ্ছে, আমার মনে হয় এর প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রচলিত ব্যাংকগুলো যদি একটি উইং খুলে দেয় সেখানে মহিলাদের জন্য একটি পার্ট থাকবে তা হলেই হয়ে যায়। ■

ফারাহ কবির

কান্ট্রি ডিরেক্টর, অ্যাকশন এইড

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি বড় অবদান নারীদের

ফারাহ কবির দেশের বেসরকারি উন্নয়ন খাতের অন্যতম সংগঠন অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর। তিনি একজন গবেষক। ফারাহ কবির নারী অধিকার, লিঙ্গ সমতা এবং শিশু অধিকার নিয়ে দীর্ঘসময় ধরে কাজ করছেন। নারীর রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে তার বেশ কিছু প্রকাশনাও রয়েছে।

ফারাহ কবির ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (BIISS) এর রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি Asia Pacific Women in Politics (APWIP) News Letter এর সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি APWIP এর সেক্রেটারিয়েটে দুবছর সংসদীয় গণতন্ত্র এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়ন বিষয়ে কাজ করেন।

ফারাহ কবির ১৯৯৫ সালে নারীর রাজনীতি বিষয়ক সাব কমিটি, ২০০৩ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত স্কটল্যান্ড এর জিরো টলারেন্স বোর্ড এর ট্রাস্টি এবং ২০০৬-০৭ সালে স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গের Napier University'র বোর্ড অব গভর্নেন্সের সদস্য ছিলেন। বেসরকারি উন্নয়ন খাতের আলোকিত নারী ব্যক্তিত্ব ফারাহ কবির ২০০৭ সালের জুন থেকে অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করছেন।

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি নওয়াব আলী চৌধুরী ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ২০১২ অর্জন করেছেন। জেন্ডার এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে তার মূল্যবান প্রকাশনা রয়েছে। তিনি Education Watch এবং Funding Comittee of Civil Society Education Fund (CSEF) এর সদস্য। ফারাহ কবির বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন থেকেই টিভি এবং রেডিও মিডিয়ার সংবাদ পাঠক হিসেবে সাধারণের কাছে বেশ পরিচিত মুখ। দেশের উন্নয়ন খাতের মেধাবী ও সক্রিয় ব্যক্তিত্ব ফারাহ কবির প্রত্যয়কে দেয়া সাক্ষাৎকারে যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো:

প্রত্যয় : দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী সমাজ কতোটা ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন?

ফারাহ্ কবির : প্রত্যয়কে ধন্যবাদ। আমি বলবো যে, দেশের উন্নয়নে নারী সমাজ অনেক বড় ভূমিকা রাখছে। এমনিতে বলা হয় যে, সবকিছুর পেছনে নারী এবং পুরুষ উভয়ের কন্ট্রিবিউশন আছে। এ ছাড়াও দেখা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি বড় অবদান নারীদের। সেটা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে শহর পর্যন্ত। নারীর অবদান ব্যাখ্যা করতে গেলে আমি বলবো যে, সে সামগ্রিক অর্থনৈতিক একটা কন্ট্রিবিউশন করছে। কৃষিতে নারীর অবদান এখন যেভাবে স্বীকার করছি সেটা আগেও ছিল। তবে আগে ভাবা হতো সেটা তার গৃহস্থালি কাজ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নারীদের প্রাধান্য। নার্সিং পেশায় নারীরা, কনস্ট্রাকশন কাজ কিংবা ইট ভাঙার কাজ নারীরা করছে। পোশাক শিল্পের অবদানে নারীদের অংশগ্রহণের কথা নতুন করে বলার কিছু নেই।

নারীরা যে গৃহস্থালির কাজ করেন কোনো পারিশ্রমিক ছাড়া সেই কাজগুলো যদি পেইড ওয়ার্কার দিয়ে করা হয় তখনই বোঝা যাবে নারীর কতখানি অবদান। এখন নারী উদ্যোক্তা বেড়েছে, বিভিন্ন সেক্টরে নারীরা আসছে। নারীরা এনজিওতে কাজ করছে। রাজনীতিতে নারীরা নেতৃত্ব দিচ্ছে।

বাংলাদেশকে নিয়ে ৫০ বছর আগে কে কি ভাবত, আমরা জানি না কিন্তু শুনেছি যে, বাংলাদেশ একটি তলাবিহীন ঝুড়ি। তখন ৭ কোটি মানুষ ছিল, এখন ১৭ কোটি মানুষ হয়েছে। কিন্তু এত জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরও কাউকে না খেয়ে মারা যেতে শুনিনি। আমরা যেসব এলাকায় আগে কাজ করতাম সেখানে অনেক মঙ্গা ছিল কিন্তু সেগুলো এখন নেই। যেটি হয়েছে তা হলো মানুষের সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে।

প্রত্যয় : সংবিধানে নারী ও পুরুষকে যোগ্যতা অনুযায়ী সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছে। আপনি কি মনে করেন, এ দেশের নারীরা সেই সুবিধা গ্রহণে সক্ষম হচ্ছে? এর পেছনে কি কি কারণ কাজ করছে?

ফারাহ্ কবির : সংবিধানে কোনো বৈষম্য করার সুযোগ নেই। সামাজিকভাবে আমরা দেখছি যে নানা ধরনের সমস্যা। সামাজিক যে প্রথা বা চল সেখানে অনেক ঘাটতি আছে। আমাদের দেশে নারীরা সব কাজ যেমন করছেন তাদের পিছিয়ে রাখার জন্যও নানা ধরনের কুসংস্কার, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। পরিবারে নারীর যে ভূমিকা সেখানে তার যে সহায়তাটা দরকার ছিল সেখানে সবার সহযোগিতা পেলে আরো বেশি অবদান রাখতে পারবে।

প্রতি বছরই আমরা দেখছি যে শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীরা ভালো করছে। প্রাথমিকে নারীর অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হচ্ছে কিন্তু সেকেন্ডারি লেভেলে গিয়ে দেখা যায় যে তারা ঝরে পড়ছে। তার কারণ হলো দরিদ্রতা, নিরাপত্তাহীনতা। নারীর প্রতি সামাজিকভাবে অনেক ধরনের অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া হয়। যতদিন না আমরা সে জায়গাগুলো থেকে বের হয়ে আসবো ততদিনে নারী তার বিকাশ ঘটাতে পারবে না।

প্রত্যয় : সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ছাত্রীরা নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং শুধু পুরুষ ছাত্রদের দ্বারাই নয়, মেয়েরা মেয়েদের দ্বারাও বিভিন্ন নির্যাতন-হেনস্থার শিকার হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আইনগতভাবে বিষয়টিতে জোর দেয়া উচিত কি না?

ফারাহ্ কবির : প্রথমে চিন্তার ধারাটা পরিবর্তন করতে হবে। আগে মানুষ হিসেবে চিন্তা করতে হবে। সে নারী না পুরুষ সেটা পরের কথা। একটা মানুষের চলার অধিকার আছে, চিন্তা করার অধিকার আছে, বেঁচে থাকার অধিকার আছে, নিশ্বাস নেয়ার অধিকার আছে, পড়াশোনা করার অধিকার আছে। সেখানে মেয়ে শিশুর বেলায় এক ধরনের ব্যবস্থা আর ছেলে শিশুর বেলায় অন্য ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে সেটা ঠিক না। আবার ছেলে শিশুদেরকেও যে সবসময় সমান অধিকার দেয়া হয় তা নয়।

আমরা দেখছি যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগ বেড়ে যাচ্ছে, সবাই একটা অনিশ্চিত জায়গায় আছে। এর মধ্যেও যে বাংলাদেশ এত এগিয়ে গেছে এটা কিন্তু একটা বিশাল অর্জন। বাংলাদেশকে নিয়ে ৫০ বছর আগে কে কি ভাবত, আমরা জানি না কিন্তু শুনেছি যে, বাংলাদেশ একটি তলাবিহীন ঝুড়ি। তখন ৭ কোটি মানুষ ছিল, এখন ১৭ কোটি মানুষ হয়েছে। কিন্তু এত জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরও কাউকে না খেয়ে মারা যেতে শুনিনি। আমরা যেসব এলাকায় আগে কাজ করতাম সেখানে অনেক মঙ্গা ছিল কিন্তু সেগুলো এখন নেই। যেটি হয়েছে তা হলো মানুষের সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে। আমি যেটি খাচ্ছি সেটি পুষ্টিকর কি না, আমার ছেলে পড়াশোনা করছে সেটা মানসম্মত শিক্ষা কি না। যখন উন্নতি হয় তখন মানুষের চাওয়া-পাওয়ার মাপকাঠিটাও উঠে যায়। আগে এক বেলা খাওয়া-পরাটাই বড় জিনিস ছিল কিন্তু এখন বিষয় খাবারটা পুষ্টিকর কি না, পানিটা বিশুদ্ধ কি না।

আরেকটি জিনিস হলো আমাদের দেশে একটি বড় সমস্যা সেটি হলো পানির সমস্যা। কেউ যদি বিশুদ্ধ পানি না পায় তা হলে তার অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে। বিশেষ করে পেটের পীড়া। প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে আমি দেখেছি বিশুদ্ধ পানি পাওয়াটা কত কঠিন। যে পানি দিয়ে মানুষ রান্না করছে, গোসল করছে, হাত-মুখ ধুচ্ছে– এগুলো পরিষ্কার না, এখনো দূষিত।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আরেকটি জিনিস দেখেছি যে, তাপমাত্রা বেড়ে গেছে, ঋতুর ঠিক নেই, সময়মতো বৃষ্টি হয় না। শীতের সময় শীত থাকে না। এগুলো কিন্তু ফসলের ওপর একটি বিরূপ প্রভাব ফেলে। তারপরও বাংলাদেশ উৎপাদন করে যাচ্ছে। ফসলের প্রভাবটা আমরা বুঝি। আবার মানুষের শরীরের ওপরও একটা প্রভাব পড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি উষ্ণতা বাড়ে তখন ডিহাইড্রেশন বেশি হয়। তখন কি মানুষ বেশি পরিমাণ পানি খাচ্ছে কি না সেটিও মনিটর করতে হয়। আসলে এতকিছু খেয়াল করা সম্ভব হয় না বা আমরা এতটা সচেতন নই। আবার যেখানে জলাবদ্ধতা আছে সেখানে নানা ধরনের অসুখ হচ্ছে। নারীর রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর সামাজিক জিনিস যে জায়গাটা সেখানে আমি আপনাদের

মাধ্যমে জবাব দেবো– মানুষের মন-মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। কোনো দেশ একটি গোষ্ঠীকে ফেলে রেখে, পিছিয়ে রেখে এগোতে পারবে না। তাই যদি হয়, তা হলে সেই ছোটবেলা থেকেই তাদেরকে নিয়ে কাজ করতে হবে। তাদেরকে মাথায় রেখেই সব ধরনের পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন করতে হবে। বাংলাদেশ ৩০/৫০ বছর আগে কি ভেবেছিল, কি পরিকল্পনা করেছিল সেটি চিন্তা করলে হবে না। বিষয়টিকে আজকের বাস্তবতার বিবেচনা করতে হবে। আরেকটি হলো টেকনোলজি/ডিজিটালাইজেশন এগুলোকেও মাথায় রাখতে হবে এবং সেভাবে পরিকল্পনা করতে হবে। আমাদের যে যুবারা আছে তাদের সংখ্যা অনেক বেশি এখন। আমরা যদি ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট ইয়ুথদের নিয়ে তাদেরকে নিয়েও পরিকল্পনা নিতে হবে।

প্রত্যয় : এক্ষেত্রে সরকারের দায়বদ্ধতা কতোটা?

ফারাহ কবির : সম্পূর্ণ। রাষ্ট্র পরিচালনায় যেহেতু সরকার থাকে এবং নীতি নির্ধারণ করে সেহেতু তারাই পথ দেখাবে, বড় ভূমিকা রাখবে। অর্থনীতির জায়গা থেকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে আসতে হবে।

প্রত্যয় : অ্যাকশন এইড এই বিষয়গুলো নিয়ে কীভাবে কাজ করছে?

ফারাহ কবির : আমাদের সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষ এবং কমিউনিটি। সেই কমিউনিটিতে যারা থাকেন অর্থাৎ নারী-পুরুষ, শিশু, যুব এদের নিয়ে আমাদের কাজ। দুর্যোগের কারণে ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে এসেছিল অ্যাকশন এইড। ভোলাতে যখন সাইক্লোন হলো তখন অ্যাকশন এইডের কাজ শুরু হয়। এবং চরফ্যাশন, মনপুরা, চান্দের চর, চর কুকড়ি-মুকড়ি এখানে গেলে এখনো দেখা যাবে যে অ্যাকশন এইডের তৈরি রাস্তাঘাট, স্কুল আছে। কমিউনিটির সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে স্কুল, সাইক্লোন শেল্টার, রাস্তাঘাট, অবকাঠামো, জীবিকার জায়গাগুলো অর্থাৎ মৎস্যজীবী, কৃষিজীবী তাদের নিয়ে অনেক কাজ আছে। আমরা এখন দেখছি যে এখান থেকে অনেক উত্তরণ হয়েছে। আগে যে ধরনের দারিদ্র্য দেখতাম সেখান থেকে পরিবর্তন এসেছে। তা হলে এখন মানুষ কি চাচ্ছে? তারা শিক্ষা চাচ্ছে, টেকনোলজির প্রশিক্ষণ চাচ্ছে, নারীরা/মেয়েরা তাদের বিকাশের জন্য চিন্তা করার সুযোগটা চাচ্ছে। এসবই কাজই আমরা করছি।

প্রত্যয় : বর্তমানে নারীরা সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। কর্মক্ষেত্রকে নারীবান্ধব রাখার ব্যাপারে আপনার প্রস্তাবনা কি?

ফারাহ কবির : কর্ম পরিবেশকে নারীবান্ধব রাখতে হলে বুঝতে হবে নারীর ভূমিকাটা কি। এই বিষয়টি মাথায় নিয়ে তার কাজ এবং সময় প্রাধান্য দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নারীর সময়টাকে একটু ফ্লেক্সিবল রাখতে হবে। বিভোজাতিক এইডে থাকলে মাতৃত্বকালীন যে ছুটির সুবিধা তার আইনগত অধিকার, সেবার

স' এর একটি অংশ। যদি আমরা সংবিধান পড়ে থাকি, সামাজিক যে প্রতিশ্রুতিগুলো সেগুলো যদি বাস্তবায়ন করি, মানবিক যে জায়গাগুলো এবং দেশ হিসেবে আমাদের যে কমিটমেন্টগুলো আছে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

আমরা স্বপ্ন দেখছি আগামীতে আমরা আরো উন্নত হবো। তা হলে উন্নয়নের মাপকাঠি কি? সূচকগুলো কি? সেই সূচকের সামাজিক সূচকগুলোকে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে, অর্জন করতে হবে। শুধু মুখের বুলি দিয়ে বললে হবে না যে, কাউকে রেখে উন্নয়ন না। আসলেও করতে হবে এবং সবার অংশগ্রহণে করতে হবে। রাষ্ট্রের সাথে, কমিউনিটি, পরিবার, সমাজ সবাইকে মিলে করতে হবে।

আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ বন্ধের আইন আছে কিন্তু সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য বলে সেটা বন্ধ করা যাচ্ছে না এবং বোঝানো হচ্ছে যে এটাই ঠিক, কেননা এছাড়া মেয়েদের নিরাপত্তা নেই। যে বাড়িতে কারো না কারো বাবা, ছেলে, ভাই যারা নিরাপত্তা নষ্ট করছে সেখানে কি কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে পারছি? সুতরাং আমাদের নিজেদেরও দেখতে হবে এবং নিরাপত্তার জায়গাটাকে কঠোর হাতে পরিচালনা করতে হবে।

প্রত্যয় : আপনি তো একটি রাইট নিয়ে কাজ করছেন পিপল অ্যাডভোকেসি করছেন, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আসলে কি সরকারি আইনে এটাকে প্রতিষ্ঠিত করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি সমাজে এটা মানুষকে বুঝিয়ে দেয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ? নাকি দুটোকে সমানভাবে দেখেন?

ফারাহ কবির : একটা ছাড়া আরেকটি হবে না। আইনগুলো এসেছে কিন্তু বাস্তবায়ন হয় না। বাস্তবায়ন না হওয়ার জন্যও কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয় না। সাংস্কৃতিক বা মন-মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য কতটুকু কাজ হচ্ছে? আর জবাবদিহির যে জায়গাটা, আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে প্রশ্রয় দেয়া হয়। যদি প্রশ্রয় না দিয়ে নিয়ম মেনে চলি, আইন মানি, প্রয়োগ করি তা হলে এতোটা হয় না।

প্রত্যয় : আপনার অভিজ্ঞতা থেকে জানতে চাচ্ছি যে, নারী অবস্থানে মুক্ত হয়েছে– এটুকু মুক্ত হতে তো নারীকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে কিন্তু আপনি কি মনে করেন, আগামী ১০ বছরেও এই অবস্থান মুক্ত হতে তাদেরকে একই রকম সংগ্রাম করতে হবে? নাকি এর মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা আসবে বলে মনে করেন?

ফারাহ কবির : স্বাধীনতার পরে যে বাংলাদেশ ছিল এবং আমাদের বাবা-মায়েদের যে সময়টা ছিল তারা আমাদের জন্য অনেক কিছু সহজ করে দিয়েছেন বলে আমরা আন্দোলন করতে পেরেছি, এ পর্যায়ে আসতে পেরেছি।

> নিরাপদ শহরের কনসেপ্টটি হলো– এই শহরে নারী-পুরুষ সবাই থাকে কিন্তু নারী কেন নিরাপদে হাঁটাচলা করতে পারবে না? পরিবার থেকে বলা হয় তুমি একা একা বাহিরে যেও না, তুমি নিরাপদ না, তুমি ঘরে থাকো। এমনকি ঘরের মধ্যেও তো সে নিরাপদ না। আমার কথা হচ্ছে, এই শহরে সবাইকে চলতে হবে এবং সেই পথটা যেন নিরাপদ হয়। যারা অন্যায় করছে, নারীদের উত্ত্যক্ত করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, বিভিন্ন হ্যারাজমেন্টের আইন আছে সেগুলো প্রয়োগ করতে হবে। বাড়ি থেকেই নারী-পুরুষ সবাইকে বলতে হবে যে, এটি তোমার শহর। রাস্তাঘাটে নিশ্চিন্তে চলতে পারবে এবং তোমার সেই কনফিডেন্স থাকতে হবে, মানসিকভাবে শক্ত হতে হবে তা হলে তুমি প্রতিরোধ করতে পারবে। এটা তো হলো ব্যক্তি পর্যায় থেকে কিন্তু রাষ্ট্রের একটা ভূমিকা আছে, সরকারের একটা ভূমিকা আছে। যে আইনগুলো আছে সেগুলো প্রয়োগ করতে হবে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আরো সোচ্চার হতে হবে। আবার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রয়োজনীয় লোকবল আছে কি না সেটি দেখতে হবে, নীতিনির্ধারকদের কি সেখানে বিনিয়োগ আছে? আমরা ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা বাস চাই না। আমরা চাই কোথাও কোনো অন্যায় হলে তার প্রতিকার। সবাইকে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

কিন্তু পৃথিবীর বাস্তবতা হলো, পৃথিবীর মান-মানসিকতা এখন পেছন দিকে যাচ্ছে। এখন অনেক বেশি রক্ষণশীল হচ্ছে। একদিকে যেমন উন্নয়ন হচ্ছে আবার অন্যদিকে রক্ষণশীল যে শক্তিটা তারা কিন্তু মাথাচাড়া দিচ্ছে। এই শক্তি যখন মাথাচাড়া দেয় তখন তারা জাতীয়তাবাদী থাকার ধারণ করে এবং একজন থেকে আরেকজন মৌলবাদিজম তৈরি হয় এবং সেখান থেকে ফ্যাসিজম আসে। আমেরিকাতে বলছে ধনি Black lives matter. এতদিন ধরে কিন্তু ব্ল্যাকদের ওপর অন্যায় হয়ে এসেছে, কিন্তু সেগুলোকে এখন আর গ্রহণ করতে রাজি না। ইউকে-তে এখন বলছে Decolonise কর। এতদিন তারা একটা কলোনি বানিয়ে রেখেছে ২শ' বছর ধরে শাসন করেছে এখন সে দেশের লোকজনকে মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা যার ওপর দাঁড়িয়ে আছ সেটা কোনো না কোনো জায়গা থেকে শোষণ করে, চুরি করে এনে কর। একসময় আমাদের দেশে অনেক উন্নয়ন ছিল, অনেক কিছু শেখার ছিল, কিন্তু তখন ব্রিটিশরা আসার পর সেগুলোর প্রতিরোধ হয়েছে।

আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলবো যে, নতুন নতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছে। নারীদের নতুন করে অনেক কিছু মোকাবিলা করতে হচ্ছে। কিছু জিনিস নতুন করে অর্জন হয়েছিল সেগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা পৃথিবীজুড়ে একটা পর্যায়ে চলে গিয়েছিল, কিন্তু এখন সেখান থেকে অনেক পেছনে চলে এসেছে। কিন্তু বেঁধে রাখার কোনো সুযোগ নেই এবং এ জন্যই শিক্ষাটা দরকার। মানসম্মত শিক্ষা দরকার, টেকনোলজির সাথে জুড়ে দেয়া দরকার। মেয়েদেরকে অনেক বেশি সায়েন্স এডুকেশনে আনতে হবে। এখন সবাই স্যোশাল প্ল্যাটফর্মে আছে। সবাই টেকনোলজি ইউজ করে। তাকে সেভাবে সচেতন করতে হবে। এই প্ল্যাটফর্মে কি হচ্ছে নারীকে সেটা বুঝতে হবে এবং সেই মোতাবেক পদক্ষেপ নিতে হবে। নারীদের অর্জন তো আছেই এছাড়া নতুন যে সমস্যাগুলো আসবে সেগুলো তাকে মোকাবিলা করতে হবে।

প্রত্যয় : অফিস-আদালতের বাইরে রাস্তাঘাটে বিশেষ করে গণপরিবহনে নারীরা অশ্লীল আচরণের শিকার হয়ে থাকে। এটি বন্ধে বা প্রতিরোধে কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া যায় বলে আপনি মনে করেন?

ফারাহ্ কবির : আপনারা জানেন কি না আমি জানি না যে, ২০১৪ সাল থেকে অ্যাকশন এইড 'সেইফ সিটিজ ক্যাম্পেইন' করছে- নিরাপদ শহর, নিরাপদ পথের জন্য। সেখানে আমরা সরকারের সাথে লেনদরবার করে অ্যাডভোকেসি, প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন-বিতরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। সেটি এখনো চলছে। সেখানে আমরা বলেছিলাম যে বাসের ড্রাইভার থেকে শুরু করে কন্ডাক্টর-হেলপারদের সচেতন করতে হবে, পুলিশ স্টেশনে সচেতন করতে হবে। নানাভাবে এই কাজগুলো সামনে এগিয়ে নিতে হবে এবং এগুলো এখনো শেষ হয়নি। নিরাপদ শহরের কনসেপ্টটি হলো- এই শহরে নারী-পুরুষ সবাই থাকে কিন্তু নারী কেন নিরাপদে হাঁটাচলা করতে পারবে না? পরিবার থেকে বলা হয় তুমি একা একা বাইরে যেও না, তুমি নিরাপদ না, তুমি ঘরে থাকো। এমনকি ঘরের মধ্যেও তো সে নিরাপদ না। আমার কথা হচ্ছে, এই শহরে সবাইকে চলতে হবে এবং সেই পথটা যেন নিরাপদ হয়। যারা অন্যায় করছে, নারীদের উত্ত্যক্ত করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, বিভিন্ন হ্যারাজমেন্টের আইন আছে সেগুলো প্রয়োগ করতে হবে।

বাড়ি থেকেই নারী-পুরুষ সবাইকে বলতে হবে যে, এটি তোমার শহর। রাস্তাঘাটে নিশ্চিন্তে চলতে পারবে এবং তোমার সেই কনফিডেন্স থাকতে হবে, মানসিকভাবে শক্ত হতে হবে তা হলে তুমি প্রতিরোধ করতে পারবে। এটা তো হলো ব্যক্তি পর্যায় থেকে কিন্তু রাষ্ট্রের একটা ভূমিকা আছে, সরকারের একটা ভূমিকা আছে। যে আইনগুলো আছে সেগুলো প্রয়োগ করতে হবে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আরো সোচ্চার হতে হবে। আবার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রয়োজনীয় লোকবল আছে কি না সেটি দেখতে হবে, নীতিনির্ধারকদের কি সেখানে বিনিয়োগ আছে? আমরা ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা বাস চাই না। আমরা চাই কোথাও কোনো অন্যায় হলে তার প্রতিকার। সবাইকে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

প্রত্যয় : এ ক্ষেত্রে বেসরকারি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো কি এ ব্যাপারে কাজ করছে?

ফারাহ্ কবির : কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান করছে। তবে সব প্রতিষ্ঠানেই এ ব্যবস্থা নেয়া উচিত। আমার জানা মতে, এনজিও খাতের সব প্রতিষ্ঠানেই এ ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রত্যয় : এখনো দেশের নারী সমাজের ক্ষমতায়ন সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি। কি কি উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন?

ফারাহ্ কবির : যে কথাগুলো বললাম, যে সামাজিকভাবে আমাদের আরো বেশি ব্যবস্থা নিতে হবে। সামাজিক পরিবর্তনের জন্য, সচেতনতার জন্য, মন-মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য। সুযোগ আছে, কোথাও কোনো চাকরিতে বলা নেই যে শুধু পুরুষ নেয়া হবে বা রাস্তা শুধু পুরুষের। তা হলে এগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। ■

অগ্রযাত্রায় নারী

বাঙালি মুসলমান নারীদের শিক্ষা-দীক্ষার উন্নয়নের জন্য বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ ছিলেন অন্যতম পুরোধা নারী। তিনি কল্লোল যুগের শুরুতে নারীদের শিক্ষা ও মনন উন্নয়নে গড়ে তুলেছিলেন সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়। সমাজের চাপিয়ে দেওয়া পরিচয় 'অবলা নারী'দের শিক্ষার উন্নয়নে তিনি যে উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিলেন সেটি সর্বজনস্বীকৃত। নারীর অগ্রযাত্রার সেই শুরু আজ দারুণ এক পরিপক্বতায় এসে পৌঁছেছে। নারীর অগ্রযাত্রায় এখনো বাধা আছে, সংকট আছে কিন্তু 'অবলা নারী' অভিধাটি আজ বাংলাদেশ কেন, পৃথিবীর কোনো দেশের নারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়।

এ দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অকল্পনীয় উন্নয়ন ঘটেছে। তৃণমূল থেকে উচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী সমাজের উন্নয়ন একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য মাইলফলকই বলা যায়। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আপসহীন নির্ভীক-নির্দেশনায় শুরু হয়েছিলো মহান মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধে ছাত্রসমাজ, কৃষক, শ্রমিক, জেলে-কামার-কুমারসহ সকলের অংশগ্রহণ ছিলো। এই যুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণও ছিলো সক্রিয়, সহযোগী ও অতুল্য। আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে ও মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজের সেই অতুল্য অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই আমার এই অঙ্কন। অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক বাঙালি নারীর।

■ অঙ্কন ও লেখা
আবু মাসুম বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কবি

রুমানা আক্তার

অতিরিক্ত ডিআইজি, সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ

প্রতিযোগিতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই নারী কর্মকর্তারা দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করছে

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে যেসব নারী ব্যক্তিত্ব সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে নারী সমাজের মুখ উজ্জ্বল করছেন তাদেরই একজন অতিরিক্ত ডিআইজি রুমানা আক্তার। চৌকস এবং স্মার্ট পুলিশ কর্মকর্তা রুমানা আক্তারের জন্ম ১৯৭৫ সালের ৩০ নভেম্বর মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামে। পিতার নাম মো. তৈয়ব উদ্দিন এবং মা রোকেয়া বেগম। তিনি ১৯৯০ সালে টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে এসএসসি, কুমুদিনী সরকারি মহিলা কলেজ থেকে ১৯৯২ সালে প্রথম বিভাগে এইচএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী বিদ্যা বিভাগ থেকে ১৯৯৫ সালে দ্বিতীয় শ্রেণিতে বিএসসি অনার্স এবং ১৯৯৬ সালে প্রথম শ্রেণিতে এমএসসি পাস করেন।

অধ্যয়ন শেষে তিনি বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ২০তম ব্যাচে ২০০১ সালের ৩০ জুলাই সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করেন। ২০২২ সালের ২ আগস্ট তিনি অতিরিক্ত ডিআইজি হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি সিআইডির অ্যাডিশনাল ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

চাকরি জীবনে তিনি ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ মিশনে UNAMID এ অ্যাডমিন অফিসার/ট্রেইনিং অফিসার হিসেবে কাজ করেন। তিনি Louisiana State Police Academy, USA, Royal Malaysia Police College, Malaysia, South Korea, India এবং Srilanka সহ দেশে-বিদেশে অসংখ্য প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। পেশায় প্রশংসনীয় কাজ ও সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০০৬ সালে আইজিপির এক্সেপ্শনালী গুড সার্ভিস ব্যাজ (ক্যাটাগরি-এ প্রাপ্তি), ২০১৮ সালে প্রেসিডেন্ট পুলিশ মেডেল ও বাংলাদেশ পুলিশ ওম্যান অ্যাওয়ার্ড লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড এবং ২০২০ সালে অগ্রণী মিডিয়াতীষণ হতে সংগ্রামী সফল নারী সংবর্ধনা লাভ করেন। রুমানা আক্তারের স্বামী মো. বরকতুল্লাহ খান হাইওয়ে পুলিশের অ্যাডিশনাল ডিআইজি। দুই সন্তান জোহানা মায়িরাম খান ও রিজভান জাবীর খান অধ্যয়নরত। দেশের পুলিশ বাহিনীর এই কৃতি কর্মকর্তার প্রত্যয়কে নেয়া সাক্ষাৎকারের উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে উপস্থাপন করা হলো।

প্রত্যয় : দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিসিএস কর্মকর্তা হিসেবে আপনি বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উচ্চপদে কর্মরত। স্বাধীনতার ৫২ বছরে দেশের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। এই উন্নয়নে নারী সমাজ কতোটা ভূমিকা পালন করে চলেছে বলে আপনি মনে করেন?

রুমানা আক্তার : আমি ২০০১ সালে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্য হবার গৌরব অর্জন করি। সে দিক থেকে এখানে আমার পেশাজীবনের বয়স ২০ বছরের বেশি। আমি বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সহকারী পুলিশ সুপার অর্থাৎ এএসপি হিসেবে যোগদান করি। আমরা যখন চাকরিতে যোগদান করি সে সময়ের চেয়ে বর্তমানে দেশ ও নারীর ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। স্বাধীনতার ৫২ বছরের ঘটিও পুরোটা দেখার সুযোগ আমি পাইনি, তবে আমার দেখা ২০ বছরে কর্মক্ষেত্রে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। নারীরা মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে নীতিনির্ধারণী ভূমিকা রাখছে। নারীরা পুলিশ বাহিনী, সেনাবাহিনীসহ প্রতিরক্ষা সার্ভিসসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বশীল পদে কাজ করছেন। আমাদের পুলিশ সার্ভিসে দুজন নারী অতিরিক্ত আইজিপি হিসেবে কাজ করেছেন। এখনো ৪ জন নারী ডিআইজি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন।

দেশের সার্বিক উন্নয়নে আগের তুলনায় নারীদের অবদান এখন অনেক। গার্মেন্টস সেক্টর দেশের অর্থনীতির একটি বড় খাত। এ খাতে প্রায় ৮০% নারী। রেমিটেন্স আয়েও নারীর অবদান অনেক। অনেক নারী বিদেশে চাকরি কিংবা ব্যবসা করছে। ছোট-বড় অসংখ্য উদ্যোক্তা এই নারীরাই। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা থেকে বড় উদ্যোক্তা হিসেবেও অনেকে উঠে এসেছে। এমন কোনো খাত নেই যেখানে নারীরা নেই। আমি মনে করি, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ এবং ভূমিকা এখন অনেক। একসময় ঘরের বাইরে প্রাতিষ্ঠানিক কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ কম ছিল, এখন বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রত্যয় : এ কথা বেশ জোরেশোরে বিশেষ করে নারী সমাজের মধ্যে যারা অগ্রসরমান তারা বলে থাকেন– এ সমাজ ব্যবস্থা পুরুষতান্ত্রিক। এমন একটি সমাজ ব্যবস্থায় নারী হয়েও এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করতে গিয়ে আপনার অনুভূতি কি?

রুমানা আক্তার : একসময় বলা হতো, কেবল নারী গৃহকর্মে নিয়োজিত হাউস ওয়াইফ– তারা তেমন অবদান রাখছে না, কিন্তু এখন যখন ঘরে-বাইরে উভয় ক্ষেত্রে নারী কাজ করছে, তখন নারীর গৃহকর্মের কাজটিও সবার চোখে পড়ছে। সমাজ এখন গৃহকর্মে সম্পৃক্ত নারীর কাজকেও মূল্যায়ন করছে। এটাও এখন অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিচার করার সময় এসেছে। একসময় নারীরা টিচার ছিল, ডাক্তার-নার্স ছিল, এখনো এই পেশায় তারা আছে। অতীতে সাধারণত জটিল অপারেশন নারী চিকিৎসকরা করতেন না কিন্তু এখন তারা তা করেন। টিচিং প্রফেশনেও নারীরা এখন শুধু পড়ান না, গবেষণার কাজ করছেন, বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন, দেশের বাইরেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ দেশের নারীরা অধ্যাপনা করছেন। আমাদের সংসদে নারী, উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ছে। সংরক্ষিত আসনের বাইরে সরাসরি নির্বাচনেও নারীরা বিজয়ী হচ্ছেন। কর্ম প্রয়াসের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটছে। প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানী হিসেবেও নারীরা কাজ করছেন।

প্রত্যয় : অনেকেরই মূল্যায়ন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে মাঠ পর্যায়ে কাজ করা যথেষ্ট কঠিন– সেক্ষেত্রে নারীদের কীভাবে মূল্যায়ন করা হয়?

রুমানা আক্তার : ১৯৭৪ সালে যখন প্রথম নারীদের পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হয় তখন তাদের শুধু নারীকেন্দ্রিক কিছু কাজে দায়িত্ব দেয়া হতো। সেই অবস্থান ভেঙে একজন নারী পুলিশ কর্মকর্তা এখন জেলা পুলিশ সুপার এবং বিভিন্ন থানায় কঠিন কঠিন দায়িত্ব পালন করছে। সিআইডি, টিবিতে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত। মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে অপারেশনাল ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে, কোথাও মারামারি হচ্ছে সেখানে নারী পুলিশরাও সাফল্যের সাথে কাজ করছে। বিভিন্ন দুর্ধর্ষ অপারেশনেও নারী পুলিশদের ভূমিকা থাকে সমুজ্জ্বল। নারীরা এখন সিআইডি, সাইবার পুলিশ প্রত্যেক জায়গায় কাজ করছে। অর্থাৎ এই প্রফেশনে কোনো নারীই নিজেকে নারী হিসেবে ভাবে না– নিজেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হিসেবে ভেবেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, দেখেও নারীরা ভালো পারফরমেন্স দেখাতে সক্ষম হচ্ছে। আমাদের একজন নারী কর্মকর্তা বান্দরবানের এসপি হিসেবে দুর্গম অঞ্চলে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গোপালগঞ্জের নারী এসপি তিন বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছেন। আমি মনে করি পুরুষ কর্মকর্তার চেয়েও তারা ভালো করছেন। শুধু পুলিশ বিভাগেই নয়, প্রত্যেক সেক্টরে বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে নারীরা সফলভাবে কাজ করছেন। তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের অধিকারগুলোকে যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

প্রত্যয় : নারীর ক্ষমতায়ন নারী সমাজকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নারীর ক্ষমতায়ন প্রশ্নে কি কি উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন।

রুমানা আক্তার : আমি আগেই বলেছি স্বাধীনতার ৫২ বছরে নারীদের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে এবং দীর্ঘসময় ধরে আমাদের যিনি সরকারপ্রধান তিনি নারী হওয়াতে নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, নারীর উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এগুলো যতোটা না পুরুষ হলে পাওয়া যেতো তার চেয়ে আমরা বেশি পেয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কল্যাণে আমরা মনে করি নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে অনেক অনেক বাধা অতিক্রম করতে পেরেছি। তারপরেও যেখানে যেখানে দুর্বলতা রয়েছে সে সব জায়গায় নারী ও পুরুষ যারা নীতিনির্ধারণীতে আছেন তাদের সব উদ্যোগে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রত্যয় : অফিসিয়ালি তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের অবস্থান আগের তুলনায় বেশি। কেবল জায়গায় তাদের উন্নয়নে কি ধরনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন?

রুমানা আক্তার : সেক্ষেত্রে আমি বলবো, আমাদের পুলিশ বিভাগে সেটওয়ার্কিং আছে, তৃণমূল পর্যায়ে তাদের কোনো দুর্বলতা থাকলে তা সংশোধন করে নেই, কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকলে তা পূরণের চেষ্টা করি, পদায়নের ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করি যদি যথার্থ হয়, যোগ্যতা থাকে তা হলে পদোন্নতি নিতে অর্থাৎ তার রাইটকে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেই। আইনশৃঙ্খলা মেইনটেইন করা, পোশাকের বিষয়ে তাদের বলা যে একজন পুলিশ হিসেবে তার কেমন পোশাক পরা উচিত–তারও যদি কোনো দুর্বলতা থাকে তাকে সংশোধন করে দেয়া হয় যে, একজন পুলিশ কনস্টেবল বা এসআই হিসেবে তোমার এটা করা উচিত বা এটা করা ঠিক নয়। এছাড়া

যেখানে নারী শিশু ডেস্ক আছে সেখানে নারী এসআই বা কনস্টেবলকে দায়িত্ব দেয়ার কথা বলা হয়। এরপর জেলাগুলোতে নারী এসপির সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারেও আমরা উর্ধ্বতনদের জানাই। আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে যেমন সিনিয়র কর্মকর্তাদের কাছে এ ধরনের প্রস্তাবনা রাখি। আমার মনে হয় প্রতিটি সার্ভিসেই এরকম উদ্যোগ নেয়া উচিত। আমি তো দেখছি সব বিভাগেই তৃণমূল পর্যায়ে নারী কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। আবার লক্ষ্য করলে দেখবেন, জেলা-উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী জনপ্রতিনিধি রয়েছে। এদিক থেকে বলা যায়, নারীরা এখন সর্বত্র কাজ করছে। তাদের নিজেদেরকেও সচেতন হতে হবে।

প্রশ্নঃ একটু আগে আপনি বলছিলেন জেলা ও থানা পর্যায়ে নারী কর্মকর্তাদের পদায়নের কথা। এটি কি যোগ্যতার ভিত্তিতে চাইছেন না আপনারা নারী বলে নারীদের এই পদায়নের প্রস্তাবনা?

রুমানা আক্তার : দেখুন, রীতিমতো প্রতিযোগিতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই নারী কর্মকর্তারা কাজ করার সুযোগ লাভ করেছে। সেক্ষেত্রে আমরা নারী হিসেবে নয়, যোগ্যদেরকেই জেলার এসপি অথবা থানার ওসি হিসেবে পদায়নের দাবি করে থাকি। কারণ, আমরা মনে করি নারীরাও মাঠপর্যায়ের সাথে মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে সক্ষম এবং এটা প্রমাণিত। বর্তমানে নারী ওসি নেই, তবে প্রক্রিয়াধীন আছে। একসময় বিভিন্ন জেলায় ৬ জন এসপি ছিল, এখন সুজন রয়েছে। তাদের প্রমোশন হওয়ায় অন্যত্র দায়িত্ব পেয়েছেন। আবার নতুন করে দেয়া হবে।

প্রশ্নঃ বর্তমান বাংলাদেশে এখনো অনেক নারী সহিংসতা ও নানা রকম অন্যায়ের শিকার। অনেকেই মনে করেন, নারী সুরক্ষার জন্য নারীবান্ধব আইন থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা কার্যকর নয়। এই দায়িত্বশীল অবস্থান থেকে এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

রুমানা আক্তার : বাংলাদেশে সব বিষয়েই যথেষ্ট কার্যকর আইন রয়েছে। নারীদের জন্যও রয়েছে। আইনের প্রয়োগও আছে। তারপরও এটা ঠিক যে, এ সমাজ পুরুষতান্ত্রিক বিধায় নারীরাই বেশি সহিংসতা ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হয়। এর মূল কারণ, এটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, শতভাগ সমঅধিকার সব জায়গায় হয়নি। আর একটি বিষয়, পুরুষদের চিন্তাভাবনারও তেমন উন্নয়ন ঘটেনি অর্থাৎ পজিটিভ চিন্তাভাবনার অভাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আরো ডেভেলপমেন্টের দরকার আছে। নারী সহিংসতার জন্য নারীরাও কিছুটা দায়ী। কারণ তারা নিজেরাই তাদের নিজেদের নিরাপত্তাবিষয়ক আইন সম্পর্কে সচেতন নয়, তাদের জানতে হবে কোন জায়গায় কীভাবে ভিক্টিমাইজ হলে কোন আইনের সহায়তা পাওয়া যাবে, কার সাহায্য পাওয়া যাবে, কাকে জানাতে হবে। আমি জানি, দেশের অনেক এনজিও নারীর সুরক্ষার প্রশ্নে 'আইনি সেল' রেখেছে– তারা আইনগত সহায়তা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ পুলিশেরও ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টার আছে যেখানে আইনি ও চিকিৎসা সহায়তা দেয়া হয়, মানসিক মনোবল বৃদ্ধির জন্য কাউন্সেলিং করা হয়। সুতরাং নারীদের বিষয়গুলো জানতে হবে যে ভিক্টিমাইজ হলে তার কি করতে হবে আর যাতে ভিক্টিমাইজ না হই তাও জানতে হবে।

প্রশ্নঃ বর্তমানে অনেকেই সাইবার ভিক্টিমাইজ হচ্ছে। আমি যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করছি সেক্ষেত্রে আমারও কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সেগুলো আমি কিন্তু করছি না। পরে আমি ভিক্টিমাইজ হচ্ছি এবং তা সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে যাচ্ছে, আপসোড হচ্ছে– বিব্রতকর এবং মারাত্মক হয়রানির মধ্যে পড়তে হচ্ছে। আমি যখন ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করব তার ভালোমন্দ সম্পর্কেও আমাকে জানতে হবে। আবার ভিক্টিমাইজ হলে এর প্রতিকারের জায়গায় যেতে হবে। সাধারণত পরিবার থেকে অনেক কিছুই শেখার আছে। এখন পরিবার থেকে যদি সেগুলো না শেখানো হয় যেমন নারী ও বৃদ্ধদের সম্মান করা, শিশুদের প্রতি মায়া-মমতা দেখানো ইত্যাদি শিক্ষা না পেলে সমাজের সহিংসতা কমবে না। এর পেছনেও নারীর ভূমিকা রয়েছে। কারণ, নারীরাই পরিবার সামলায়। একটি পরিবারে ছেলেকে আলাদা যত্ন নেবো, মেয়েটার প্রতি উদাসীন থাকবো তা করা যাবে না। বর্তমানে অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন হয়েছে, আরো প্রয়োজন।

প্রশ্নঃ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সামাজিক প্রেক্ষাপটে শুধু লজ্জার কারণে নারীরা যথাযথ আইনের শাসন কিংবা বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। সেক্ষেত্রে কি ধরনের জনসচেতনতা তৈরি করা দরকার বলে আপনি মনে করেন?

রুমানা আক্তার : আমি গত পাঁচ বছর ধরে ফরেনসিক বিভাগের দায়িত্বে

রয়েছি। এমন অভিজ্ঞতা অনেক যে, একটি মেয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছে কিন্তু সঠিক সময়ে থানায় অভিযোগ দায়ের না করায় এবং সময়সীমার মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ না দেয়ার ফলে ঘটনা সত্য হলেও আলামত না থাকায় অপরাধীর সংঘটিত অপরাধ প্রমাণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। পরে জানা যায় যে, পরিবারের লোকজনই লোকলজ্জার ভয়ে ঘটনাটি প্রথমে চাপা দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। তারা চেয়েছে সমাজ যাতে না জানতে পারে, তাদের মতে এটি পারিবারিকভাবে লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তারা এটি বুঝতে চাননি যে, ধর্ষণের শিকার মেয়েটির এতে কোনো দোষ নেই। দোষ নেই অপরাধীর যে এটি ঘটিয়েছে। বরং পরিবারের উচিত মেয়েটির পাশে দাঁড়ানো এবং অপরাধীর বিরুদ্ধে শক্ত আইনগত ব্যবস্থার উদ্যোগ নেয়া।

এখন অবশ্য এর কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। মেয়েরা সাহসী হচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকার, বিভিন্ন এনজিও, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক নারীদের সচেতনতা সৃষ্টি ও অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে নানাবিধ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তারপরও এখনো অনেক নারী এ ব্যাপারে সাধারণত মুখ খুলতে চান না। কোন মেয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়লে তখন ঘটনা জানাজানি হয় এবং পরবর্তীতে হয়েছে। স্বামী ও পরিবার তার মতামতকে প্রাধান্য দিচ্ছে। এই যে সামাজিক পরিবর্তন এবং প্রান্তিক পর্যায়ের নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে এর পেছনে বেসরকারি উন্নয়ন খাতের ভূমিকাকে আমি ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখি।

প্রত্যয়: আপনি যখন বিসিএস কর্মকর্তা হিসেবে পুলিশ বিভাগে যোগদানের উদ্যোগ নিলেন, তখন আপনার পরিবারের কেউ কি এ নিয়ে নিরুৎসাহিত হবার মতো কথা বলেছিল?

রুমানা আক্তার: প্রায় ২০/২১ বছর আগের কথা। আমরা পুলিশে নারী কর্মকর্তা হিসেবে বিসিএস এর দ্বিতীয় ব্যাচ। আমাদের আগে ১৯৯৯ সালে ১৮তম বিসিএস ব্যাচে ছিল ৮ জন, আমরা ২০০১ সালের ২০তম ব্যাচে ১১ জন নারী সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে নিয়োগ লাভ করি। এর আগে ১৯৮৬ সালে ১ জন এবং ১৯৮৮ সালে ৪ জন কর্মকর্তা নিয়োগ পেয়েছিলেন। মাঝখানে বড় গ্যাপ ছিল। বিসিএসের মাধ্যমে নারীদের পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে নেয়া হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই তখনো মনমানসিকতার দিক থেকে পরিবার বা সমাজ অতোটা উদার ছিল না। বলা হতো, অন্য সার্ভিসে যোগ দাও। আমি পরীক্ষার ফরমে পুলিশ কোটায় টিক চিহ্ন দিয়েছিলাম। সিলেকশন হবার পর বাবা বললেন কেন তুমি পুলিশে

স্বাধীনতার এই ৫২ বছরে দেশ অনেক এগিয়েছে এবং এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো অর্থাৎ এনজিওরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। একসময় মানুষ ঠিকমতো দুবেলা দুমুঠো ভাত খেতে পারতো না, পরনের পোশাক থাকতো শতছিন্ন, মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল নড়বড়ে ছনের ঘর। কিন্তু এখন এর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এনজিওরা ঋণ দিচ্ছে। যেসব নারীর তেমন কোন কাজ ছিল না তারা এখন এসব সংস্থার সদস্য হিসেবে ঋণ নিয়ে উদ্যোক্তা হচ্ছে।

ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে অপরাধীকে শনাক্তের প্রক্রিয়া করাতে হয়। লজ্জার কারণে অনেক ক্ষেত্রে মূল অপরাধী আড়ালে থেকে যায়। এ জন্য অধিকহারে জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে।

প্রত্যয়: দেশের বেসরকারি উন্নয়ন খাত প্রান্তিক নারীদের ক্ষমতায়ন করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বিষয়টিকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

রুমানা আক্তার: একথা বাস্তব সত্য যে, স্বাধীনতার ফলে দেশ অনেক এগিয়েছে এবং এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো অর্থাৎ এনজিওরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। একসময় মানুষ ঠিকমতো দুবেলা দুমুঠো ভাত খেতে পারতো না, পরনের পোশাক থাকতো শতছিন্ন, মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল নড়বড়ে ছনের ঘর। কিন্তু এখন এর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এনজিওরা ঋণ দিচ্ছে। যেসব নারীর তেমন কোনো কাজ ছিল না তারা এখন এসব সংস্থার সদস্য হিসেবে ঋণ নিয়ে উদ্যোক্তা হচ্ছে। সচেতন হচ্ছে, সন্তানদের পড়াশোনা করাচ্ছে। মেয়ের বাল্যবিবাহ না করছে। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ায় তার ক্ষমতায়ন চয়েস দিলা। কেন তুমি টিচিং প্রফেশন চয়েজ করলা না। অবশ্য ২১তম বিসিএসএ টিচিং প্রফেশনের সুযোগ পেয়েছিলাম, কিন্তু যাইনি। আমি যখন সারদাতে ট্রেনিং নিচ্ছিলাম তখন আমার পরিবার চাইছিলো যে যেহেতু টিচিং প্রফেশনে হয়েছে আমি যেন সেখানে যোগদান করি। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে আমি আমার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারব।

তাছাড়া এই প্রফেশনে নারী হিসেবে একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয়ও কাজ করেছে যে এটি ভিন্ন ধরনের একটা সুশৃঙ্খল জীবনাচারের মধ্যে থাকা। অন্যান্য নারী সহকর্মীদের সাথে প্যারেড করছি, মাঠে দৌড়াচ্ছি এবং এই পোশাককে খুবই আপন মনে হচ্ছিল। কিন্তু তখনো যাইনি কিন্তু ট্রেনিং পিরিয়ডেই বুঝতে পারছিলাম এই ক্যাডারের আলাদা একটা সম্মান রয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে পরিবারের সদস্যরাও উপলব্ধি করেছে যে, আমি ভুল করিনি– এটি একটি প্রেস্টিজিয়াস জব। আমার কাছে মনে হয় সবদিক থেকে ভালো আছি। মানুষের বিশেষ করে এখানে থেকে অসহায় মানুষ এবং নারীদের উপকার করারও সুযোগ পাচ্ছি।■

ড. রহিমা খাতুন

জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর

সমাজ এখন পুরুষতান্ত্রিক নয় জেন্ডার ব্যালেন্সড

ড. রহিমা খাতুন। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর। ২২তম বিসিএস ক্যাডারের মেধাবী, আত্মপ্রত্যয়ী এবং মানবকল্যাণের প্রতি একনিষ্ঠ এই কর্মকর্তার জন্ম গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলাধীন তরগাঁও গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। ছাত্রী হিসেবে তিনি ছিলেন বেশ মেধাবী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনকারী রহিমা খাতুন পিএইচডি করেছেন জাপানের একটি উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি বিসিএস প্রশাসনের কর্মকর্তা হিসেবে শুরুতে মাঠ পর্যায়ে সহকারী কমিশনার পদে দায়িত্ব পালন করেন। পরে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপ-পরিচালক, বিসিএস প্রশাসন এবং বর্তমানে মাদারীপুর জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি একজন জনবান্ধব কর্মকর্তা। আমরা গত ১৫ মার্চ ২০২৩ যখন জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে উপস্থিত হই তখন লক্ষ্য করি অসংখ্য নারী-পুরুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে তাঁর কাছে এসেছেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে কথা বলছেন এবং তাদের সমস্যা সমাধানের দিক-নির্দেশনা মৌখিক অথবা লিখিতভাবে দিচ্ছেন। বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত গ্রামীণ স্বল্প শিক্ষিত মহিলাদের এ পর্যায়ে এসে জেলা প্রশাসকের সাথে দেখা করার বিষয়টিকে তিনি বললেন, নারীরা যে এগিয়েছে এবং নারীর যে ক্ষমতায়ন হয়েছে এটিও তার বাস্তব চিত্র।

গ্রামীণ এই নারীরা কখনো জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তার কাছে আসবে– আগে তা ভাবাই যেতো না। তিনি এটিকে বর্তমান সরকারের কর্মপ্রয়াস এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কৃতিত্ব বলে মনে করেন। তিনি বলেন, সরকার এবং বেসরকারি উন্নয়ন খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সচেতনতা সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা রাখছে। প্রশ্নের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে জনবান্ধব জেলা প্রশাসক ড. রহিমা খাতুন যা বলেন, তা এখানে উপস্থাপন করা হলো ঃ

প্রশ্ন : দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। এই নারী সমাজ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কতোটা ভূমিকা পালন করে চলেছে?

ড. রহিমা খাতুন : আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলবো যে, সার্বিক বিবেচনা ও মূল্যায়নে বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়েছে যার পেছনে নারী সমাজের রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা। এ দেশের মেয়েরা আবহমানকাল থেকেই পরিশ্রমী। সমাজ যখন কৃষিজীবী ছিল তখন কৃষির সাথেও সম্পৃক্ত ছিল নারীরা। এখনও গ্রামীণ নারীরা কৃষিকাজের পাশাপাশি গৃহকাজেও অত্যন্ত যত্নশীল। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে- বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং সর্বত্রই ভালো করছে। কর্মক্ষেত্রে যারা আসছেন যেকোনো পেশায় দেখবেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা পুরুষের চেয়েও ভালো করছেন। কারণ নারীদের অনেক সংগ্রাম পেরিয়ে আসতে হয়। তাদেরকে সন্তান লালন-পালন, শ্বশুরবাড়ি, বাবার বাড়ির সম্পর্ক রক্ষা, গৃহ সামাল দেয়া প্রায় প্রতিটি বিষয়ই দেখতে হয়। আমি বলছি না, ছেলেরা দেখে না, তবে নারীদেরকেই অধিক ভূমিকা রাখতে হয়। মানুষের একটি বিষয় যে সে যতো বেশি কাজ করবে, উন্নয়ন চিন্তা করবে, পরিশ্রম করবে, সে ততো বেশি ডায়নামিক হবে, ততো বেশি কাজ করতে পারবে। জন্মগতভাবেই মেয়েরা সৃজনশীল এবং অত্যন্ত নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে কাজ করে।

আমরা বলছি বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে শুধু অর্থনৈতিকভাবে না, সব ক্ষেত্রেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো- সবদিক থেকেই আমরা এখন বেশ এগিয়েছি এবং সব ক্ষেত্রেই রয়েছে নারী সমাজের ভূমিকা। আপনি যদি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কথাই বলেন, তাকেও কিন্তু আমাদের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা সাহস জুগিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন- একজন নারী হিসেবে এ দেশের রাজনীতি ও স্বাধীনতার বঙ্গমাতার অবদানও অনেক। অর্থাৎ নারীরা ঘরে-বাইরে পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বত্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

আমি আমার কর্ম এলাকা মাদারীপুরের কথাই বলি। এখানে প্রচুর পাট চাষ হয়। পাট পচানোর পর সেই পাট রাস্তার দু'ধারে জড়ো করা হয়। তখন দেখা যায় অসংখ্য নারী বসে বসে সেই পাটের আঁশ ছাড়িয়ে বাজার উপযোগী করছে। এই যে রুট লেভেলের মেয়েরা ঘরে বসে না থেকে অর্থনৈতিক একটা কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে এভাবে যদি চিন্তা করি তা হলে দেখবো সারা দেশের চিত্রই এটি। অর্থাৎ নারীরা দেশের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে আসছে। তারা একদিকে হাউস ম্যানেজার হিসেবে সন্তান পালন, রান্নাবান্নাসহ গৃহস্থালির সব কর্মপালন করছে আবার অর্থনৈতিক কর্মেও তারা এগিয়ে আছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যোগ্যতা অনুযায়ী নারীদের বড় বড় পদে বসিয়েছেন। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে ১০ জন জেলা প্রশাসক আছেন নারী, ইউএনও আছে শতাধিক, সরকারের সচিব থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন করা হয়েছে। একজন নারী কাজের মাধ্যমে যেমন ইকোনমিক্যালি অবদান রাখছে, তেমনি ঘরেও অবদান রাখছে। অর্থাৎ একজন নারী দু'ভাবেই অবদান রাখছে।

প্রশ্ন : আপনি বললেন, নারীরা এখন পেশা ও গৃহে উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। একসময় মেয়েদের শিক্ষা, ব্যবসায় ক্ষেত্রে পরিবার থেকেই অনাগ্রহ দেখা যেত। এখন কি সমাজ বুঝতে পেরেছে তারাও কাজ করতে পারে?

ড. রহিমা খাতুন : দেখুন, নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত উপলব্ধি করেছিলেন যে নারীদের শিক্ষিত করতে হবে। তিনি দেখতেন, বাড়িতে কোনো আত্মীয় এলে মেয়েদের তাদের সামনে যাওয়া হতো না, বরং নিজেকেই লুকিয়ে রাখতে হতো। তিনি অনুভব করলেন এ সমাজ শিক্ষিত নয় বলে নারীদের প্রতি এই আচরণ। তিনি ভাবলেন, এই নারীরা যদি শিক্ষিত হয়, ঘরের বাইরে বেরোতে পারে তা হলে নারীর প্রতি এই আচরণের পরিবর্তন ঘটবে। তার পরিবার, ভাই, স্বামী সাপোর্ট দিয়েছিল বলেই তিনি তা পেরেছিলেন। এরপর সমাজও উপলব্ধি করতে পারল যে নারীদের শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

এ ছাড়া আরেকটি বিষয় যে যুগের প্রয়োজনেও কিন্তু নারীদের শিক্ষা এবং কর্মে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এখন নারীও অর্থনৈতিক শক্তি। সংসারে শুধু পুরুষের একার আয় দিয়ে স্বচ্ছলতা আসে না। দুজনের আয়ে সেই সংসার পরিচালনা সুন্দর হয়। এমনকি এই যে গ্রাম পর্যায়ে নারীরাও ক্ষেতে স্বামী বা ভাইকে সহায়তা করছে যদি তারা তা না করতো তা হলে আলাদা শ্রমিক বা মজুরের প্রয়োজন হতো, তাকে অর্থ দিতে হতো। এভাবেই মাঠেও নারীদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আবার দেখা গেছে, একটি পরিবারের মেয়েরা শিক্ষা নিচ্ছে, অফিস-আদালতে ভালো চাকরি করছে, তখন অন্যেরাও তাদের পরিবারের মেয়েদের পড়ানোর ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করছে। তবে নারী শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের অবদানই অনেক বেশি। স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীরা ব্যাপক অবদান রেখেছে- তারা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে, খাবার তুলে দিয়েছে, লুকাতে সাহায্য করেছে। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সংবিধানে নারীদের সমান অধিকার সংরক্ষণ করেছেন। তিনি নারী শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন। তারই ধারাবাহিকতায় দেশে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। আমি মনে করি এটি স্বাধীনতার ফসল।

> আমি মনে করি এখন সমাজ পুরুষতান্ত্রিক নয় মহিলাতান্ত্রিকও নয়, জেন্ডার ব্যালেন্সড। আর আমি আগেই বলেছি, জেলা প্রশাসকের দায়িত্বটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব; এখানে আমাকে কেউ নারী হিসেবে চিন্তা করে না। আমিও দায়িত্ব পালনকালে নিজেকে নারী বা পুরুষ মনে করি না, নিজেকে জেলা প্রশাসক হিসেবেই ভাবি। আর আমার কাছে যারা আসেন তাদের ক্ষেত্রেও আমি বিভাজন করি না। প্রত্যেকেই রাষ্ট্রের সাংবিধানিক নাগরিক। আমি যখন যেখানে দায়িত্ব পালন করেছি সেখানকার জনগণের সার্বিক সহযোগিতা পেয়ে আসছি। তারা কখনো আমাকে নারী হিসেবে ভাবে না।

মেয়েরা যখন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে শিক্ষাবিদ, প্রশাসনের কর্মকর্তা, জজ, সেনা কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মকর্তা হবার সুযোগ পেলেন তখন পরিবার এবং সমাজও বুঝতে পারল যে শিক্ষা ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ের মধ্যে পার্থক্য নেই। শিক্ষা নিয়ে যোগ্যতা অর্জন করলে যে কেউ যোগ্য স্থান পেতে পারে। এভাবেই নারী শিক্ষাসহ নারীর কর্মপেশার ক্ষেত্রে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এসেছে। এ জন্য রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিও অনেক সহায়ক হয়েছে। একসময় পড়ালেখা অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ও চাকরিতে নারী কোটা ছিল, এখন কিন্তু কোটা নেই। ৪০ বিসিএস থেকে কোটা উঠে গেছে। এখন কিন্তু সবাইকে প্রতিযোগিতা করেই আসতে হচ্ছে। কিন্তু একসময় কোটা সিস্টেমের মাধ্যমে নারীকে যোগ্য স্থানে বসানোর সুযোগ করে দিয়েছিল রাষ্ট্র।

বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত নারী আসনেও কিন্তু নারীকে নির্বাচন করেই আসতে হয়। আবার অনেক নারী সরাসরি নির্বাচন করেই চেয়ারম্যান-মেম্বার হয়েছেন, উপজেলা চেয়ারম্যান এমনকি এমপিও নির্বাচিত হয়েছেন। সেদিক থেকে বলবো যে, আমাদের সমাজব্যবস্থা ও পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে

পরিবর্তন এসেছে বলেই নারীরা এখন পুরুষের পাশাপাশি সব ক্ষেত্রেই কর্মযোদ্ধা হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারছে। আমি বলবো, রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা দিয়েছে, নারীরা তা কাজে লাগিয়েছে। নারীরা এখন আর 'নারী' এর মধ্যে সঙ্কুচিত নেই, নারী এখন পূর্ণাঙ্গ মানুষ।

প্রত্যয় : বলা হয়ে থাকে এ সমাজে নারীরা বেশ পিছিয়ে এবং এ সমাজব্যবস্থা পুরুষতান্ত্রিক। আপনি প্রশাসনিক ক্যাডারের একজন মেধাবী ব্যক্তিত্ব। বর্তমানে জেলা প্রশাসকের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত। এ ধরনের একটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একজন নারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনে আপনার উপলব্ধি কি?

ড. রহিমা খাতুন : দেখুন, এই সমাজ এখন আর পুরুষতান্ত্রিক নেই। আমার মতে এটি এখন জেন্ডার ব্যালেন্স সমাজ। আমরা যখন প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করি সেক্ষেত্রে কে নারী বা কে পুরুষ সেটা কোনো বিষয় নয়, রাষ্ট্রের আইন ও নিয়মনীতি দ্বারাই সবকিছু পরিচালিত হয়। আরেকটি বিষয় না বললেই নয়, একসময় বলা হতো নারীরা পিছিয়ে আছে, পিছিয়ে পড়ছে এখন কিন্তু পর্যবেক্ষণ বলছে ভিন্ন কথা। স্কুল-কলেজে এখন মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ফলাফলই ভালো। খেলাধুলায় ভালো করছে। একটি বিষয় চিন্তা করে আমি ভীত। সরকার একসময় মেয়েদের জন্য যে সুবিধা দিত ভবিষ্যতে না তা পুরুষদের জন্য দিতে হয়। এটা কাম্য নয়। আমি চাই ছেলে

সুবিধা পেয়েছি। যেমন কোথাও গণ্ডগোল হচ্ছে দু'দল মুখোমুখি– পুলিশের সাথে ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা ইউএনও হিসেবে যেতে হতো। আমি গিয়ে শুধু হাত ইশারা করে বলতাম আপনার ওদিকে যান, আপনারা এদিকে যান– দেখতাম চুপচাপ মেনে নিচ্ছে। অর্থাৎ তারা আমাকে শুধু ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নয়, নারী হিসেবেও সম্মান দেখিয়েছে। মেয়েদের সাথে কেউ তেমন উচ্চবাচ্য করে না। বর্তমান সমাজে এখনো নারীদের প্রতি সমাজের সম্মানবোধ রয়েছে। মেয়েদের প্রতি এই সম্মানবোধ আছে বলেই মেয়েরা নোয়াখালীর প্রত্যন্ত অঞ্চল সোনাইমুড়ি কিংবা বান্দরবানের দুর্গম অঞ্চলে কাজ করছে। অনেক অঞ্চল আছে গাড়িও যায় না হেঁটে যেতে হয়। সেখানেও প্রশাসনিক ক্ষেত্রসহ বিভিন্ন পর্যায়ে নারীরা কাজ করছেন।

প্রত্যয় : নারীর ক্ষমতায়ন নারী সমাজকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নারীর ক্ষমতায়ন প্রশ্নে কি কি উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

ড. রহিমা খাতুন : আমি আগেই বলেছি নারীর ক্ষমতায়ন বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু অনেকটাই অর্জিত হয়েছে। এই যে আজকের এই দৃশ্যটাই দেখুন, কতো বয়স্ক মহিলা, যারা হাঁটতে পারছেন না, অন্যের সাহায্যে চলেন, তারাও জেলা প্রশাসকের কাছে এসেছেন– কেউ নালিশ জানাতে, কেউ কোনো আবেদন দিয়ে, এটাও কিন্তু নারীর ক্ষমতায়নের মধ্যে পড়ে। এখন তারা সচেতন যে

নারীর ক্ষমতায়ন প্রশ্নে যে বিষয়টি অধিক জরুরি তা হচ্ছে নারীকে শিক্ষিত হতে হবে, দক্ষ হতে হবে, তাকে কর্ম পেশায় নিয়োজিত হতে হবে। নারী যতক্ষণ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে না দাঁড়াতে পারবে ততক্ষণ সে তার ক্ষমতায়নকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারবে না। আর মনে রাখা উচিত একটি রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে নারীরা যতোদিন পিছিয়ে ছিল, ক্ষমতায়নের বাইরে ছিল, ততোদিন এদেশ ছিল দরিদ্র অর্থনীতির দেশ।

মেয়ে উভয়েই ভালো করুক। সংসারে এখন আর নারীকে অবহেলার সুযোগ নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘরে-বাইরে দুজনেই কাজ করে সংসার চালাচ্ছে। গৃহকর্মেও পুরুষদের অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে বিশেষ করে কোভিডের পর থেকে পুরুষরা উপলব্ধি করতে পেরেছে ঘরের কাজে সহযোগিতা করা দরকার।

আমি মনে করি এখন সমাজ পুরুষতান্ত্রিক নয়, মহিলাতান্ত্রিকও নয়, জেন্ডার ব্যালেন্স। আর আমি আগেই বলেছি জেলা প্রশাসকের দায়িত্বটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব; এখানে আমাকে কেউ নারী হিসেবে চিন্তা করে না। আমিও দায়িত্ব পালনকালে নিজেকে নারী বা পুরুষ মনে করি না, নিজেকে জেলা প্রশাসক হিসেবেই ভাবি। আর আমার নিকট যারা আসেন তাদের ক্ষেত্রেও আমি বিভাজন করি না। প্রত্যেকেই রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিক। আমি যখন যেখানে দায়িত্ব পালন করেছি সেখানকার জনগণের সার্বিক সহযোগিতা পেয়ে আসছি। তারা কখনো আমাকে নারী হিসেবে ভাবে না।

আমি ২০০৩ সালে চাকরিতে যোগদান করেছি। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমি কখনো দেখিনি যে আমার পুরুষ ব্যাচমেট বেশি সুবিধা পাচ্ছে। আমি দেখেছি এখানে সবাই সমান। বরং কাজ করার ক্ষেত্রে নারী হিসেবে বেশি

কোথায় কার কাছে আবেদন জানাতে হবে। তারা কিন্তু বহুদূর বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসেছেন। অথচ দেখুন, এই নিকট অতীতেও অনেক নারীই জানতেন না ইউএনও, ডিসি কি? নালিশ নিয়ে তাদের কাছে গেলে সমস্যার সমাধান হবে কি না? আমার মা-চাচিরাও এটা পারতেন না। এটা তাদের অধিকার।

আমি মনে করি একজন গৃহ নারীর দায়িত্ব হচ্ছে সংসারে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও মতামত দেয়া। সংসারের তত্ত্বাবধান দেখা, শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজখবর রাখা, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার দেখভাল করা, সে যদি কোনো চাকরি করে সেখানে দায়িত্বশীল হওয়া– প্রকৃত অর্থে এই কাজগুলো নারীর ক্ষমতায়নের মধ্যে পড়ে। এখন যদি একজন নারী মনে করে আমি তো শ্বশুরবাড়ি এসেছি, আমার আর কি করার আছে? আবার শাশুড়ি যদি মনে করেন ওতো পরের বাড়ির মেয়ে সেখানেই ঘটে বিপত্তি।

আমার মতে একজন নারীকেই বুঝতে হবে সংসারজীবনে তার দায়-দায়িত্ব কি, তাকে তা ঠিকমতো পালন করতে হবে। তবে যদি তিনি তার দায়িত্ব পালনে

বাধাগ্রস্ত হন, তাকে যথাযথ মূল্যায়ন না করা হয়, তার যুক্তিপূর্ণ মতামতকে অগ্রাহ্য করা হয় তখন তাকে অবশ্যই প্রতিবাদ করতে হবে, প্রতিকার চাইতে হবে। ঠিক চাকরির ক্ষেত্রেও যদি কোনো নারী লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হন বা তার মেধা অনুযায়ী কর্মস্থলে কাজের সুযোগ না পান তা হলে তাকে এ ব্যাপারে সামনের দিকে এগোতে হবে।

তবে নারীর ক্ষমতায়ন প্রশ্নে যে বিষয়টি অধিক জরুরি তা হচ্ছে নারীকে শিক্ষিত হতে হবে, দক্ষ হতে হবে, তাকে কর্ম পেশায় নিয়োজিত হতে হবে। নারী যতক্ষণ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে না দাঁড়াতে পারবে ততক্ষণ সে তার ক্ষমতায়নকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারবে না। আর মনে রাখা উচিত একটি রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে নারীরা যতোদিন পিছিয়ে ছিল, ক্ষমতায়নের বাইরে ছিল, ততোদিন এদেশ ছিল দরিদ্র অর্থনীতির দেশ। এখন দেখুন বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে, উন্নত দেশের সিঁড়িতে পা রাখতে যাচ্ছে– এটি ঘটছে কারণ দেশে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার মতে, নারীর শিক্ষা ও তাদের কর্মপেশায় নিয়োগের অধিক সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

প্রত্যয় : আপনি দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনিক ক্যাডারে চাকরিরত। অনেকেই মনে করেন নারীদের জন্য অমুক কাজটি সম্ভব হবে না, কিন্তু একজন নারী হয়েও আপনি হয়তো তা অবলীলায় করতে সক্ষম হয়েছেন– এমন অভিজ্ঞতার কথা যদি বলতেন?

ড. রহিমা খাতুন : আমি ঢাকার ডিসি অফিসে তিন বছরের বেশি কাজ করেছি। সেটি ছিল সম্ভবত ২০১৩ সালের দিকে। প্রতিনিয়তই হরতাল-অবরোধ লেগে থাকতো। উচ্ছেদ অভিযান থাকতো, মোবাইল কোর্ট করাতে হতো। আমি ঝিরপুর থেকে শুরু করে অনেক জায়গায় মোবাইল কোর্টে অংশ নিয়েছি। চাকরির অনেক বড় বড় উচ্ছেদ অভিযানে আমাকে নেতৃত্ব দিতে হয়েছে। প্রায় সময়েই আমাকে পাঠানো হতো। আমি যখন যেতাম খুব বেশি বাধার সম্মুখীন হতাম না। নারী কর্মকর্তা বলেই হয়তো অন্য পক্ষ বেশ নমনীয় হয়ে যেতো। বলতাম আগে আইন কার্যকর করতে দিন। সহনশীল থাকতেন, সম্মান করতেন। তবে একসময় নারীরাও ভাবতো তারা এ ধরনের কাজ পারবে না, এখন কিন্তু নারীরাও চ্যালেঞ্জ নিচ্ছে। যেকোনো কঠিন কাজেও অংশ নিচ্ছে। সারদায় ট্রেনিং নেয়ার মুহূর্তে অনেকেই ভাবতো নারীরা ঘোড়ায় চড়তে পারবে না– কিন্তু আমরাও যে যথাযথভাবে পারি সেটা প্রমাণিত।

প্রত্যয় : শিক্ষিত নারীরা বিভিন্ন কর্ম পেশায়, শিল্প খাতে কাজের জন্য স্বীকৃতি পাচ্ছে। কিন্তু গ্রামীণ নারীরা আবহমানকাল ধরে কৃষি উৎপাদনের সাথে সংযুক্ত থাকলেও তাদের কাজ অস্বীকৃত। আপনার অভিমত জানতে চাচ্ছি।

ড. রহিমা খাতুন : এখন হয়তো সবাই জানলেও অর্থনৈতিক মানদণ্ডে গ্রামীণ নারীদের এই স্বীকৃতিটা নেই, তবে এটা জিডিপির হিসাবে ধরার প্রক্রিয়া চলছে। আজ হোক, কাল হোক নারীর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি মিলবেই। নারীরা এখন হাঁস-মুরগির খামার, ছাগল-গরুর খামার নিজেরা করছেন। আর খামার ছাড়াও প্রতি বাড়িতেই গৃহপালিত পশু রয়েছে। তাদের দেখভালও এই নারীরাই করেন। তাদের খাবার দেন, গোসল করিয়ে দেন। আমি অনেক নারীকেই দেখেছি গাভির দুধও দোহন করেন। সুতরাং গ্রামীণ অর্থাৎ প্রান্তিক নারীরা প্রচুর কাজ করেন যার অর্থমূল্য ধরা হয় না।

প্রত্যয় : দেশের বেসরকারি উন্নয়ন খাত প্রান্তিক নারীদের অর্থায়ন করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বিষয়টিকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

ড. রহিমা খাতুন : আসলে সরকার দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের নারীদের উন্নয়নে অনেক ধরনের কাজ করছে। এর পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন যাদের এনজিও হিসেবে সবাই জানেন তারাও নারীদের উন্নয়নে বিশেষ করে তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে ঋণ সহায়তাসহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছে। শুধু তাই নয়, তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ এবং সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আমি মনে করি, একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি এ ধরনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমি দেখেছি, এনজিও কর্মীরা অজপাড়া নারীকে কি খাওয়াতে হয়, কীভাবে যত্ন নিতে হয়, কীভাবে শিশুদের

আমার মতে একজন নারীকেই বুঝতে হবে সংসারজীবনে তার দায়-দায়িত্ব কি, তাকে তা ঠিকমতো পালন করতে হবে। তবে যদি তিনি তার দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্ত হন, তাকে যথাযথ মূল্যায়ন না করা হয়, তার যুক্তিপূর্ণ মতামতকে অগ্রাহ্য করা হয় তখন তাকে অবশ্যই প্রতিবাদ করতে হবে, প্রতিকার চাইতে হবে। ঠিক চাকরির ক্ষেত্রেও যদি কোনো নারী লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হন বা তার মেধা অনুযায়ী কর্মস্থলে কাজের সুযোগ না পান তা হলে তাকে এ ব্যাপারে সামনের দিকে এগোতে হবে।

যত্ন নিতে হয়, হাসপাতালে বাবার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাদের পরিবার পরিকল্পনায় সহায়তা করেন। তাদের সহায়তাতেই গ্রামীণ বাড়িঘরের উন্নয়ন ঘটেছে। তারা বিভিন্ন দুর্যোগ মুহূর্তে ত্রাণ প্রদানের মাধ্যমে অসহায়দের পাশে দাঁড়ান। একই সাথে প্রান্তিক পর্যায়ে আজ যে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল হয়েছে তার এক বিশাল ভূমিকা রাখছে এনজিওরা। আমি মনে করি, সরকারের উন্নয়ন উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনের এ ধরনের কার্যক্রম দেশকে দ্রুত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ■

অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরিন

প্রো-ভিসি, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করতে হলে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ প্রয়োজন

বাংলাদেশ ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরিন এ সময়ের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসেবে আপন আলোয় আলোকিত। একই সাথে তিনি একজন গবেষক এবং লেখক ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সোসিওলজি বিষয়ে বিএসএস অনার্স এবং ১৯৮৩ সালে নিউজিল্যান্ডের Massey University থেকে পিএইচডি করেছেন। ছাত্রী হিসেবে মেধাবী মাহবুবা নাসরিন ১৯৮০ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে মানবিক বিভাগ থেকে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৪র্থ স্থান অধিকার করে প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড এবং ১৯৮১ সালে বিএসএস অনার্স পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। ২০১৬ সালে তিনি ডিজাস্টার অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজে তিন দশকের বেশি সময় ধরে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ আমেরিকার Mary Fran Myers Award লাভ করেন।

প্রফেসর মাহবুবা নাসরিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ (IDMVS) এর পরিচালক এবং যুগ্ম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৯৮৮ সালে সোসিওলজি বিভাগে লেকচারার হিসেবে শিক্ষকতার পেশাজীবন শুরু করেন। তিনি ২০০৫ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সোসিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন এবং ২০১২ সালে IDMVS এর ডিরেক্টরের দায়িত্ব পান। বলা যায় এই ইনস্টিটিউটটি তার হাত দিয়েই শুরু। তিনি ২০০৯ সাল থেকে সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের অ্যাডভাইজরি কমিটির সদস্য।

অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরিন নারী, লিঙ্গ সমতা ও ডিজাস্টার বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং ওয়ার্কশপে যোগদানসহ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছেন। কৃতি শিক্ষাবিদ ও গবেষক বাংলাদেশ ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরিন প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন : আপনি দেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। স্বাধীনতার ৫২ বছরে বাংলাদেশ কতোটা এগোতে পেরেছে?

ড. মাহবুবা নাসরিন : আমরা যদি বাংলাদেশের উন্নয়নের কথা বলি তা হলে স্বাধীনতার ৫২ বছর পর এসে বলবো যে, ইতিমধ্যে আমাদের যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে। দেখুন, বেড়ে ওঠার মুহূর্তে মানসিকভাবে শিশুর যেভাবে সামাজিকীকরণ হয় আমারও তা হয়েছিল। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে মানুষ কীভাবে প্রাণ দিয়েছিল এটি আমি ষাটের দশকের মাঝামাঝিতে শিশু বয়সেই জেনেছি। বাংলাদেশ যে পরাধীন এবং এ দেশের মানুষ যে একটা স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্য অবিরত সংগ্রাম করে যাচ্ছে সেটি দেখতে দেখতেই আমাদের বেড়ে ওঠা। যে কারণে আমাদের সামাজিকীকরণ ওভাবেই হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত যে সমস্যা দেখেছি তা হচ্ছে আমরা বঞ্চিত, আমাদের অধিকার যেটি থাকার কথা সেটি আমরা পাচ্ছি না। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের কোটি কোটি মানুষ যুদ্ধ ও সংগ্রামে অংশ নিয়েছে। আমি শিশু হলেও বুঝেছি বাংলাদেশকে কীভাবে বঞ্চনা করা হয়েছে। হত্যা-নির্যাতন করা হয়েছে। আমরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়েছি, আমাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। এই বিষয়গুলো আমরা কাছ থেকে দেখেছি। সেই ত্যাগ-তিতিক্ষার পরে যখন বাংলাদেশ হলো তখন আমাদের মধ্যে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্ম নিয়েছিল এবং দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছি। জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যখন সামনের দিকে এগুচ্ছিলাম কিন্তু সেই সময়টা আমাদের বেশিদিন ছিল না। বিশ্বের দরবারে আমরা একটি মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছি, কিন্তু সেই আনন্দটা আমরা বেশিদিন উপভোগ করতে পারিনি। জাতির পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর সেই এগিয়ে যাওয়াকে আমরা ধরে রাখতে পারিনি। আমরা ভেবেছিলাম যে বাংলাদেশ অনেক দূর এগোবে, এদেশে আর দরিদ্র থাকবে না। তখন অনেক বন্ধুরাও ছিল বাংলাদেশের উন্নয়নের পেছনে এবং আমাদেরও একটা চেষ্টা ছিল, সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ গঠনের। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর এই ভবিষ্যৎ দেখাটাও বন্ধ হয়ে গেল। যে কারণে গত ৫২ বছরে যতটা অর্জন আমরা করতে পারতাম ততোটা করতে পারিনি। তিনি বেঁচে থাকলে এই অর্জনটা আরো বেশি হতে পারত।

যাই হোক, পরবর্তীতে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়ন অর্থনীতিতে অনেক দূর এগোতে সক্ষম হয়েছে। আমি বলবো যে গত এক যুগ ধরে বাংলাদেশে একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে। জাতির পিতার যে মূল্যবোধ ছিল, যে স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্নের অনেক কিছুই আমরা বাস্তবায়ন হতে দেখছি। ৫২ বছরে আমরা যেটুকু অর্জন করতে চেয়েছিলাম, তার সবটুকু না পারলেও আমরা কিছুটা পূরণ করতে পেরেছি। তার পেছনে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদান অনেকখানি। পিতার আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য সন্তান কতোটা চেষ্টা গ্রহণ ও ত্যাগ করতে পারে তার বড় প্রমাণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সব মিলিয়ে আমি বলবো যে স্বাধীনতার ৫২ বছরে আমাদের অনেক উন্নয়ন হয়েছে।

প্রশ্ন : এই পরিবর্তনের পেছনে নারী সমাজের অবদান সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।

ড. মাহবুবা নাসরিন : বাংলাদেশের নারী সমাজকে নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের কথা আসে। ৮ মার্চ তার জন্মদিন। এই উপমহাদেশে বিশেষ করে মুসলিম নারী শিক্ষার পেছনে তার অবদান অনেক। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে সংবিধান রচিত হয় সেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যেকার সমতার কথা লেখা আছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বিভিন্ন ভাষণে দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণের কথা বলেছেন। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনি তাঁর ভাষণে প্রায়ই নেপোলিয়ান বোনাপার্টের একটি উক্তি করতেন যে, তোমরা আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি শিক্ষিত জাতি দেব। নারীরা ঘরে বসে থাকবে না, সবাই শিক্ষিত হবে এবং সেটির প্রতিফলনও আমরা তাঁর জীবনে দেখেছি। তার অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে দেখেছি বেগম মুজিব সম্পর্কে তাঁর যে উক্তি, সেই উক্তি থেকেই প্রমাণিত হয় তিনি নারীকে কতোটা সম্মান দিতেন।

বাংলাদেশে নারী সমাজের অবদানে যারা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে রয়েছেন তাদের অবদান আর যারা নারী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত তাদের অবদান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে নারী আন্দোলন তো শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। তারা দেশকে স্বাধীন দেখতে চেয়েছে, তারা আন্দোলনে তাদের অবদান রয়েছে। দেশ স্বাধীন করার পেছনে এবং সমতা প্রতিষ্ঠায় নারী আন্দোলন কর্মীদেরও ভূমিকা আছে। পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে

তৈরি পোশাক শিল্প যার মাধ্যমে দেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়, সেখানে শতকরা ৮০ ভাগই নারী। বিদেশেও এ দেশের নারীরা কাজ করছে, প্রযুক্তি খাতে, শিক্ষকতা, বেসরকারি সংস্থা সব জায়গাতেই নারীদের অবদান আছে। আগে যেমন এসএসসি পাস হলেই প্রাথমিকের শিক্ষক হওয়া যেতো, নারীরা এখন যেহেতু অধিক সংখ্যায় স্নাতক কিংবা আরো উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে তাই এখন গ্র্যাজুয়েট চাওয়া হয়।

যদি নারীর অগ্রগতি দেখি, রাজনৈতিক ক্ষমতায় তাদের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। আমরা যে ক্ষমতায়নের কথা বলি বাংলাদেশ এমডিজি অর্জনে দুটো গোল– একটি হলো মাতৃমৃত্যু হ্রাস করা অন্যটি হলো জেন্ডার সমতা আনা– প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক ক্ষেত্রে শিক্ষা লাভে। এ দুটি ক্ষেত্রেই তাদের অর্জন আছে। সমতা আনার ক্ষেত্রেও নারীরা শিক্ষা এবং রাজনীতিতে এগিয়ে আসার ফলেই এখন নারীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মক্ষেত্রে আছে। এক সময় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই এ দেশের নারীরা সবচেয়ে পিছিয়ে ছিল। কিন্তু

এখন যদি দেখি যে, তৈরি পোশাক শিল্প যার মাধ্যমে দেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়, সেখানে শতকরা ৮০ ভাগই নারী। বিদেশেও এ দেশের নারীরা কাজ করছে, প্রযুক্তি খাতে, শিক্ষকতা, কেরানি সহ সব জায়গাতেই নারীদের অবদান আছে। আগে যেমন এসএসসি পাস হলেই প্রাথমিকের শিক্ষক হওয়া যেতো, নারীরা এখন যেহেতু অধিক সংখ্যায় স্নাতক কিংবা আরো উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে তাই এখন গ্র্যাজুয়েট চাওয়া হয়। সরকারের নীতিনির্ধারণীতে নারীরা অধিক সংখ্যায় যুক্ত হবার সুযোগ পাচ্ছে।

প্রত্যয় : আপনার দৃষ্টিতে বর্তমান বাংলাদেশে নারী সমাজের প্রধান প্রধান সমস্যা কি? স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রযুক্তির ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে নারী সমাজকে এর সাথে কীভাবে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে?

ড. মাহফুজা নাসরিন : আমরা তো ডিজিটাল বাংলাদেশ দেখেছি। একটি উদাহরণ দেই, আমরা মনে করেছিলাম কোভিড অতিমারীর সময় হয়তো ১০ ভাগ বা ১৪ ভাগ শিক্ষার্থীকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু কিছু কিছু করে গেলেও প্রযুক্তি ব্যবহার করে, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে প্রায় সবাইকেই ক্লাসের আওতায় আনা গেছে। দুই বছরের সংকট কাটিয়ে ছাত্রছাত্রীরা সশরীরে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমরা ধরে নিয়েছিলাম ৫০ ভাগ শিক্ষার্থীই আর আসবে না, কিন্তু তাদের

১৯৭৫ সালের দিকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ করা হয়েছে। দেখা গেছে আমরা অনেকটা পিছিয়ে গিয়েছিলাম। কারণ, আমরা জেন্ডারের ধারণা আসা পর্যন্ত নারীদের শুধু উন্নয়নে আয় বৃদ্ধির জন্য সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু যদি মনে করি তার প্রজনন স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল করব না, তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার দিকে নজর দেব না, তার যে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সেটার ক্ষমতা তার হাতে দেব না, আমরা যদি শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রবেশাধিকারকে একেবারে সংকুচিত করে ফেলি তা হলে সেটা উন্নয়ন হবে না।

বেশিরভাগই ফিরে এসেছে। আমরা ভেবেছিলাম ৫০ ভাগ শিক্ষার্থী হয়তো পরীক্ষা দেবে কিন্তু দেখা গেল যে প্রায় ৭৫ ভাগ শিক্ষার্থী অনলাইন সুবিধা নিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে।

আমরা যখন অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্লাস নিতাম তখন ছেলেরা হয়তো বলতো যে আমি এখন বাজারে আছি, তাদের উপস্থিতি দেখার জন্য বলতাম যে ক্যামেরা অন করো, হঠাৎ করে কাউকে প্রশ্ন করতাম। দেখতাম যে মেয়েরা ভালো উত্তর দেয়, কারণ তারা তো বাড়িতে থাকছে এবং ওই সময়ের জন্য তারা ইন্টারনেট ডেটা কিনে নিয়েছে। যারা দরিদ্র মেধাবী তাদেরকে ইউনিভার্সিটি বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহায়তাও করেছে। কোভিডের যে ইতিবাচক দিক আছে এটা তেমনই একটি ইতিবাচক দিক যে, মেয়েরাও প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে এবং বাসায় পড়াশোনার কাজ এবং গৃহস্থালির কাজ একত্রে করেছে। প্রযুক্তির এই ইতিবাচক দিকটা আমরা দেখেছি। আরেকটা ইতিবাচক দিক হচ্ছে উদ্যোক্তা তৈরি। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পুরুষ উদ্যোক্তার থেকে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা এখন অনেক বেশি। আবার প্রযুক্তির নেতিবাচক দিক ব্যবহার করে নারীদের প্রতি সহিংসতার প্রকাশ ঘটানো হচ্ছে। স্মার্ট বাংলাদেশে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করতে হলে সাইবার ক্রাইম রোধে আমাদেরকে খুব শক্তিশালী পদক্ষেপ নিতে হবে। স্মার্ট প্রযুক্তি কিছুটা ব্যয়বহুল, তাই এখানে নারীর কিছুটা অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা আছে। তারপর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কনসেপ্টটা এখনো বাংলাদেশে গ্রো করেনি। আবার পাবলিক-প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে একটা গ্যাপ এখনো আছে। দেখা গেল যে, পরিবার থেকে একটা ছেলেকে কোনো জায়গায় গিয়ে একটা প্রশিক্ষণ নিতে অ্যালাউ করছে কিন্তু পারিপার্শ্বিক নিরাপত্তাহীনতার কথা চিন্তা করে একটি মেয়েকে সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য অ্যালাউ করছে না। তাই এই সামাজিক পারিপার্শ্বিক নানা ধরনের সহিংসতাকে কঠোরভাবে মোকাবিলা করতে পারলে নারীরা আরো বেশি প্রযুক্তিবান্ধব হতে পারবে এবং স্মার্ট বাংলাদেশে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

নারীদের বাসে একজন নারী কেন কন্ডাক্টর হবে না? বাসে যদি প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্মার্টলি একটা টিকিট দিয়ে দেয় তা হলে অবশ্যই একজন নারী এই কাজটি করতে পারবে। বিভিন্ন প্রযুক্তি আছে– টিভি, ফ্রিজ সার্ভিসিং, মোবাইল সার্ভিসিং এই ট্রেডগুলোতে মেয়েরা আসছে না। কিন্তু যখন একজন নারী একা বাসায় থাকে তখন এই সার্ভিসিংয়ের কাজগুলো দক্ষ নারী কর্মী বাসায় গিয়ে স্বাচ্ছন্দে করে দিতে পারে।

স্মার্ট প্রযুক্তি বলতে আমরা যেন মোবাইল ফোন না বুঝি। সব প্রযুক্তিই স্মার্টলি ব্যবহার করা এবং সেখানে তার দক্ষতা অর্জন করাই হচ্ছে স্মার্ট প্রযুক্তি।

প্রত্যয় : নারীরা তাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করার জন্য যদি স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে তা হলে তাদের জন্য এই প্রযুক্তি কোনো বাধা বা হুমকি কি না?

ড. মাহফুজা নাসরিন : যদি নিয়ন্ত্রণ আরোপ না থাকে এবং যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে এটি অনেক সময় হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ানোর আশঙ্কা থাকে। আরেকটি বিষয় যে শুধু বাংলাদেশের মেয়েরা না আমেরিকা-কানাডার মতো দেশের মেয়েরাও কম্পিউটার অন করতে পারে না। বৈশ্বিকভাবেই মেয়েরা প্রযুক্তি ব্যবহারে পিছিয়ে আছে। আর এই ব্যবহার না করার পেছনে সামাজিক পরিবেশটাও অনেকাংশে দায়ী। এছাড়া এসবের পেছনে মূলত আমাদের মন-মানসিকতার বিষয়টিও প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

প্রত্যয় : বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে যে, ঘরে বসেই নারীরা আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারছে। এক্ষেত্রে কি সরকার কোনো সহযোগিতা দিতে পারে?

ড. মাহফুজা নাসরিন : সরকার নারীদের অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। কোভিডের সময় সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি বাড়িয়েছে। সেখানে যে তালিকা আছে, সে তালিকায় নারী, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি– এরা সবাই তালিকার অগ্রভাগে আছে। প্রণোদনা দেয়ার ক্ষেত্রেও নারী উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে এবং দেয়াও হচ্ছে। তারপরও আমি বলবো যে, যখন একজন দাঁড়িয়ে যায় বেশিরভাগ প্রণোদনাটা সেখানেই দেয়া হয়– বিশেষ করে বস্ত্রশিল্প ক্ষেত্রে। আমি এই সনাতন শব্দটিকে অসম্মান করে বলছি না, প্রতিযোগিতার বাজারে সব আয় যাতে করতে পারে সে রকম ব্যবসায় যার যেটার সুযোগ আছে বা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে তা হলে সেখানে প্রণোদনাটা দেয়া উচিত। সুতরাং কিছু প্রযুক্তি আছে যেটি লাগবেই সেখানে অনেককে কিছু প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তুলতে হবে। যাতে নারীরা সব কাজে একই সাথে অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রত্যয় : একজন নারী উদ্যোক্তা হয়ে কাজ করলেও অনেক সময় ধরে নেয়া হয় এই কাজটার পেছনে পুরুষের সহযোগিতা রয়েছে– আপনি বিষয়টি কীভাবে দেখেন?

ড. মাহফুজা নাসরিন : উদাহরণ হিসেবে একজন নারীর কথা বলবো, তিনি বলছেন যে তিনি কৃষক। কিন্তু তার স্বামী কখনোই কৃষিকাজ পছন্দ করেন না। বেকার থাকবে তাও কৃষিকাজ করবেন না। মহিলার যেহেতু শ্বশুরবাড়িতে অনেক জমি আছে তাই তিনি মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে, নিজে পরিশ্রম করে জেলা পর্যায়ে, গ্রামীণ পর্যায়ে সেরা কৃষি পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু তারপরও জাতীয় পর্যায়ে পাচ্ছেন না। পুরস্কার দাতারা বলছেন যে, যার স্বামী বেঁচে আছে সে তো একা একা এই কাজগুলো

করেননি– অর্থাৎ তারা নারীর একক কর্মদক্ষতাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এই যে মানসিকতাটা এটাও কিন্তু আমাদের এখনো রয়ে গেছে। আমাদের মানসিকতাটা এখনো পরিবর্তন হয়নি।

একজন নারীকে খামারের মালিক ভাবতে পারি না যদি না তার বাড়িতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ থাকে। কিন্তু বিষয়টা তা নয়। আমি বলি যে, কোনো নারী যদি মনে করে সে পরিশ্রম করে তার সম্পদ বাড়ানো সম্ভব তা হলে সে তা করবে না কেন? অথচ তাদেরকে কৃষক বলা হচ্ছে না, খামারের মালিক বলা হচ্ছে না, বললেও তারা স্বীকৃতি পাচ্ছে না। এই কাজগুলোর মাধ্যমে শুধু আত্মকর্মসংস্থানই নয়, কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করছেন এবং মনে করা হচ্ছে যে কারো সহায়তা ছাড়া সে এই কাজগুলো করতে পারে না। এই যে অবিশ্বাস এটা মন থেকে দূর করতে হবে। ভালো ভালো উদাহরণগুলো সামনে তুলে আনতে হবে।

বাজারজাত করাটা একটা সমস্যা। দেখতে হবে বিক্রি করে যে টাকা পাওয়ার কথা সেটা পাচ্ছে কি না। অর্থনীতিটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন কি না তার নিজের হাতে সক্ষমতাটা থাকছে কি না, তিনি ব্যাংকিং বোঝেন কি না। এই জায়গাগুলোতে আমাদের কাজ করতে হবে। কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন পেলে তারা আরো ভালো করবে। যেখানে পুঁজির দরকার হয়, সেক্ষেত্রে তাদেরকে ব্যাংক লোন দিয়ে সহায়তা করা এবং সেটি সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না এবং কোনো পুরুষ এটি ভক্ষণ করছে কি না এই বিষয়গুলো দেখতে হবে।

বিষয় হচ্ছে কারিকুলাম। আমরা যে কারিকুলাম তৈরি করছি সেটিকে বলে আউটকাম বেজড কারিকুলাম (OBC) অর্থাৎ এত গ্র্যাজুয়েট তৈরি হচ্ছে, এতো মাস্টার ডিগ্রিধারী তৈরি হচ্ছে কিন্তু এর আউটকামটা কি হবে? তারা কোথায় যাবে? সেক্ষেত্রে আমাদের উচ্চশিক্ষার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বেড়ে যাচ্ছে, নারী শিক্ষাও বেড়ে যাচ্ছে এবং তারা অপেক্ষাকৃত ভালো ফলাফল করছে। প্রয়োজন বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তাদেরকে প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা করা। বর্তমানে একটি আলোচনা হচ্ছে যে, যারা শিক্ষা নিয়েছে কিন্তু কোনো প্রশিক্ষণ পায়নি সে এলাকাভিত্তিক কর্মসংস্থান কোথায় কোথায় হয়, কোন কোন কর্মে তারা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সুতরাং প্রযুক্তি ব্যবহার করে দক্ষতাভিত্তিক যে শিক্ষা সেটার ব্যবস্থা করতে হবে।

শুধু বই পড়ে বা তথ্যগত দিকটা দিয়ে এখন আর হচ্ছে না। এখন নারী-পুরুষ সবার ক্ষেত্রেই এই মিশ্র পদ্ধতির শিক্ষা চালু হওয়া দরকার। সময় বা কর্মঘণ্টাকে এখন বাঁচাতে হবে। আমরা এখন যৌথ পরিবারে বাস করি না, একক পরিবারে বসবাস করি। সুতরাং নারীর প্রতি যে শ্রম বিভাজন অর্থাৎ এখনো নারীকেই ঘর সংসারের কাজ করা, রান্না করা, সন্তান সামলানো এবং সাথে সাথে চাকরিও করছে। তাই সময় এসেছে নারী-পুরুষ সবাইকে যৌথভাবে সব কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা।

শুধু বই পড়ে বা তথ্যগত দিকটা দিয়ে এখন আর হচ্ছে না। এখন নারী-পুরুষ সবার ক্ষেত্রেই এই মিশ্র পদ্ধতির শিক্ষা চালু হওয়া দরকার। সময় বা কর্মঘণ্টাকে এখন বাঁচাতে হবে। আমরা এখন যৌথ পরিবারে বাস করি না, একক পরিবারে বসবাস করি। সুতরাং নারীর প্রতি যে শ্রম বিভাজন অর্থাৎ এখনো নারীকেই ঘর সংসারের কাজ করা, রান্না করা, সন্তান সামলানো এবং সাথে সাথে চাকরিও করছে। তাই সময় এসেছে নারী-পুরুষ সবাইকে যৌথভাবে সব কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা।

প্রশ্নঃ আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বর্তমানে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভো-ভিসি। আপনার দৃষ্টিতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কি ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন। নারী শিক্ষার বৃদ্ধিতে কি উদ্যোগ নেয়া যায় বলে মনে করেন?

ড. মাহবুবা নাসরীন ঃ কোভিডের সময় দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বেশ পরিবর্তন এসেছে। অবশ্য তার আগে থেকেই কিছু পরিবর্তন লক্ষণীয়। তবে সংখ্যার দিকে না তাকিয়ে আমাদের কোয়ালিটি বা মানসম্পন্ন শিক্ষার দিকে তাকানো উচিত। মানসম্পন্ন শিক্ষা মানে মিশ্র পদ্ধতিতে শিক্ষা। যেহেতু আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোভিড অতিমারীর সময় শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করেছি। সেক্ষেত্রে মনে করি যে স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে মিশ্র পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া যায়, সেদিকে গুরুত্ব দেয়া উচিত। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে আমরা নীতিমালা তৈরি করছি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে কারিকুলাম। আমরা যে কারিকুলাম তৈরি করছি সেটিকে বলে আউটকাম বেজড কারিকুলাম (OBC) অর্থাৎ এত গ্র্যাজুয়েট তৈরি হচ্ছে, এতো মাস্টার ডিগ্রিধারী তৈরি হচ্ছে কিন্তু এর আউটকামটা কি হবে? তারা কোথায় যাবে? সেক্ষেত্রে আমাদের উচ্চশিক্ষার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বেড়ে যাচ্ছে, নারী শিক্ষাও বেড়ে যাচ্ছে এবং তারা অপেক্ষাকৃত ভালো ফলাফল করছে। প্রয়োজন বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তাদেরকে প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা করা। বর্তমানে একটি আলোচনা হচ্ছে যে, যারা শিক্ষা নিয়েছে কিন্তু কোনো প্রশিক্ষণ পায়নি সে এলাকাভিত্তিক কর্মসংস্থান কোথায় কোথায় হয়, কোন কোন কর্মে তারা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সুতরাং প্রযুক্তি ব্যবহার করে দক্ষতাভিত্তিক যে শিক্ষা সেটার ব্যবস্থা করতে হবে।

শুধু বই পড়ে বা তথ্যগত দিকটা দিয়ে এখন আর হচ্ছে না। এখন নারী-পুরুষ সবার ক্ষেত্রেই এই মিশ্র পদ্ধতির শিক্ষা চালু হওয়া দরকার। সময় বা কর্মঘণ্টাকে এখন বাঁচাতে হবে। আমরা এখন যৌথ পরিবারে বাস করি না, একক পরিবারে বসবাস করি। সুতরাং নারীর প্রতি যে শ্রম বিভাজন অর্থাৎ এখনো নারীকেই ঘর সংসারের কাজ করা, রান্না করা, সন্তান সামলানো এবং সাথে সাথে চাকরিও করছে। তাই সময় এসেছে নারী-পুরুষ সবাইকে যৌথভাবে সব কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা। এখন অনেক প্রতিষ্ঠান করা দরকার যেমন আমাদের এখানে কোনো শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র নেই। থাকলেও দুয়েকটা। আমাদের যারা বয়োজ্যেষ্ঠ/প্রবীণ আছেন চাই না যে তাদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম থেকে কিন্তু তারা যদি ঘরে বসেই কোনো প্রশিক্ষিত কারো কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষতা লাভ করতে পারে, তারাও কিন্তু কাজের মধ্যে থাকতে পারবে এবং অন্যের বোঝা না হয়ে। পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করতে হলে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সুতরাং কর্মক্ষেত্রে অভিনবত্ব থাকতে হবে। নতুন নতুন কর্মসংস্থান ইচ্ছা করলেই সৃষ্টি করা যায়।

প্রশ্নঃ ওপেন ইউনিভার্সিটি ছাড়াও আপনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক। আপনার ডিপার্টমেন্টটি বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন ডিপার্টমেন্ট। আপনি জলবায়ু নিয়ে গবেষণা করেন, আমাদের দেশটি হচ্ছে দুর্যোগপ্রবণ। সেক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সচেতনতা কীভাবে এবং প্রটি কাদের মাধ্যমে তৈরি সম্ভব? এনজিও নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রটি করা যায় কি না?

ড. মাহবুবা নাসরিন : আমি শুধু বাংলাদেশ না, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম নারী গবেষক হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে গবেষণা করেছি এবং স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কারও পেয়েছি। আমরা মনে করি যে, দুর্যোগে নারীরা খুব নাজুক, তারা অসহায়, তাদের সাহায্য করা লাগবে। ১৯৮৮ সালের বন্যার সময় আমি জানতাম না যে দুর্যোগে কার ভূমিকা কি। তখন দেখলাম নারীদের গৃহভিত্তিক কাজ এবং তাদের সঞ্চয় দ্বারা নারীরাই পরিবারকে টিকিয়ে রাখে। নারীরা যেভাবে দুর্যোগকে মোকাবিলা করে সেটা তাদের নাজুকতা বা অসহায়ত্ব না। সেটা হচ্ছে তাদের লোকায়ত জ্ঞান ব্যবহার করে দুর্যোগের সময় সংসারকে টিকিয়ে রেখেছেন।

একজনের নাকফুলের অনেক আবেগ আছে। বিবাহিত মেয়েরা নাকফুল খুলে না। সে বলেছে যে শেষ সম্বল হিসেবে আমি নাকফুলটা বিক্রি করেছি কিন্তু ছাগলটা বাঁচিয়ে রেখেছি। নাকফুলটা বিক্রি করে প্রথম দিন আমার বাচ্চাদের জন্য খাবার জোগাড় করেছি। ১৯৮৭ সালের বন্যায় তারা এত কষ্ট করলেন ১৯৮৮ সালের বন্যার সময় বাড়িতে একটা করে আলগা চুলা। সে সময় কোনো বেসরকারি সংস্থা ছিল না। কিন্তু ১৯৮৮ সালের বন্যার বেসরকারি সংস্থা গিয়ে তাদেরকে নানা প্রশিক্ষণ দিয়ে কীভাবে তারা পানি বিশুদ্ধ করবে, কীভাবে বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবে তা শেখাতো। এই বিষয়গুলো নারীর অভিজ্ঞতা নিয়ে দুর্যোগ সহনশীল হয়ে গেছে। এখন বলা হচ্ছে বাংলাদেশ দুর্যোগ সহনশীল, জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল। এখানে নারীদের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। আমাদের অনেক লোকায়ত জ্ঞান আছে, যেগুলোকে আমার থিসিসে আরো একটু শক্তিশালী করার কথা বলেছিলাম। ২০১১ সালে নারী উন্নয়ন নীতিমালায় 'দুর্যোগে নারী ও শিশু' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান যেটিকে বিসিসিএসএপি বলে– সেখানে নারী বিষয়টা ছিল না। এখন যে রিভাইজ হয়েছে ২০১৩ সালে আমরা সেটিকে রিভাইজ করে নারী বিষয়ক জলবায়ু পরিবর্তন কেমন হওয়া উচিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা যে টিম সেখানে আমি ছিলাম। এগুলো আমরা অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছি। পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সুতরাং এই যে দুর্যোগের বিষয়টা আমরা প্রথম ইনস্টিটিউট থেকে মাস্টার্সে শুরু করলাম। কারণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য কাজ আসা শুরু হলো বাংলাদেশে কিন্তু প্রশিক্ষিত কেউ নেই। তারপর আমরা শিক্ষক প্রশিক্ষণও দিয়েছি। এ জন্যই এখান থেকে ইনস্টিটিউটটির জন্ম। আমি তার সহপ্রতিষ্ঠাতা। ৯ বছর এখানে পরিচালক হিসেবে থাকলাম এবং মায়ের স্নেহেই এটিকে গড়ে তুলেছি। বিদেশিরাও আমাদের এখানে কাজকর্ম দেখে মুগ্ধ হয়ে ফান্ড দিল ইইউকে থেকে। সেটি দিয়ে আমি একটি পুরো ফ্লোর করেছি পাঁচ বছর দাঁড়িয়ে থেকে। এটাই আমার পুরোনো অফিস। এটাই অবদান যে আমাদের ১২তম প্রফেশনাল ব্যাচ চলছে। আমরা ডিপ্লোমাও দিয়েছি। আর রেগুলার যে ব্যাচ সেটি ১১তম ব্যাচ চলছে। আমরা সাংবাদিকদের ট্রেনিং দিয়েছি পাঁচ দিনের জন্য। এনজিওদেরকে দিয়েছি ৬ মাস থেকে ৯ মাসের ট্রেনিং। শুধু যে ৯ বছর থেকে দিতে দিতে এখন শুধু মাস্টার্সটা বাকি।

প্রত্যয় : এই যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এর সাথে আপনি সম্পৃক্ত, এই প্রতিষ্ঠানের সাথে বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এনজিও উন্নয়ন সংস্থার কি ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক হতে পারে, যেটি নারী উন্নয়নসহ সামগ্রিকভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রভাব বিস্তার করতে পারে?

ড. মাহবুবা নাসরিন : আমাদের যে জেন্ডার অ্যান্ড ডিজাস্টার নেটওয়ার্ক আমি করেছি ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের সাথে ভিজিটিং প্রফেসরকে, সেখানে এনজিওরাও সম্পৃক্ত আছে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে। এটি একদিনে না বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সাথে কাজ করতে করতেই এ পর্যায়ে আসা। আমি মনে করি যে, আমরা একসাথে গবেষণা করতে পারি, কোনো ইভেন্ট করতে পারি।

প্রত্যয় : আমাদের দেশে এখনো লিঙ্গবৈষম্য বড় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এটি উন্নয়নের জন্য বড় অন্তরায়। এই সমস্যার সমাধানে আপনার প্রস্তাবনা কি?

ড. মাহবুবা নাসরিন : জেন্ডার বলতে এখন শুধু নারী-পুরুষ বোঝাচ্ছে না, ট্রান্সজেন্ডার একটা কমিউনিটি আছে, তারপর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার– এটা নিয়েও সরকারি সংস্থা এবং এনজিওদের সাথে আমরা সম্মেলন করেছি। আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমি মনে করি যে, যদি আমরা সমতা বলি তা হলে এই বৈষম্যটা কোনো বৈষম্য না। আমরা কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেই, যার মাধ্যমে এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা যায়। যদি এই বিষয়গুলো পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে শিশু বয়স থেকে শেখানো যায় তা হলে এগুলো আর থাকবে না।

জেন্ডার বলতে এখন শুধু নারী-পুরুষ বোঝাচ্ছে না, ট্রান্সজেন্ডার একটা কমিউনিটি আছে, তারপর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার– এটা নিয়েও সরকারি সংস্থা এবং এনজিওদের সাথে আমরা সম্মেলন করেছি। আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমি মনে করি যে, যদি আমরা সমতা বলি তা হলে এই বৈষম্যটা কোনো বৈষম্য না। আমরা কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেই, যার মাধ্যমে এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা যায়। যদি এই বিষয়গুলো পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে শিশু বয়স থেকে শেখানো যায় তা হলে এগুলো আর থাকবে না।

প্রত্যয় : আমাদের প্রত্যয়ের এ সংখ্যার নাম দিয়েছি 'উন্নয়নে নারী'। আসলেও কি নারীরা উন্নয়ন ধারায় আছে?

ড. মাহবুবা নাসরিন : ১৯৭৫ সালের দিকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ করা হয়েছে। দেখা গেছে আমরা অনেকটা পিছিয়ে গিয়েছিলাম। কারণ, আমরা জেন্ডারের ধারণা আসা পর্যন্ত নারীদের শুধু উন্নয়নে তার বৃদ্ধির জন্য সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু যদি মনে করি তার প্রজনন স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল করব না, তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার দিকে নজর দেব না, তার যে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সেটার ক্ষমতা তার হাতে দেব না, আমরা যদি শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রবেশাধিকারকে একেবারে সংকুচিত করে ফেলি তা হলে সেটা উন্নয়ন হবে না।

এখন কিছু কিছু ইতিবাচক পলিসির কারণে আমরা মনে করি যে, উন্নয়নে নারীদের অবদান প্রথম থেকেই ছিল কিন্তু গণনা করা হতো না। এখন প্রান্তিক নারীও যদি কোনো কাজ করে তা হলে তাকে গণ্য করা হয়। তবে একটা জায়গায় আমার অভিমত হচ্ছে যে, বেশিরভাগ সময় অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে সম্পৃক্ত দেখা যায় কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে তাদের আরো সম্পৃক্ততা বাড়ানো দরকার।■

অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা

প্রভোস্ট, রোকেয়া হল

সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

কেন্দ্র থেকে প্রান্তে, প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে সর্বত্রই নারীরা এগোচ্ছে

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের প্রভোস্ট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক। তিনি ঢাবির সোসিওলজি বিভাগের অধ্যাপক। তিনি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (IUT) ও BUET এর খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ড. জিনাত হুদা দেশের একজন খ্যাতিমান গবেষক হিসেবে অসংখ্য গবেষণাপত্র তৈরি করেছেন। দেশ-বিদেশের অসংখ্য জার্নালে তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তার লিখিত গবেষণা গ্রন্থ Middle Class and Nationalism in Bangladesh এবং Rangalal Sen and Shishir Ghose Paribartansheel Samaj সুধীমহলে বেশ সমাদৃত এবং গবেষণাকার্যে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তিনি তার গবেষণাকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ জাপানের আন্তর্জাতিক Numata Fellowship Award যুক্তরাজ্যের Overseas Research Students Award Schemes (ORS) সহ জাতীয় পর্যায়ে অনেক পদক ও সম্মাননা লাভ করেছেন। তিনি ১৯৮৬ সালে রোকেয়া হলের ছাত্রী হিসেবে জাতীয় টিভি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। অধ্যাপক জিনাত হুদা মানুষ হিসেবে খুব স্পষ্টবাদী। সম্প্রতি প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে আলোকিত শিক্ষাবিদ ও গবেষক ড. জিনাত হুদা যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

প্রত্যয় : আপনি দেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। এ কথা সত্য যে, স্বাধীনতার ৫২ বছরে বাংলাদেশ বেশ এগিয়েছে। আপনার মতে দেশের নারী সমাজ কতোটা এগোতে পেরেছে?

ড. জিনাত হুদা : আমি মনে করি নারীর ক্ষমতায়নে লিঙ্গ সমতায় বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে একটি রোল মডেল। অমর্ত্য সেন নিজেই স্বীকার করেছেন যে ভারতের নারীদের থেকে বাংলাদেশের নারীরা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এটা বাস্তবতা কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত তাকালেই দেখা যায়। সব পর্যায়ে নারীদের সুদৃঢ় অবস্থান লক্ষণীয়। প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, ক্যাডার সার্ভিস, পুলিশ প্রশাসন, বৈমানিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যেটা অনেক দিন দেখিনি সেটিও এখন আমরা অনেক জায়গায় দেখতে পাচ্ছি।

প্রান্তিক পর্যায়েও দেখা যায় যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলো দাঁড়িয়ে আছে সেটিও তো নারীর শ্রমে-ঘামে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে তাকালে দেখা যাবে সেখানে জোগালি, রাজমিস্ত্রি, পরিচ্ছন্নতাকর্মী নারী তো আছেই এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি হলে দারোয়ান নারী আছে। শুধু তাই নয়, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ছাত্রীরা এখন স্কুটি চালাচ্ছে, সাইক্লিং করছে, মোটরবাইক চালাচ্ছে। বিভিন্ন উদ্যোক্তা নারীদের দেখতে পাচ্ছি। আমার হলেই অনেক শিক্ষার্থী আছে তারা আচার বানিয়ে বিক্রি করছে, ব্রাইডাল মেকআপ করে দিচ্ছে ইত্যাদি নানা উদ্যোগে যুক্ত হচ্ছে। আর টিউশনি তো করছেই মেয়েরা। আমি এতগুলো উদাহরণ দিলাম এবং এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে এটাই আসলে বর্তমান বাংলাদেশে নারীদের এগিয়ে যাবার চিত্র।

আমি যে কথাটি প্রায়ই বলি যে, জল, স্থল, অন্তরীক্ষে এখন বাংলাদেশের মেয়েদের পদচারণা আছে। হিমালয়ে আরোহন বলেন আর বৈমানিক বলেন সব জায়গাতে নারীর অংশগ্রহণ আছে।

প্রত্যয় : আপনি বললেন, নারীরা বেশ এগিয়েছে। সেক্ষেত্রে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারী সমাজের অবদান সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।

ড. জিনাত হুদা : আমি আগেই বলেছি বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি মূল স্তম্ভ হচ্ছে গার্মেন্টস শিল্প। সেই গার্মেন্টস শিল্পে মজুরি শ্রমিক হিসেবে প্রায় ৮০% নারী শ্রমিক কাজ করছে। পরিবারগুলোতেও কিন্তু আমরা অনেক অগ্রসরমানতা দেখতে পাই। প্রথমত জেন্ডার প্যারোরিটি বা লিঙ্গ সমতা বা নারীর ক্ষমতার বিষয়টিকে আমরা নিয়ে এসেছি বিধায় এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রান্তিক নারীদের প্রত্যেকটি পরিবারে নারী-পুরুষ, বাবা-মা, ছেলেমেয়ে সবাই এখন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আমরা যারা গবেষণা করি, ফিল্ড ওয়ার্ক করি সে জায়গা থেকে বলতে পারি যে, কামরাঙ্গীরচরে গেলে দেখা যাবে যারা আমাদের গার্হস্থ্য কর্মী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী তাদের পরিবারে ছেলে এবং মেয়ে সন্তান সবাই কাজ করছে। তাদের অনেকেই এখন কামরাঙ্গীরচরে ৭ থেকে ১০ হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে ফ্ল্যাটে বসবাস করে। এখন কিন্তু বস্তের ঘর, মাটির ঘরে প্রান্তিক কর্মীরা বসবাস করে না। আগে যেটি ছিল যে একটি পরিবারে ছেলে অথবা ভাই একাই কাজ করছে এখন তাদের সাথে সাথে স্ত্রী, মেয়ে বা বোনেরাও কাজ করছে। ফলে তারা সবাই শেয়ার করে সেই দশ হাজার টাকা দিয়ে একটা ফ্ল্যাটে থাকতে পারছে। আমি একদম ফিল্ড থেকে ছোটো কালেক্ট করে বলছি এবং এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাড়িতে বিশেষে আমরা যেমন স্টুডিও বলি বা ওয়ান রুম অ্যাপার্টমেন্ট বলি তাদের বাড়িতে গেলে দেখা যায় তাদের সোফা সেট আছে, খাট আছে, ওয়াল টিভি আছে আর মোবাইল তো সবার হাতে হাতে।

শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে হলে প্রথমে শিক্ষাকে আধুনিক প্রগতিশীল ধারায় নিতে হবে। আমার মতে আধুনিক এবং প্রগতিশীল ধারার ব্যাখ্যা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক, স্বাধীনতার চেতনাভিত্তিক এবং আমাদের যে মূল চারটি নীতি- তার ওপর ভিত্তি করে আসতে হবে। সেখানেই আসবে আমাদের নারীদের অবস্থান। আমি চাই সেরকম শিক্ষাব্যবস্থা হোক এবং যে শিক্ষা হবে কূপমণ্ডূকতা বর্জিত কুসংস্কার বর্জিত, ধর্মীয় গোঁড়ামি বর্জিত এবং নারীর প্রতি বিরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ বাদ দিয়ে শিক্ষাকে যুগোপযোগী, বৈশ্বিক এবং স্মার্ট করতে হবে।

শুধু তাই নয়, আমি কোনো অর্থনীতিবিদ নই, অর্থনীতির কোনো ডেটায়ও যাবো না, শুধু আমি বলবো যে দেখুন আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেখা যেতো আমাদের বাড়িতেই গ্রামের গরিব আত্মীয়রা এসে বলতো পেটেভাতে রাখেন, বেতনও দেয়া লাগবে না। এখন ১০ হাজার টাকা দিয়েও একজন পূর্ণাঙ্গ গার্হস্থ্য কর্মী পাওয়া যাবে না। কারণ তারা এখন প্রাইভেট, পাবলিক, আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং কাজ করছে।

আমি বলবো প্রান্তিক পর্যায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও নারীরা ব্যাপক অবদান রাখছে। এনজিওগুলো নারীদের নানা ধরনের কর্মের একটা জায়গা তৈরি করে দিয়েছে। প্রাইভেটাইজেশন নিয়েও একটা বিতর্ক আছে, এই প্রাইভেটাইজেশন হওয়ার ফলে কিন্তু এত সুযোগ তৈরি হয়েছে যে আমাদের নারীরা ঘরে বসে নেই। এখানে এনজিওদের একটা কন্ট্রিবিউটিভ রোল আছে।

তারপর ডিজিটালাইজেশন বিশেষ করে মোবাইল ফোন কোনো না কোনোভাবে নারীদের ক্ষমতায়িত করেছে, বিশেষত উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। করোনাকালীন সময়ে দেখেছি অনেক নারীরা অনলাইন বিজনেস শুরু করেছে। আমার হলের মেয়েরাও অনলাইন বিজনেস করে। এখন তো ভোগবাদী অর্থনীতি। বাজার অর্থনীতিতে যেভাবে ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতির আবেদন আছে একইভাবে আজকের বর্তমান যুগের বাচ্চারা যেসব খাবার খেতে চাচ্ছে আমাদের নারীরা গুগল সার্চ করে কোন রান্নাটি কীভাবে করতে হয়, কোন রেসিপিটা কীভাবে করতে হবে তারা সব শিখে এ ধরনের খাদ্যপণ্য বাজারজাত করছে। ফলে উদ্যোক্তা নারীদের একটা প্রয়োজনও তৈরি হচ্ছে। এখানে বিনিয়োগের জায়গাটা খুব অল্প, বেশি পরিমাণ পুঁজি দিতে হচ্ছে না।

এখন আসি রাজনীতিতে। রাজনীতি একটি পুরুষতান্ত্রিক বলয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই বলয়টাকে ভেঙে ফেলেছেন। তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, শিক্ষামন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নারীদেরকে এনেছেন। যেকোনো ফর্মে আমাদের বাবা-মা দুজনের নাম লিখতে হচ্ছে। হাইকোর্টও বলেছে সন্তানের অভিভাবক হিসেবে বাবা-মা দুজনেই অভিভাবকত্ব থাকবে এবং তৃতীয় নারীদের তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমি দেখেছি আমাদের ভাষা কন্যারা একুশে ফেব্রুয়ারিতে পুরস্কৃত হন না। কারণ ঐতিহাসিকভাবে তাদের ওপর কোনো বর্ণনা নেই, ইতিহাসে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সে দৃশ্যটি অদৃশ্যমান থেকে যায়। প্রধানমন্ত্রী সে জায়গাটাও নিয়ে এসেছেন। তারপর বৃদ্ধ ভাতা, শিক্ষা বৃত্তি, উপবৃত্তি যে কারণে মেধাবী মেয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে ছেলে শিক্ষার্থীরা পারছে না।

আরেকটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ সেই- সমাজের বক্রদৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী ক্রিকেট, ফুটবলে নারীদের নিয়ে এসেছেন। এই নারী খেলোয়াড়রা আমাদের জন্য সোনা-রুপা সব জিতে আনছে। সুতরাং আমরাও বলছি কেন্দ্র থেকে প্রান্তে, প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে সর্বত্রই নারীরা এগোচ্ছে। নারীর অগ্রসরমানতার অর্থই হচ্ছে অর্থনীতিকে সচল করা এবং এটাই হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশের চিত্র।

প্রত্যয় : আপনার দৃষ্টিতে বর্তমান বাংলাদেশে নারী সমাজের প্রধান প্রধান সমস্যা কি? স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় নারীদের জন্য আর কি কি উদ্যোগ নেয়া উচিত বলে মনে করেন?

ড. জিনাত হুদা : বাংলাদেশে নারীদের বিরোধী শক্তি হচ্ছে মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, ধর্মীয় কুসংস্কার। সমাজে ধর্মান্ধ একটি গোষ্ঠী ধর্মের প্রকৃত বিষয়টিকে ব্যাখ্যা না করে নারীকে অবগুণ্ঠন অবস্থায় রাখতে চায়। তারা মনে করে নারীরা ক্লাস ফোরের বেশি পড়বে না, নারীরা হচ্ছে পণ্য, নারীদেরকে তেঁতুলের সাথে তুলনা করা হয়। এই শক্তিটিও নারী উন্নয়ন ধারার সাথে সমান্তরাল একটি অপশক্তি। এটি আমাদের একটি বিশাল বাধা। আরেকটি বাধা হচ্ছে সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের বিষয়টি। নারীর সম্পত্তি পাবার যে অধিকার, সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার আইনটি এখনো একই অবস্থায় আছে।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একটি পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে এসব ধর্মীয় উগ্রবাদী শক্তি এবং কিছু রাজনৈতিক দলের বাধার কারণে এটি এগোতে পারেনি। অনেকে বলে এটি ধর্মীয় অবমাননা। অবমাননার বিষয়টি আমরা শুধু নারীর ক্ষেত্রেই নিয়ে আসি। এখানে পারিবারিক মুসলিম আইন পরিবর্তন করেছিলেন আইয়ুব খান। পৃথিবীর বহু দেশে সংস্কার এসেছে, সংস্কার হচ্ছে। আর কেউ ধর্মীয় আইন কিন্তু পরিবর্তন করতে বলেনি বরং ধর্মীয় আইন বহাল রেখেই এটি সংযোজিত হতে পারে যে, কোনো বাবা যদি চায় তার ছেলে এবং মেয়ে সন্তানকে সমান সম্পত্তি দিতে চান তিনি সেটা দেবেন। এখন ছেলে যা পায় তার অর্ধেকটা পায় মেয়ে। এখানে যুক্তিটা হলো ছেলেরা বাবা-মাকে দেখবে।

ইতিমধ্যে আমি যে উদাহরণগুলো দিয়েছি এখন তো মেয়েরা বাবা-মাকে দেখছে, ইনকাম করছে, আমার রোকেয়া হলের অনেক হাউস টিউটর আছেন যাদের সাথে তাদের বাবা-মায়েরাই থাকেন এবং তাদের মধ্যে অনেকে অবিবাহিত আছেন। ইনকামের দিক দিয়ে পারিবারিকভাবে এই জিনিসগুলো হচ্ছে। সুতরাং এখানে কোনো বাধা নেই।

আমি মনে করি না যেকোনো ধর্মই নারীর অগ্রসরমানতাকে রুদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। এটি একটি অপব্যাখ্যার বিষয় বলেই মনে করি। সুতরাং ধর্মকে ধর্মের জায়গায় রেখে নারীর অধিকারগুলোকে অধিকারের জায়গায় রেখে আমরা কিন্তু এই বিষয়গুলোকে একটা সঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি বা সমন্বয় করতে পারি। সুতরাং এই সমস্যা দুটোকে আমরা যদি সমাধান করতে পারি তা হলে আমাদের সমাজটা আরো এগিয়ে যাবে।

প্রত্যয় : বর্তমানে নারীরা ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্যোক্তাসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। কর্মক্ষেত্রকে নারীবান্ধব রাখার ব্যাপারে আপনার প্রত্যাশা জানতে চাচ্ছি।

ড. জিনাত হুদা : প্রথমত, কর্মবান্ধব করার জন্য যেটা দরকার তার মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের এখানে কর্মস্থলগুলোকে প্রথমত নারীবান্ধব করতে হবে, কর্মবান্ধব করতে হবে। কর্মবান্ধব করতে হলে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে হবে। নারীকে কম হিসেবে গ্রহণের মানসিকতা থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, কিছু নতুন নিয়ম-কানুন করতে হবে। যেমন আমি বিভিন্ন জায়গায় দেখি ন্যূনতম একটা ওয়াশ রুম নেই। নারীদের জন্য বসে একটু খাবারের জায়গা থাকে না, একটু বসে গল্প করার জায়গা থাকে না। এগুলো আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। আমি ইসলামী ইউনিভার্সিটি গাজীপুরে পড়িয়েছি। নারী শিক্ষার্থী ছিল না। যেদিন আমি ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করছি তখন আমি গেটম্যানদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হই। কেন? গেটম্যান বলছে এই ইউনিভার্সিটিতে নারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। সাথে আমার স্বামী ছিলেন তিনি বললেন, সে তো নারী না, অধ্যাপক। সেখানে গিয়ে আমি দেখলাম নারীর জন্য বসার একটা সুস্থির, সুন্দর পরিবেশ, একটা ওয়াশ রুম ব্যবহার করার কিছুই ছিল না। এটা আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। হয়তো এখন পরিবর্তন এসেছে। নারীর জন্য একটা ওয়াশ রুম, সিটিং রুম, কমন রুম এগুলো থাকতে হবে। এটি নারী-পুরুষ সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। কিন্তু আমাদের মতো পিছিয়ে পড়া সমাজে আমাদের কিছু মূল্যবোধ আছে, সামাজিক সংস্কার আছে, লজ্জার বিষয় আছে, রুচি বোধের বিষয় আছে। সারা পৃথিবীতে যেমন টয়লেট, উইমেন টয়লেট থাকে, সুতরাং এগুলো থাকতে হবে।

তৃতীয়ত, নারীর প্রতি নানা ধরনের কুৎসিত দৃষ্টিভঙ্গি, কুৎসিত বক্তব্য প্রদান, টিজ করা অর্থাৎ হ্যারাজমেন্ট করা। সেটা ভারবাল হ্যারাজমেন্ট হতে পারে, সেক্সুয়াল হ্যারাজমেন্ট হতে পারে– এই বিষয়গুলোতে খুব গভীরভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্সুয়াল হ্যারাজমেন্ট কমপ্লেইন কমিটির চিফ এবং আমি এটির আহ্বায়ক। সেখানে আমি শিক্ষকদের নিয়োগ মুহূর্তে একটা ক্লজ যুক্ত করেছি যে, যখন আমি জয়েন করবো আমি কখনো নারী বিরোধী বা নারী-পুরুষ সবার সাথে কোনো হ্যারাজমেন্ট, বুলিং এই ধরনের কোনো কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম না এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের কোনো কাজের সাথে সম্পৃক্ত হবো না। যদি হয়ে থাকি তা হলে প্রতিষ্ঠান চাকরিচ্যুতির মতো যেকোনো পদক্ষেপ নিতে পারবে, সব প্রতিষ্ঠানেই এটি থাকা উচিত। আমার মনে হয় সার্বিকভাবে এই বিষয়গুলোকে নিয়ে এলে কর্মস্থলের অবস্থাটা অনেক বেটার হবে।

অনেক ক্ষেত্রে বিশেষত প্রান্তিক পর্যায়ে দেখা যায় আমরা নারীকে মজুরিটা ঠিক মতো দিতে চাই না, নারীকে বৈষম্যের শিকার করি। তারপর এখন তো শুধু ম্যাটারনিটি লিভ আছে আমরা প্যাটারনিটি লিভেরও দাবি করছি। কারণ, সংসার তো শুধু মায়ের না, বাচ্চাও শুধু মায়ের না সুতরাং প্যাটারনিটি লিভও কর্মস্থলে থেকে আনতে হবে।

প্রত্যয় : দেশে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখায় প্রান্তিক নারীরা আত্মকর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ভূমিকা রাখছে। নারীর ক্ষমতায়নে এই কার্যক্রমকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

ড. জিনাত হুদা : আমাদের মায়েরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত না গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করে। প্রথমত বলি যারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ করছেন না, গৃহের কাজ করছেন– তারা হলেন হোম ম্যানেজার। তাদের কি আমরা পর্যাপ্ত সম্মানী দিচ্ছি? এই হোম ম্যানেজমেন্টে যারা আছেন আমাদের মা, দাদি, বোন তাদেরকে প্রাপ্য সম্মানী দিতে হবে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রীর শরণাপন্ন হচ্ছি– তিনি বলেছেন যে, 'বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মাকে যদি কেউ পরিত্যাগ করে তা হলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।' আমরা বৃদ্ধাশ্রম করছি বটে কিন্তু সেটা সংস্কৃতিগতভাবে এখনো গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও বৃদ্ধাশ্রম গড়ে ওঠেনি। সুতরাং এখানে সন্তানদেরকে বলতে হবে যে বাবা-মা'র দায়-দায়িত্ব নিতে হবে এবং তাদের যে প্রাপ্য সম্মান সেটি কি করে দিয়ে আসতে পারি আমার মনে হয় এ ব্যাপারে একটা গবেষণা, বিশদ আলোচনা এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে যেটি প্রধানমন্ত্রী করছেন সমান্তরালে সেকটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা। এই বিষয়গুলো নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে নিয়ে আসতে পারলে নারীর ক্ষমতায়ন বা নারীর প্রতি মর্যাদার বিষয়টা আরো পোক্ত হবে। তবে বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলো প্রান্তিক পর্যায়ের নারীদের কর্মোদ্যোগের ব্যবস্থা করে দিয়ে তাদের ক্ষমতায়ন করেছে, তাদেরকে জাতীয় উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। যা বাংলাদেশকে আজ স্থিতিশীল উন্নয়ন এনে দিয়েছে।

প্রত্যয় : আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য শিক্ষক ও গবেষক। আপনার দৃষ্টিতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কি ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন। নারী শিক্ষার বৃদ্ধিতে কি উদ্যোগ নেয়া যায় বলে মনে করেন?

ড. জিনাত হুদা : আমি ইতিমধ্যে বলেছি, শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হলে প্রথমে শিক্ষাকে আধুনিক প্রগতিশীল ধারায় নিতে হবে। আমার মতে আধুনিক এবং প্রগতিশীল ধারার ব্যাখ্যা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক, স্বাধীনতার চেতনাভিত্তিক এবং আমাদের যে মূল চারটি নীতি– বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে আনতে হবে। সেখানেই আসবে আমাদের নারীদের অবস্থান। আমি চাই সেরকম শিক্ষাব্যবস্থা হোক এবং যে শিক্ষা হবে কূপমণ্ডূকতা বর্জিত কুসংস্কার বর্জিত, ধর্মীয় গোঁড়ামি বর্জিত এবং নারীর প্রতি বিরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ বাদ দিয়ে শিক্ষাকে যুগোপযোগী, বৈশ্বিক এবং স্মার্ট করতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়া কোনোদিন সম্ভব না যদি নারীর অধিকারের জায়গাটিতে আরো সুবিচার করা না হয়। নারীর উন্নয়নে বাংলাদেশ রোল মডেল। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে আরো এগিয়ে যেতে হবে।

আমি এভাবে উদাহরণ দেই যে, মেট্রোরেলে শুধু পুরুষরাই চড়বে না– নারী, শিশু, ভাইবোন, প্রান্তিক মানুষ সবাই চড়বে তখনই হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। স্মার্টনেস মানেই হচ্ছে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, সমান অংশীজন, সবার উপস্থিতি।

প্রত্যয় : সম্প্রতি একটি বিল পাস হয়েছে যে সবার জন্য পেনশন। এটাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

ড. জিনাত হুদা : আমি অত্যন্ত প্রশংসা করি যে, এটি একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ইনক্লুসিভ এবং মানবাধিকারভিত্তিক সিদ্ধান্ত। এটা সব মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করবে। পেনশন মানে এটি শুধু পুরুষদের জন্য না এটি মা-বাবা, ভাই-বন্ধু, অবসরপ্রাপ্ত, অক্ষম, তৃতীয় লিঙ্গ, ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য সমান। এটি একটি কল্যাণকামী পদক্ষেপ এবং আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।■

ফরিদা ইয়াসমিন

সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাব

নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে

বাংলাদেশের সাংবাদিকতা জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন এর জন্ম ১৯৬৩ সালের ১ জুন নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার দৌলতকান্দি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। পিতা সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া এবং মা জাহানারা হোসেন। ৫ বোন এবং ৪ ভাইয়ের মধ্যে তিনি সবার বড়। তিনি নরসিংদী জেলার শিবপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি, ইডেন কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে ১৯৯০ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওকলহোমা ইউনিভার্সিটি থেকে সাংবাদিকতায় উচ্চারণ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

ফরিদা ইয়াসমিনের সাংবাদিকতার শুরু ১৯৮৯ সালে বাংলার বাণী পত্রিকার মাধ্যমে। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরতাবস্থায় তিনি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনে কাজ করতেন। বাংলার বাণী ছাড়াও তিনি মুক্তকণ্ঠে কাজ করেছেন। ১৯৯৯ সাল থেকে তিনি দৈনিক ইত্তেফাকে কর্মরত আছেন। ২০০১ সালে তিনি প্রেসক্লাবের সদস্যপদ লাভ করেন। ২০১২, ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে জাতীয় প্রেসক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবের নির্বাচিত সভাপতি।

স্পষ্টবাদী ফরিদা ইয়াসমিন সাউথ এশিয়ান ওমেনস মিডিয়া ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি। ফরিদা ইয়াসমিনের স্বামী বাংলাদেশ প্রতিদিন এর সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক নঈম নিজাম। এই সাংবাদিক সম্পতির এক ছেলে মাহির আবরার এবং এক কন্যা নুজহাত পূর্ণতা।

ফরিদা ইয়াসমিন বেশ কিছু বই লিখেছেন। এর মধ্যে 'ভাষা আন্দোলন ও নারী', 'উজ্জ্বল নারীর মুখোমুখি', 'ইতিহাসের আয়নায় বঙ্গবন্ধু' অন্যতম। সাংবাদিকতা ও লেখক হিসেবে তিনি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ পদক, উইমেন লিড দ্য নেশন পুরস্কার ও জাতীয় প্রেসক্লাব লেখক সম্মাননা লাভ করেছেন। প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে বিশিষ্ট সাংবাদিক জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

প্রত্যয় : স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে দেশে যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তার পেছনে নারী সমাজের ভূমিকা কতোখানি বলে আপনি মনে করেন?

ফরিদা ইয়াসমিন : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা ব্যাপক বলে আমি মনে করি। রেমিটেন্সের প্রধান খাত গার্মেন্টস সেক্টরের ৮০ ভাগ কর্মীই নারী। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রপ্তানি খাতে যে বিশাল রেমিটেন্স আসছে এর সিংহভাগই নারীর অর্জন। গত পাঁচ বছরের মধ্যে কিংবা তারও আগে থেকেই অর্থাৎ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথমবার ক্ষমতায় এসে তিনি প্রথম যে কাজটি করেছেন সেটি হলো সন্তানদের পরিচয় সূত্রে মায়ের নাম বাধ্যতামূলক করেছেন, স্বীকৃতি দিয়েছেন। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নিঃসন্দেহে এটি একটি বিশাল অর্জন। নারী যে সন্তান জন্ম দিয়েছে সেখানে সন্তানদের অফিসিয়াল পরিচিতিতে পূর্বে তার কোনো স্বীকৃতি ছিল না। এটি নারীদের জন্য অনেক বড় সম্মান।

২০০৮ সালের নির্বাচনে দ্বিতীয়বার যখন তিনি ক্ষমতায় আসেন তখন তিনি তৃণমূল পর্যায়ে নারীকে ক্ষমতায়িত করেছেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে তিনটি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন। যেটি ভোটের মাধ্যমে শুধু নারীরাই নির্বাচিত হতে পারবে এবং উপজেলা পর্যায়ে ভাইস চেয়ারম্যান পদ। এই যে তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন এটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই এসেছে।

একটা সময় ছিল যখন নারীরা নির্বাচন কেন্দ্রে ভোট দেয়ার প্রস্তুতি নিত, তখন স্বামীরা বলতেন, তুমি বাসায় থাকো আমি যাই। কিন্তু এখন নারীরা তাদের অধিকার এবং ক্ষমতার কথা বুঝতে শিখেছে। আমি বলবো, একটা সময় সমাজের অর্ধেক অংশ নারীরা অনেক পিছিয়ে ছিল। এই নারী সমাজ এগিয়ে আসার ফলে বর্তমানে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, ম্যাজিস্ট্রেসি, পুলিশ, কল-কারখানাসহ সব জায়গাতে নারীদের পদচারণা লক্ষণীয়। নারীরা এগিয়ে আসছে বলেই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগে শুধু শিক্ষা এবং সেবা খাতে নারীরা কর্মরত ছিল, কিন্তু এখন সব ক্ষেত্রে মেয়েরা কর্মে নিয়োজিত। এমনকি বৈমানিক ও ট্রেন চালক হিসেবেও নারীদের দেখা যাচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন সূচকে অন্যান্য অনেক দেশের থেকেও বাংলাদেশ এগিয়ে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসে যে ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা দিয়েছিলেন, আমি মনে করি সেটি সফল হয়েছে। এখন তিনি বলছেন আর্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কথা। আর্ট বাংলাদেশের জন্য নারীদেরকে সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা যে ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশের কথা বলছি, সেখানে নারীদেরকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে আরো বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে। তাদেরকে পিছিয়ে থাকলে চলবে না। নারীর ক্ষমতায়ন শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নয়। নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে তার কর্ম ও মতামতের যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া। নারী যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে, তখন তারা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন হয়েছে, স্বাবলম্বী হচ্ছে, সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে। ঘরে-বাইরে সর্বত্র মানুষ হিসেবে নারী আজ মূল্যায়িত হচ্ছে।

প্রত্যয় : আপনি দেশখ্যাত একজন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি। অতীত এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে মিডিয়ায় নারীদের অবস্থান তুলে ধরবেন কি? এটি সামাজিক উন্নয়নে কতোটা প্রভাব ফেলছে?

ফরিদা ইয়াসমিন : সাংবাদিকতা একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। আগে মেয়েরা এ পেশায় উল্লেখযোগ্য হারে আসত না। তারা মনে করত, রাত-দিন মাঠে-ময়দানে অফিস-আদালতে কাজ করতে হবে এবং সমাজও তাকে নিরুৎসাহিত করত। কিন্তু সমাজ এখন নারীদেরকে কাজের ক্ষেত্রে আর বাধা দিচ্ছে না। নারীরা আগে যখন সাংবাদিকতা পেশায় আসতো, তখন ছেলেই কাজ করতো বেশি। রিপোর্টিংয়ে অতোটা ছিল না। কিন্তু গত দেড় দশকের মধ্যে যখন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যাত্রা শুরু হলো, তখন নারীর কাজটা দৃশ্যমান হলো যে, মেয়েরা রাত-বিরাতে রিপোর্টিং করতে পারছে, তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে নিউজ পাঠাচ্ছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আগুন লাগা কিংবা বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা যে কোনো জায়গা থেকেই তারা নিউজ পাঠাতে পারছে। তার মানে মেয়েরা যে সাংবাদিকতা পেশার কাজটি পেশাগত নৈপুণ্যে ভালোবেসে করতে পারছে সেটি আজ প্রমাণিত।

যেকোনো অগ্রগতিতে সামাজিক উন্নয়নে প্রভাব পড়ে। মানুষের মধ্যেও মনস্তাত্ত্বিক একটা প্রভাব পড়ে যে মেয়েরা যদি কাজ করতে পারে, আমার মেয়েটা কেন পারবে না? তাদের মধ্যে একটা উৎসাহ-উদ্দীপনা কাজ করে আমার মেয়েটা বাইরে কাজ করতে পারবে। এগুলো অবশ্যই নারীর অগ্রগতিতে একটি ইতিবাচক প্রভাব।

প্রত্যয় : বর্তমানে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির আলোকে একজন নারী মিডিয়া কর্মীকে প্রধানত কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়? সমস্যা সমাধানে আপনার পরিকল্পনা কি?

ফরিদা ইয়াসমিন : আমি যে এখানে এই প্রেসক্লাবে নেতৃত্ব দিচ্ছি এখানে ৭০ জন নারী সদস্য রয়েছেন। সারা দিনে তো কেউ আসেই না সারা বছরে ১০ জন আসে কি না সন্দেহ। ক্লাবের মেম্বার হওয়ার জন্য সবাই অস্থির কিন্তু ক্লাবের কার্যক্রমে কাউকে পাওয়া যায় না। আমি তাদের খাটো করে বলছি না। বলছি

সাংবাদিকতা একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। আগে মেয়েরা এ পেশায় উল্লেখযোগ্য হারে আসত না। তারা মনে করত, রাত-দিন মাঠে-ময়দানে অফিস-আদালতে কাজ করতে হবে এবং সমাজও তাকে নিরুৎসাহিত করত। নারীরা আগে যখন সাংবাদিকতা পেশায় আসতো, তখন ছেলেই কাজ করতো বেশি। রিপোর্টিংয়ে অতোটা ছিল না। কিন্তু গত দেড় দশকের মধ্যে যখন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যাত্রা শুরু হলো, তখন নারীর কাজটা দৃশ্যমান হলো যে, মেয়েরা রাত-বিরাতে রিপোর্টিং করতে পারছে, তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে নিউজ পাঠাচ্ছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আগুন লাগা কিংবা বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা যে কোনো জায়গা থেকেই তারা নিউজ পাঠাতে পারছে। তার মানে মেয়েরা যে সাংবাদিকতা পেশার কাজটি পেশাগত নৈপুণ্যে ভালোবেসে করতে পারছে সেটি আজ প্রমাণিত।

তাদের মধ্যেও ক্লাবের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ইচ্ছা থাকা উচিত। এতে তাদের অস্তিত্ব আরো দৃশ্যমান হবে। আরেকটি বিষয় মিডিয়াতে নারী কিংবা পুরুষ সবাই মিডিয়া কর্মী হিসেবে বিবেচিত– এখানে লিঙ্গবৈষম্য নেই বললেই চলে।

প্রত্যয় : এর কারণ কি বলে মনে হয়?

ফরিদা ইয়াসমিন : কারণ, তারা অধিকাংশে সময় বাড়িতে ব্যস্ত থাকেন। মনে করেন যে, খুব বেশি কাজ না থাকলে ক্লাবে এসে কী করব বরং যাদের বাড়িতে পরিবার আছে সেখানে সময় দেয়াটাই ভালো। ছেলেদের যেমন আগ্রহ থাকে কোনো একটা প্রোগ্রাম হলে তারা বলে আপা এখানে আমি থাকতে চাই, আমাকে রাখবেন– মেয়েদের বেলায় দেখি তারা খুবই নিরুৎসাহী। এর ফলে ক্লাব পর্যায়ে সভাপতি হিসেবে আমি মূলত ছেলেদেরকেই নেতৃত্ব দেই। নারীদের খুব একটা কাছে পাই না।

বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক যে প্রেক্ষাপট এখানে মিডিয়া কর্মীরা

আলাদা কোনো সমস্যা নয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সব নারীকেই যে ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়, একজন মিডিয়া কর্মীকেও সে ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। তবে মিডিয়া কর্মীর বেলায় একটু আলাদা। কারণ মিডিয়া কর্মীকে অনেক রাতে কাজ করতে হচ্ছে, অনেক রাতে তাকে বাসায় না গিয়ে কোনো অ্যাসাইনমেন্টে যেতে হচ্ছে। এখানে তার কাজের একটা নিরাপদ পরিবেশ দরকার।

আমি মনে করি, যে অফিসে তারা কাজ করছে সে অফিসের পরিবেশটা নারীবান্ধব হতে হবে। রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা দিতে হবে। অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করে বাড়ি ফিরলে নিরাপদে যাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে হবে। সব মেয়েদেরকেই আমি একটি কথা বলতে চাই যে, সমস্যা সব ক্ষেত্রেই আছে, এটাকে মেনে নিয়েই নিজের যোগ্যতা দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে হবে। এই পরিবেশের সাথে কীভাবে খাপ খাইয়ে চলতে হবে, কীভাবে নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারবে সেটা তাকেই ভাবতে হবে এবং সে অনুযায়ী তাকে প্রস্তুতি নিয়ে এগোতে হবে।

প্রত্যয় : একটি দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য অনেক বড় অন্তরায়। এ সুযোগ আছে? এ ক্ষেত্রে সরকার কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে?

ফরিদা ইয়াসমিন : নারীর ভাবনাকে, নারীর সৃজনশীলতাকে মূল্যায়ন করতে হবে। বেশি বেশি প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রযুক্তিতে নারীদেরকে দক্ষ করে তুলতে হবে। আগামী বিশ্ব হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের বিশ্ব। সবকিছুই হবে কম্পিউটারাইজড। এক্ষেত্রে মেয়েরা পিছিয়ে থাকলে স্মার্ট বাংলাদেশ সফল হবে না। শহরাঞ্চল থেকে প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত নারীদেরকে প্রযুক্তির বলয়ে আনতে হবে।

প্রত্যয় : বর্তমানে নারীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্যোক্তাসহ মিডিয়া ও সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। কর্মক্ষেত্রকে নারীবান্ধব রাখার ব্যাপারে আপনার প্রস্তাবনা জানতে চাচ্ছি।

ফরিদা ইয়াসমিন : হাইকোর্ট থেকে একটা প্রস্তাবনা আছে যে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে একটি যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সেল করার জন্য। অন্যান্য অনেক জায়গায় থাকলেও মিডিয়াতে এটি নেই। যেসব প্রতিষ্ঠানে মেয়েরা বেশি আছে সেখানে মেয়েদের জন্য একটা কর্নার করা উচিত যাতে বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিডিং করানো যায়। মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেট থাকা দরকার। এগুলো হলে মেয়েরা কাজের প্রতি আরো বেশি উৎসাহী হবে।

নারীর ক্ষমতায়নের মূল উপাদানগুলো হচ্ছে নারীকে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে জানতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে। বিভিন্ন কাজ-কর্মের মাধ্যমে নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন বাড়বে। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সরকার নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সবসময় রাজনৈতিক সদিচ্ছা পোষণ করেন। এ জন্য নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছেন।

সমস্যাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করছেন? সমস্যার আদিকে আপনার প্রস্তাবনা কি?

ফরিদা ইয়াসমিন : আমরা একটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বাস করি। এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজটাই লিঙ্গবৈষম্যমূলক সমাজ। আমি বলবো, এখানে পুরুষকে প্রাধান্য দেয়া হয়, একটা পরিবারে ছেলেকে প্রাধান্য দেয়া হয়; মেয়েরা সে অনুযায়ী প্রাধান্য পায় না। এই বৈষম্য দূর করার প্রথম পদক্ষেপটি নিতে হবে পরিবারকে। পরিবারে যখন একটি ছেলে ও মেয়ে বড় হয় তখন তাদের বোঝাতে হবে যে, তুমি আর তোমার বোন একই সমান। যদিও বর্তমানে এই বিষয়গুলোর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পরিবারের সাথে সাথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও একটি বড় ভূমিকা আছে যে ছেলেমেয়েদেরকে আলাদা করে না দেখা। আমি জানি অনেক মেয়েরা স্কুলে ফুটবল খেলতে চায় কিন্তু তাদেরকে নিরুৎসাহিত করা হয় যে ফুটবল খেলা তোমাদের জন্য না। এই মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

প্রত্যয় : স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় নারীদের কোন কোন ক্ষেত্রে অবদান রাখার

প্রত্যয় : নারীর ক্ষমতায়নে মূল উপাদানগুলো কী কী? বাংলাদেশে এই উপাদানগুলোর বাস্তবায়নে এখনও কতটুকু ঘাটতি রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

ফরিদা ইয়াসমিন : নারীর ক্ষমতায়নের মূল উপাদানগুলো হচ্ছে নারীকে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে জানতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে। বিভিন্ন কাজ-কর্মের মাধ্যমে নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন বাড়বে। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সরকার নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সবসময় রাজনৈতিক সদিচ্ছা পোষণ করেন। এ জন্য নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছেন।

সবশেষে আমি বলবো যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেহেতু নারীবান্ধব, সবসময় নারীর ক্ষমতায়ন চান, নারীদের জন্য যেখানে বিশেষ বিশেষ সুযোগ তৈরি করছে তা হলে বাংলাদেশের নারীদের ভয় কিসের? নারীদের নিজের উদ্যোগ, চেষ্টা আর ইচ্ছাশক্তি থাকতে হবে তা হলেই তিনি এগিয়ে যাবেন।

প্রণতি রানী দাস

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক লি.

এনজিওদের কার্যক্রমে গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন হচ্ছে

প্রণতি রানী দাস। সোনালী ব্যাংক রমনা কর্পোরেট শাখার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে শাখা প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় শাখার প্রধান ছিলেন। প্রণতি রানী দাসের বাড়ি মাদারীপুরের কালকিনীর খাসিয়াভলা। তার পিতা গরেশ চন্দ্র দাস এবং মা অঞ্জলী রানী দাস। স্বামী ড. রাকেশ্যাম সরকার। ছাত্রী হিসেবে মেধাবী প্রণতি রানী দাস জংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৮২ সালে এসএসসি, বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ থেকে ১৯৮৪ সালে এইচএসসি এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে পোলট্রি সায়েন্সে বিএসসি (অনার্স) এবং ১৯৯২ সালে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন।

অধ্যয়ন শেষে তিনি ১১ মাস প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে পোলট্রি এক্সটেনশন অফিসার হিসেবে চাকরি করেন। পরে ১৯৯৩ সালে কৃষিবিদ হিসেবে সোনালী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার পদে যোগদান করেন। শুরুতে প্রধান কার্যালয়ের রুরাল ক্রেডিট ডিভিশনে (আরসিডি) যোগদান করলেও পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন শাখায় কাজ করার সুযোগ পান। শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে তিনি পিএটিসি শাখা, সাভার, গণভবন শাখা ও জাতীয় সংসদ ভবন শাখা, ঢাকার দায়িত্ব পালন করেন। প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে ব্যাংকার ব্যক্তিত্ব প্রণতি রানী দাস যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

এ দেশের নারী সমাজ শত শত বছর ধরেই ছিল ক্ষমতাহীন। বিশেষ করে পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা গৃহকর্ম ছাড়া অন্য কাজের সাথে যুক্ত ছিল না। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর নারীরা উৎপাদন কর্মের সাথে জড়িত ছিল কিন্তু তারা সংখ্যায় খুবই অল্প। মূলধারার বাঙালি যে নারী সমাজ তাদের মধ্যে শিক্ষিত অল্প কিছু নারীকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ চিকিৎসা পেশায় নার্সিংয়ে দেখা যেতো।

প্রশ্ন : আপনি দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সোনালী ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে ব্যাংকিং পেশার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী সমাজের অবদান কতোটা বলে আপনি মনে করেন?

প্রণতি রাণী দাস : দেখুন, বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকেই মূলত দেশে নারীদের কর্মপ্রয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার সুযোগ পেয়েছে। আমি মনে করি, স্বাধীনতা অর্জনটাই হচ্ছে আমাদের জন্য যুগান্তকারী অর্জন। আবার এই অর্জনে এ দেশের নারী সমাজকে যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোনো দেশে তা ঘটেনি। আমরা জানি ৩০ লাখ শহিদের রক্ত ও কয়েক লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির মাধ্যমে রীতিমতো যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বলা যায়, সেই বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে প্রতিটি আন্দোলন- সংগ্রামে এ দেশের শিক্ষিত সচেতন নারীরা সরাসরি অংশ নিয়েছে এবং পিছিয়ে থাকা নারী জনগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, খাদ্য ও সেবা দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনে বিশাল ভূমিকা রেখেছে।

স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সংবিধান আমাদের উপহার দিয়েছেন সেখানে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার সংযোজিত হয়েছে। তারই ভিত্তিতে স্বাধীন দেশে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি লক্ষণীয়। পাকিস্তান আমলে নারী শিক্ষার হার যেখানে ৫% এরও নিচে ছিল বর্তমানে এই হার ৭৫% এরও উপরে। নারীরা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বশীল পদে কাজ করছেন। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনীসহ পুলিশ, আনসার বাহিনীতেও হাজার হাজার নারী কঠিন এসব পেশাতে দায়িত্ব পালন করছেন। শুধু তাই নয়, নারীরা শুধু শিক্ষিত নারীরাই নন, গ্রামাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অবস্থান সম্পন্ন নারীরাও এখন উদ্যোক্তা হিসেবে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

এছাড়া বস্ত্র খাতের যে ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে, ওষুধ শিল্পের যে বিকাশ ঘটেছে এসবও নারীর হাত দিয়ে। অন্যদিকে আদিকাল থেকেই বাংলার কৃষক সমাজ মাঠে যে ফসল আবাদ করেন তা বাড়িতে নিয়ে আসার পর নারীরাই তা শস্যে রূপান্তরিত করেন এবং খাদ্য ও বাজার উপযোগী করেন। অর্থাৎ এককথায় দেশের সগৌরব স্বাধীনতা অর্জন থেকে শুরু করে প্রতিটি উন্নয়নে নারী সমাজের অবদান বিশাল। আরও একটি বিষয় না বললেই নয়, দেশের রাজনীতি ও সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রেও এ দেশের নারীদের অবদান উল্লেখ করার মতো।

প্রশ্ন : আপনি পেশাজীবী হিসেবে একজন ব্যাংকার তবে নিজের দিক থেকে নারী। পেশাজীবী হিসেবে আপনি কি কখনো লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হয়েছেন বা নারী হবার কারণে কখনো আপনার মধ্যে হেয় মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে?

প্রণতি রাণী দাস : জি না। আমি ব্যাংকিং পেশায় সাধারণত এরকম বৈষম্য লক্ষ্য করিনি। তবে একসময় মনে করা হতো উনি তো মহিলা, উনি কি এতো গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করতে পারবেন? কিন্তু যখন নারীরা শাখা ব্যবস্থাপক, প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান, অঞ্চল প্রধান কিংবা জিএম-এমডি হলেন, দেখা গেল তারা খুবই দক্ষতার এবং আমি বলবো অধিক গুরুত্বপূর্ণভাবেই দায়িত্ব পালন করেছে এবং এখনো করে যাচ্ছে। এর পেছনে একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারও রয়েছে। একজন নারী জন্মগতভাবেই ধীরস্থির ও হিসেবি। এ জন্য নারীরা ব্যাংকিং পেশায় অধিক ভালো করছেন বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন : দেশে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখায় গ্রামীণ নারীরা আত্মকর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ভূমিকা রাখছে। নারীর ক্ষমতায়নে এই কার্যক্রমকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করছেন?

প্রণতি রাণী দাস : অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা অর্জনই একজন মানুষকে ক্ষমতায়ন করে। এ দেশের নারী সমাজ শত শত বছর ধরেই ছিল ক্ষমতাহীন। বিশেষ করে পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা গৃহকর্ম ছাড়া অন্য কাজের সাথে যুক্ত ছিল না। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর নারীরা উৎপাদন কর্মের সাথে জড়িত ছিল কিন্তু তারা সংখ্যায় খুবই অল্প। মূলধারার বাঙালি যে নারী সমাজ তাদের মধ্যে শিক্ষিত অল্প কিছু নারীকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ চিকিৎসা পেশায় নার্সিংয়ে দেখা যেতো। তবুও পারিবারিক পরিমণ্ডলে তাদের নিজস্ব মতামতের তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না।

স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বিশেষ করে যখন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীরা গার্মেন্টস শিল্পে কাজ করার সুযোগ পায় এবং এনজিও খাতের কার্যক্রম দ্বারা গ্রামীণ নারীদের বিশাল এক অংশ আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থান যেমন হাঁস-মুরগির খামার, গরু-ছাগলের খামার, দোকানসহ অন্যান্য উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন, উদ্যোক্তা হয়েছেন। এভাবে তারা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সক্রিয় থেকে বড় উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছেন–তারাই তখন ব্যাংকে টাকা জমাচ্ছেন বা ব্যাংক ঋণের সুবিধা গ্রহণ করছেন। এই যে অর্থনৈতিক প্রবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে এর মাধ্যমেই বাংলাদেশ আজ ক্রমাগত উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে। আমি মনে করি এতে একদিকে যেমন নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে তেমনই দেশকেও উন্নত দেশে পরিণত করছে।

মাকসুদা চৌধুরী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর, স্টাইলিশ গার্মেন্টস

নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া দেশের উন্নয়ন অসম্ভব

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য অঙ্গনে যেসব নারী উদ্যোক্তা নিজেদের মেধা, শ্রম আর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয়েছেন মাকসুদা চৌধুরী তাদের অন্যতম। তিনি দেশখ্যাত স্টাইলিশ গার্মেন্টস লিমিটেড এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তার স্বামী দেশের তরুণ উদ্যোক্তাদের অন্যতম মো. সালাহউদ্দিন চৌধুরী এই শিল্প গ্রুপের চেয়ারম্যান। এ দেশে খুব কম সংসারেই স্বামী-স্ত্রী দুজনের সমান যোগ্যতা চোখে পড়ে। সেদিক থেকে মাকসুদা চৌধুরী ও তার স্বামী মো. সালাহউদ্দিন চৌধুরী ব্যতিক্রম। দুজনের সম্মিলিত উদ্যোগ ও পরিচালনাতেই স্টাইলিশ গার্মেন্টস লি. এর উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। নারী উদ্যোক্তা ব্যক্তিত্ব মাকসুদা চৌধুরী অত্যন্ত বুদ্ধিমতি ও আত্মপ্রত্যয়ী। তিনি এফবিসিসিআই এর বেশ কয়েকটি উপ-কমিটির সদস্য। তিনি নিজের শিল্প গ্রুপের বাইরেও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভালোমন্দ বিষয়েও খোঁজখবর নেন এবং উন্নয়ন পরামর্শ দিয়ে থাকেন। প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো:

প্রত্যয় : আপনি দেশের একজন বিশিষ্ট নারী উদ্যোক্তা– দেশখ্যাত স্টাইলিশ গার্মেন্টস লি. এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আর্থ-সামাজিকভাবে দেশ বেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এই এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে দেশের নারী সমাজের অবদান কতোটা বলে আপনি মনে করেন?

মাকসুদা চৌধুরী : বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়নে দেশের নারী সমাজের ভূমিকা ব্যাপক। এই যে আমরা কথায় কথায় বলি নারী হচ্ছে পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী– কথাটা ঠিক নয়, আমি মনে করি নারী হচ্ছে সমাজের অর্ধাংশ। অর্ধাৎ অর্ধেক অংশ। তবে সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী বর্তমানে নারীর সংখ্যাই বেশি দাঁড়িয়েছে। আপনারা লক্ষ্য করছেন যে, কাজের ক্ষেত্রে পুরুষের পদ-পদবি আছে কিন্তু নারীর নেই। একজন পুরুষ কর্মক্ষেত্রে অফিস বা ব্যবসা চালান একটা নির্দিষ্ট সময় নিয়ে আর একজন নারীর কাজ হচ্ছে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা। আমাদের দেশে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আগে নারীরা বেশি নির্যাতিত হতো, এখন এটা কমেছে। কারণ, একজন নারী সংসারের বাইরেও তার আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে নিয়েছে। ফলে তাদের এ ধরনের নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয় না। বিশেষ করে এই গার্মেন্টস সেক্টরের কথাই ধরুন, এখানে শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকাংশই নারী। এই নারীরা আর্থিকভাবে স্বাধীন হবার কারণে তখন আর সংসারের কোনো প্রয়োজনে স্বামী বা অন্য কারো কাছে হাত পাততে হয় না। একজন নারী তার সন্তানকে ভুলে দিতে পারছে সহজেই। আর সন্তানের পড়ালেখাকে নারী বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

এটা বাস্তব সত্য যে, শিক্ষাকে পিছিয়ে রেখে শুধু বাংলাদেশ কেন কোনো জাতির পক্ষেই উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। আর এদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের অবদানই সবচেয়ে বেশি। যেম স্কুল যদি বলি তা হলে দেখা যায় মা যতোটা করতে পারে বাবা ততোটা করতে পারে না। এটা বাবার চেয়ে মায়েরই বেশি দায়িত্ব। পাশাপাশি আমার মূল্যায়ন হচ্ছে, নারী যদি ঘরের বাইরে না বেরতো তা হলে আমরা এদেশে গার্মেন্টস সেক্টরটা পেতাম না।

শুধু আরএমজি সেক্টরের কথা বা বলি কেন সব সেক্টরের অবস্থাই তাই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী নেত্রী, শিক্ষার, উপদেষ্টা অর্ধাৎ রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীদের অংশগ্রহণ কম থাকলেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তারাই করছেন। অতীতে কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ছিল না। তবে এখনো কর্মক্ষেত্রে নারী যে সমস্যার মধ্যে পড়েন পুরুষকে তা

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বরাবরই বিশেষভাবে অনুধাবিত করা হয়। উদ্যোক্তা হিসেবে নারীদের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা নিয়ে থাকে, ফান্ডের ব্যবস্থাও করে থাকে অনেক ক্ষেত্রে। ঋণের সুদহারও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য অনেক ব্যবসায় কিছু কম ধরা হয়। কিন্তু তা পাওয়াটা অনেক সময় দুর্লভ হয়, দীর্ঘসূত্রতার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে পড়তে হয়। এই জটিলতা কমিয়ে আনতে পারলে তা ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে।

পড়তে হয় না। দেখা যায় মার্চেন্ডাইজিং, তবে একটা ছেলে ব্যাক বিয়ারিংও ঘুরতে পারছে ফ্যাক্টরি থেকে ফ্যাক্টরিতে কিন্তু একজন নারী নিরাপত্তাজনিত কারণে তা পারছে না। এসব ক্ষেত্রে নারীরা কিছুটা পিছিয়ে আছে। কিন্তু অন্যান্য কাজে বিশেষ করে ডেক ওয়ার্কসহ ফ্যাক্টরি বা অফিসের ডেস্কের কাজে, বাণিজ্যিক খাতের কাজে পুরুষদের চেয়ে নারীদের দক্ষতাই বেশি, তারা মনোযোগের সাথে কাজ করেন।

অন্যদিকে আমাদের টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে প্রতি বছরই প্রায় ১ হাজার নারী গ্র্যাজুয়েশন শেষ করছেন কিন্তু তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না। এ বিষয়গুলোও এ সেক্টরের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কাজের ব্যাপারে নারীদেরও কিছুটা এগিয়ে আসতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নারীরা পছন্দ বাছাই করে বলেন, আমি এই জায়গায় কাজ করবো, ঐখানটায় করব না। সেই মানসিকতাও বদলাতে হবে। নিজের নিরাপত্তা ও শালীনতা বজায় রেখে যেখানে যেখানে কাজের সুযোগ পাওয়া যায় সেখানেই তাদের কাজ করতে হবে।

প্রত্যয় : নারী এবং পুরুষ এর মধ্যে নারীরা অনেক ক্ষেত্রেই লিঙ্গবৈষম্যের শিকার। আপনি একজন শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে এ বিষয়টিকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন? পুরুষের তুলনায় নারী শ্রমিকদের মজুরি কি কম ধার্য করেন?

মাকসুদা চৌধুরী : আমাদের ফ্যাক্টরিতে অন্তত এ ধরনের বৈষম্য নেই। অন্যান্য ফ্যাক্টরিতেও নারী শ্রমিকদেরই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। কারণ, আরএমজি সেক্টরে আমরা লক্ষ্য করেছি মেয়েরাই বেশি কর্মঠ এবং এ ধরনের কাজে বাঙালি মেয়েরা বেশি দক্ষ ও কর্মে বেশ নিপুণ। বিশেষ করে সুই-সুতোর কাজ নারীরা বেশি ভালো পারে। অপারেটরের ক্ষেত্রে বা সুপারভাইজারের ক্ষেত্রে নারীকে অধিক প্রাধান্য দেয়া হয়। তাদের বোঝানো যায়, তারা উত্তেজিত কম হয়। নারীরা হুটহাট করে কাজ ছেড়ে দেয় না। তাদের একটা দায়িত্ববোধ থাকে যে সংসার পরিচালনা করতে হবে। তবে এটা ঠিক যে, নিম্ন পর্যায়ের শ্রমে যেমন ইট ভাঙা, মাটি কাটা কিংবা কৃষি শ্রমে নারীদের মজুরি পুরুষদের তুলনায় কম ধরা হয় আর দীর্ঘ পর্যায়ের পদেও কখনো কখনো কোনো কাজে এই বৈষম্য দেখা যায়, যা মোটেই ঠিক নয়। এখানে হয়তো মনে করা হয় যে, এসব কাজে পুরুষের চেয়ে নারীর সক্ষমতা কিছু কম যেমন একজন পুরুষ শ্রমিক যে পরিমাণ ইট ভাঙতে পারবে নারীরা তা পারবে না। কিন্তু আমি মনে করি একজন পুরুষ শ্রমিক ইট ভাঙতে ভাঙতে কয়েকবার হয়তো উঠে যাচ্ছে কিন্তু একজন নারী তা করছে না। সে মনোযোগ সহকারে কাজটি করে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে কাজের ফলাফল কিন্তু একই দাঁড়ায়।

আপার লেবেলেও অনেকটা এ রকম হয় যে, নারী সর্বত্র যেতে পারছে না কিন্তু একজন পুরুষ পারছে এ জন্য বেতন বৈষম্য রাখা হয়। তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যদি ভালো থাকে এবং পারিবারিক সাপোর্ট থাকলে একজন নারী পুরুষের সমকক্ষভাবেই কাজ করতে পারে।

প্রত্যয় : পোশাক শিল্প কারখানায় নারী শ্রমিকদের আধিক্য বেশি। এর অর্থ বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রে তাদের রয়েছে বিশাল অবদান। নারীদের জন্য আপনারা বিশেষে কোনো সুযোগ প্রদান করছেন কি?

মাকসুদা চৌধুরী : দেখুন, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বরাবরই বিশেষভাবে অনুধাবিত করা হয়। উদ্যোক্তা হিসেবে নারীদের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা নিয়ে থাকে, ফান্ডের ব্যবস্থাও করে থাকে অনেক ক্ষেত্রে। ঋণের সুদহারও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য অনেক ব্যবসায় কিছু কম ধরা হয়। কিন্তু তা পাওয়াটা অনেক সময় দুর্লভ হয়, দীর্ঘসূত্রতার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে পড়তে হয়। এই জটিলতা কমিয়ে আনতে পারলে তা ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে। এ জন্য আমলাতন্ত্রের আরো দক্ষতা প্রয়োজন, প্রয়োজন ব্যবসাবান্ধব মনমানসিকতা। ওপর লেবেল থেকে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় মিড লেবেলে তা বাস্তবায়নে সহায়তা একান্ত দরকার। এটি গেলো নারী উদ্যোক্তাদের ব্যাপারে।

নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে আইএলও বা বিএকসিআই যখন সবকিছু করতে যাই তখন নারীদের মেটারনিটি লিভসহ আর্লি ক্যাশ পেমেন্ট করা হয়। যাতে তারা স্বাস্থ্য চিকিৎসার দিকে যত্ন নিতে পারে। সন্তানদের জন্য চাইল্ড কেয়ারের ব্যবস্থাও নেয়া হয়। প্রায় সব ফ্যাক্টরিতেই এখন চাইল্ড কেয়ারের ব্যবস্থা আছে। বিজিএমইএ থেকে উদ্যোগ নেয়ার ইতিমধ্যে এ সেক্টরে 'শিশু শ্রমমুক্ত' যাচ্ছে। আশা করি প্রত্যেক ফ্যাক্টরিতেই 'চাইল্ড কেয়ার' এর ব্যবস্থাও সম্ভব হবে।

প্রত্যয় : বলা হয়, এ দেশের নারীরা পেশাজীবী হিসেবে অনেক পিছিয়ে। খুব কি পিছিয়ে?

মাকসুদা চৌধুরী : দেখুন এখানে পুরুষদের আউটলুকের একটা ব্যাপার কাজ করে। আপনি যখন বাজারে যাচ্ছেন ১০ জন পুরুষের মধ্যে ২ জন নারী দেখছেন। তখন কিন্তু একটু অসমতা লাগছে। আবার এর উল্টো চিত্র গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে। রাস্তায় দলবেঁধে যখন পোশাক শ্রমিকরা আসে কিংবা গেট দিয়ে ঢুকতে থাকে তখন ৭০ জন নারীর মধ্যে ৫/৭ জন পুরুষ দেখতে পাবেন। ফলে একই সমাজে দুই জায়গায় কিন্তু সমতা এসে যাচ্ছে। অর্থাৎ এই সমাজ ব্যবস্থায় কর্মক্ষেত্রে বর্তমানে নারী-পুরুষের সহাবস্থান কিন্তু একই। আর এটি ঘটেছে আমাদের আরএমজি সেক্টরের বদৌলতে। গৃহকর্মের বাইরেও যে নারীরা শিল্পকর্মে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে উঠে এসেছে এই সেক্টরকে দেখে সহজেই অনুমান করা যায়।

প্রত্যয় : কর্মক্ষেত্রে নারীরা বিশেষ করে আরএমজি সেক্টরের নারীরা যখন রাতে

গ্রামের অশিক্ষিত পিছিয়ে পড়া নারীরা উন্নয়নের পথে হাঁটতে পারছে। যাদের একদিন পরিবর্তনশীলতার কারণে যৌতুকের জন্য মারামারি-ঝগড়াঝাটি লেগে থাকত, এখন সেই নারীরা নিজেই অর্থনৈতিক শক্তি। সে চাকরি করছে, ব্যবসা করছে। ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা করাতে পারছে। স্বামী ও পরিবারের মুখাপেক্ষী থাকতে হয় না। নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া দেশের উন্নয়ন অসম্ভব।

বাসায় ফেরেন তখন অনেক সময় দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়– আপনার বক্তব্য কি?

মাকসুদা চৌধুরী : আপনি ঠিকই বলেছেন যে, রাতের বেলায় বাসায় ফেরার পথে নারী শ্রমিকরা কিছুটা 'ইনসিকিউরড ফিল' করেন। অতীতে এটি বেশি ছিল। এখন সরকারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বেশ তৎপর। বিশেষ করে শিল্পাঞ্চলে শিল্প পুলিশ দেয়া হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে। থানায় অভিযোগ দেয়ার সাথে অভিযুক্তকে ধরা হয়ে থাকে। আরেকটি বিষয় যে, মোবাইল ফোন থাকায় মেয়েটি তার স্বামী বা অভিভাবককে জানালে স্বামী নিজেই এসে গেটে দাঁড়িয়ে থাকে। এটি আমাদের সমাজের জন্য বড় একটি পরিবর্তন বলে আমি মনে করি। আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোর গেটে এটি দেখে পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি সর্বত্রই এই পরিবর্তন। এতে একদিকে যেমন স্ত্রীর প্রতি সহমর্মিতা এবং স্ত্রীর কাজের প্রতি সম্মান দুটোই প্রকাশ পাচ্ছে। আর এ কথা আমি সবসময়ই বলি যে, পরিবারের সাপোর্ট না থাকলে মেয়েরা এতোদূর এগোতে পারত না।

প্রত্যয় : কর্মক্ষেত্রকে নারীবান্ধব রাখার আপনার প্রস্তাবনা কি?

মাকসুদা চৌধুরী : অবশ্যই এক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা আরো জোরালো করা উচিত। আমরা যত্রতত্রই নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র আশা করি না কেন মনের অজান্তেই বা পুরুষতান্ত্রিক ধারার মানসিকতায় এ ধরনের অনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। সে জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করা দরকার। একটি বিষয় যে এখন এই হয়রানিও অনেক কমে এসেছে। কর্মীদের মধ্যে মনমানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে, তদুপরি সিসি ক্যামেরা থাকায় কর্ম অবস্থানে এরকম আচরণের প্রমাণ খুব দ্রুত পাওয়া যায় এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আওতায় আনা যায়।

এ জন্য আমি মনে করি, আইনশৃঙ্খলা কার্যক্রমকেও সময়োপযোগী করতে হবে। একসময় এক ধরনের অপরাধ সংঘটিত হতো এখন অপরাধেরও নিত্যনৈমিত্তিক পরিবর্তন ঘটছে। সেক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলার বিষয়কেও সময়োপযোগী করে তুলতে হবে। তার কোনো শেষ নেই। তাছাড়া বাইরের যে দেশগুলো হাইলি সিকিউরড– কাতার কিংবা নরওয়ের মতো এখানেও কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কীভাবে সম্ভব, রুল অব ল কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব আমাদের সিস্টেমটা এমন হতে হবে যে সবাই যেন এটি মেনে চলতে বাধ্য হয় এর বাইরে বেরোনোর কোনো সুযোগই যেনো না পায়।

প্রত্যয় : আপনি কি মনে করেন, সরকারের সব ক্ষেত্রে বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে সমাজের অপরাধ প্রবণতা কি আরো কমিয়ে আনা সম্ভব?

মাকসুদা চৌধুরী : অবশ্যই। যেকোনো কাজ তা পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সব পর্যায়েই সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও কাজের সাফল্যের জন্য প্রধান বিষয়টিই হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা। আমি বিশ্বাস করি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ফোর্সের মধ্যে এটি রয়েছে তবে তা আরো কার্যকর করা প্রয়োজন। মনে রাখা প্রয়োজন, আমাদের ফ্যাক্টরিতে যেমন প্রতিটি কর্মীকে একটা জবাবদিহিতার মধ্যে থাকতে হয়, ভুল হবার কোনো সুযোগ নেই, বাসাবাড়িতে যেমন যার যার দায়িত্ব সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে হয়, না করলেই সৃষ্টি হয় সমস্যার– তেমনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মূল দায়িত্ব হচ্ছে অপরাধ দমন করা, অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেয়া এবং এক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রমে অবশ্যই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এটি হলে অপরাধ প্রবণতা বিশেষ করে চুরি-ডাকাতি, নারীদের প্রতি বিরূপ আচরণ সম্পূর্ণভাবে কমে যেতে বাধ্য।

প্রত্যয় : স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় নিশ্চয় নারীদের অর্থনীতিতে অধিক সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি?

মাকসুদা চৌধুরী : নারীদের মনে করতে হবে– আত্মবিশ্বাসী হতে হবে যে, আমরা পারব। আমরা মায়ের জাত, অনেকটা ইমোশনাল। কাজ ভুল হলে অনেক সময় ঊর্ধ্বতনদের বকাঝকা পুরুষরা ঝেড়ে ফেলে দেয় কিন্তু নারীরা পারে না। নারীরা এ জন্য দৃঢ় মনোবল হয় যে, দ্বিতীয়বার যেন এই বকাটা না খেতে হয়। দ্বিতীয়ত সরকার যে সুযোগ-সুবিধা নারীর জন্য সৃষ্টি করে তার যেন বাস্তবায়ন ঘটে। যখন এর বাস্তবায়ন ঘটবে তখন কিন্তু সুযোগটা সবাই পাবেন এবং নারীরা উক্ত কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবেন। আর যদি দীর্ঘসূত্রতা করা হয় তবে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' এর কথা বলা হলেও আমরা পিছিয়ে থাকব। সুতরাং সরকারকে উন্নয়নবান্ধব ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছাতে এসব বিষয় নিশ্চিত করতে হবে।

প্রত্যয় : দেশে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখায় গ্রামীণ নারীর আত্মকর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ভূমিকা রাখছে। নারীর ক্ষমতায়নে এই কার্যক্রমকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

মাকসুদা চৌধুরী : এটি নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ ছিল। তাদের সেই সাফল্যের হাত ধরেই নারীরা বিশেষ করে গ্রামের অশিক্ষিত পিছিয়ে পড়া নারীরা উন্নয়নের পথে হাঁটতে পারছে। যাদের একদিন পরিবর্তনশীলতার কারণে যৌতুকের জন্য মারামারি-ঝগড়াঝাটি লেগে থাকত, এখন সেই নারীরা নিজেই অর্থনৈতিক শক্তি। সে চাকরি করছে, ব্যবসা করছে। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাতে পারছে। স্বামী ও পরিবারের মুখাপেক্ষী থাকতে হয় না। নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া দেশের উন্নয়ন অসম্ভব। ■

আল মুজাহিদী

মুক্তিযুদ্ধের সব্যসাচী সেনা 'শহীদ'

রাজনৈতিক স্বৈরাচার, তান্ত্রিক স্বৈরাচার
পাকিস্তানি মসনদ, তখ্‌ত-তাউস-
ছিলো আঁধার কালের অঙ্কুশ
ওই কৃষ্ণ অঙ্কুশ তাক করা ছিলো
বাঙালির ওপর বাঙালি জাতির ওই দেশটির
জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রহর থেকেই
সেটি জারি ছিলো শেষ অব্দি-
অর্থাৎ '১৯৭১' পর্যন্ত- আর সেই '৭১'
'৭১'-এই মহাযাত্রা শুরু হয়ে গেলো আমাদের
যুদ্ধ : মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধ আমাদের মুক্তির-
এই যুদ্ধ আমাদের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা যুদ্ধ।
সর্বাত্মক সর্বপ্লাবী
যুদ্ধ...।
আমরা সকলে মুক্তিমন্ত্রে জীবন-মৃত্যুর সংকল্পের
দ্রোহের-বিদ্রোহের কৃষ্ণাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে
দাউ দাউ শিখা, স্ফুলিঙ্গের প্রতিটি অণুও
আনন শীর্ষ শৃঙ্গের অভিমুখে
ছড়িয়ে দিয়েছিলাম- বীর বিক্রমে।

শহীদ- আনোয়ার উল আলম শহীদ
বাঙালি জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর সন্তান। অকুতোভয় গেরিলা নায়ক-। বিশ্বের কিংবদন্তি গেরিলা ওয়ার ফেয়ার বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম এর নেতৃত্বাধীন কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রধান ও সেকেন্ড ইন কমান্ড আনোয়ার উল আলম শহীদ।

'মানুষের পরিবার'ই হলো পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। আর পরিবার-ই মানব সভ্যতার উৎস-আকর। 'আলোক-আঁধার'। আনোয়ার উল আলম শহীদ-এর পরিবারটিও তেমনি আলোর বহতা স্ফুরণ ঘটিয়েছে শহীদ এর জীবনে, সর্বব্যাপী। বসুধারার স্রোতস্বলতায়।

আমি এখন 'ইছাপুরী লজ' এর কথা বলবো। এই 'ইছাপুরী লজ' টাঙ্গাইলের ময়মনসিংহ রোডে অবস্থিত। গাছ-গাছালি, পুষ্প-পুষ্পল আস্ত-আস্তরণ, সৌরভে সুরভিত এই 'ইছাপুরী লজ' এর অঙ্গন-প্রাঙ্গণ। এখানেই এই শ্যামল হরিৎ মৃত্তিকাঙ্গনেই কেটেছে শহীদ ও শহীদ পরিবারের সদস্যবৃন্দের একটি বৃন্তে কতো পুষ্প পরাগের রণন-ঝনন। স্পন্দন-বন্দন-ক্রন্দন। 'ইছাপুরী লজ' যেন একটি মিনিস্ট্রোর ফর্ম-এর শান্তি নিকেতন। আবার ওদিকে কালমাঝী রোডে 'শান্তি কুঞ্জ' নামে অন্য একটি জমিদার বাড়ি রয়েছে। ঐ বাড়িটির উত্তরাধিকারী নির্মাতা আব্দুল হালিম গজনভী, আব্দুল করিম গজনভী- তারা দুই সহোদর ব্রিটিশ প্রিভি কাউন্সিল এর সদস্য।

শহীদ এর বাবা-মা, ভাইবোন- সবাই, সবাই আমার আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছিলেন। আব্দুর রাহীম ইছাপুরীও পিতৃসম সম্মান, শ্রদ্ধা পেতেন আমার কাছে। আমি তাকে 'চাচাজান' সম্বোধন করতাম। আর তার স্নেহময়ী, মমতাময়ী মা জননীকে চাচি আম্মা বলে। তিনিও 'বাবাজী' এই অভিধায় আত্মীয়তায় 'অমিয় অস্থি-বন্ধনে' বেঁধে নিতে পেরেছিলেন আমাকে। আমি সহোদরপ্রতিম শহীদ এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে 'ওর' গোটা পরিবারের প্রতি আমার স্মৃতির সম্প্রীতি নিবেদন জানাই। এ এক সহজাত, স্বতঃস্ফূর্ত সম্পৃক্ত সমর্পণ। ক্ষেপে ক্ষেপে কেটে গেছে আমার জীবন পদ্ম পদগর শতবর্ষী বৃক্ষের মতো প্রায়।

শহীদ তুমি বেঁচে থেকো। যুগ যুগ। তোমার জীবনকালের জ্যোতি বহমান থাক। অম্লান থাক আমাদের সকলের 'নয়ন সমুখে' শহীদ।

আনোয়ার উল আলম শহীদ অনুজপ্রতিম আমার। এর বড় ভাই নীলু মাহমুদ উল আলম আমার আবাল্য অবিচ্ছেদ্য বন্ধু, সহপাঠী- একসঙ্গে পড়েছি। টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী হাই স্কুলে টানা কয়েকটি বছর। সন্তোষ-এর জমিদার রায় বাহাদুর মন্মথ রায় চৌধুরীর বিপুল বদান্যতায় এই মহা বিদ্যায়তনটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৩ এপ্রিল ১৮৮০ সালে। এই স্কুলের নামের ওপর একটি

অংকন : আসিফ মাহমুদ

সংগীত রচিত হয়েছিলো। সেটা লিখেছেন আমাদের সবার প্রিয় শহীদ স্যার। এস. শহীদ উদ্দীন। আমাদের স্কাউট স্যার। তিনি সহজ-সরল বিনয়ী, সুভাষীও বটে। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় তার দখল ছিলো ঈর্ষা করার মতো। তিনি অনর্গল স্টাইলে বক্তৃতা করতে পারতেন অবলীলায়। স্কাউটিং এ তার পারদর্শিতা তাকে 'অ্যাকাডেমিক' উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। শহীদ স্যারের হাত ধরে আমাদের শহীদ– আনোয়ার উল আলম শহীদও স্কাউটিং এর সিঁড়ি ধরে প্রিসে পৌঁছে গিয়েছিলো এক আড়ম্বরপূর্ণ জীবনোপম উপঢৌকন অর্জন করতে। এ প্রসঙ্গে আমার যথা কিঞ্চিৎ সৌজন্য-সহযোগিতার কথা উল্লেখ করতে পারি সবিনয়ে। ফিলিপিন্স রোভার্স আর্থিক অনুদান সংগ্রহে আমরা কজন আমাদের হস্ত প্রসারিত করেছিলাম। এটা ওই 'ইছাপুরী লজ'-এ স্মৃতিবদ্ধ হয়ে আছে। এই ঘটনাপুঞ্জ একটি অলোক-আলোক সোপান সূচিত করেছিলো মুক্তিযুদ্ধের এই বীর নায়ক শহীদ এর বীরোচিত সম্ভাবনা। এই অর্জনটুকু এক মহত্তর জাতীয় অর্জন।

আমাদের কৈশোর-এর বন্ধু সিভিল সার্জন আবু সিনা ছানাউল ফারুক, বিজ্ঞানী ড. আবদুল মালেক, চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. আমিরুল ইসলাম (মাখন), ছাত্রনেতা শাজাহান সিরাজ, মামুন সিদ্দিকী– আমরা আদর্শে মননে আত্মার আত্মীয় ছিলাম।

বিদ্যা কাননে এসেছি আমরা
জ্ঞান বীথিকার তুলিতে ফুল
বিন্দুবাসিনী বিদ্যা দায়িনী
নেইকো কোথাও তাহার তুল।
বহু বরষের স্থাপনা ইহার
কেবা এখন নেই কবেকার
স্বাধীন প্রভাতে আসিলো আবার
জাতিবার তরে মোদের স্কুল
বিদ্যা কাননে এসেছি আমরা
জ্ঞান বীথিকার তুলিতে ফুল
বিন্দুবাসিনী বিদ্যা দায়িনী
নেই কো কোথাও তাহার তুল।

বিন্দুবাসিনী বিদ্যালয় সংগীত
রচয়িতা : এস. শহীদ

এই স্কুলে আমার প্রথম হেড মাস্টার শ্রী যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি শেরোয়ানী পরতেন। মাথা আবৃত থাকতো পাগড়িতে। এরপর হেড মাস্টার ছিলেন দানেশ আলী স্যার। তিনি ভারী ব্যক্তিত্বশীল ছিলেন। অমায়িক আর সরল-স্বচ্ছ। 'বিন্দুবাসিনী মডেল হাই স্কুলটি' আমার শিক্ষা জীবনের সোনালি সোপানটি রচনা করেছিলো। সেই কৈশোরের দিনগুলোর কথা স্মৃতিবদ্ধ হয়ে আছে আজ। আমাদের স্মৃতির পরতে পরতে দিগন্ত রেখাটিকে কল্পমন সজীব করে রেখেছে। শহীদ– বীনু, পিন্টু (প্রীতেন্দ্র মোহন বিশ্বাস), খট্টু (শ্যামলিন্দু নিয়োগী), উৎপলেন্দু নন্দী (পংকজ), চঞ্চল (মৃণালেন্দু নন্দী)। আমাদের স্কুল জীবনে প্রতিদিনই সবাই সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়ার পরপরই স্কুল সংগীত গাইতাম।

স্কুলের সব ছাত্র-শিক্ষক অতি আবেগের সাথে বিশেষ করে স্কুল সংগীতটি পরিবেশন করতাম। এমনকি স্কুলের দুজন দফতরি পর্যন্ত একজন দফতরি মাখন, অপরজন এর নাম সুন্দর, হাতে তার উল্কি আঁকা ছিল। আধা উড়িয়া আধা মৈথিলী তার মাতৃভাষা ছিলো। খুব সাফ সুতরোও ছিলো সে। আমরা তাকে খুবই ভালোবাসতাম। স্কুলের ঘন্টি বাজাতো খুবই সুন্দরভাবে ঐকতানে। সুন্দর-এর হাতে বেশ উল্কি আঁকা ছিলো। সুপ্রিয় শহীদ স্যার এর স্কাউটিং এর দক্ষতা সেদিন বিরল দক্ষিণা হয়ে রয়েছে শহীদ এর জীবনে। আগমনী দি (আগমনী নন্দী) অঞ্জলি নন্দী, শিপ্রা, অজা এদের সকলের কথা আমার মনে পড়ে আজও। বিশেষ করে দীনেশ চন্দ্র নন্দী আমাদের করটিয়া সা'দত কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক। আর আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রিন্সিপাল অধ্যক্ষ তোফাজ্জল আহমদ স্যার এর কথা। ফোকলোরিস্ট, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ তোফাজ্জল আহমদ। মনে পড়ে। মনে পড়ে। পরিমল দা, লক্ষণ দা, মঞ্জু নন্দী– নন্দী পরিবারের সবার কথাই। নন্দী পরিবারের প্রবীণদের অনেকেই বেঁচে নেই আজ। যারা বেঁচে আছে, তাদের অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে– কলকাতায়। '৭১ এ মুক্তিযুদ্ধকালে অনেকের সাথেই কলকাতায় দেখা হয়েছিল আমার। সাপ্তাহিক 'জয়বাংলা' কাগজে (মুক্তিযুদ্ধের মুখপত্র) ওখানে (Editorial-এ) সম্পাদকীয় বিভাগে যুক্ত ছিলাম বেশ কিছুদিন। ঐ কাগজের প্রধান দায়িত্বে ছিলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মান্নান। খুবই সজ্জন, সহৃদয় হিতবাদী মানুষ।

যুদ্ধের আবহে সজ্জিত রণাঙ্গন থেকেই সিদ্ধান্ত হলো কলকাতা যাবার। মুক্তিযোদ্ধা আমার ছোট ভাই শামিম আল মামুন বাংলা ছাত্রলীগ এর সম্পাদক কাজলার সিরাজুল হক খাগুরা জামালপুর বর্ডার পাড়ি দিয়ে মহেন্দ্রগঞ্জ পৌঁছলাম। এরপর টেলিগ্রাম করলাম মান্নান ভাইকে। I Reached Mohandragonj. Kindly arrange my passage to Calcutta. Ready to Render my humble service for the Nation. রাষ্ট্রপতি শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমাকে দেখে উদ্ভাসিত হলেন।

বঙ্গবন্ধুর সাথে আনোয়ার উল আলম, পেছনে আবদুল কাদের সিদ্দিকী।

মান্নান ভাই সাথে সাথে ফোন করে বললেন Mujaheedy is our man. Try to utilage his talent. বালু হক্কক লেনে গেলাম। মান্নান ভাই 'জয় বাংলার' Editorial-এ যোগ দিতে বললেন।
ওখানে প্রথম দিন প্রথম Editorial এ লিখলাম– 'ইতিহাসের ন্যায়দণ্ডে ইয়াহিয়ার ক্ষমা নেই।'
মহাকবি সেক্সপিয়ার এর কিং জন নাটক থেকে এই উক্তিতে যবনিকাপাত করবো–

"আমি যখন ভিখারি তখন আমি গাল পেড়ে বলব,
ধনী হওয়ার চেয়ে পাপ আর কিছু নেই,
আর আমি যখন বড় লোক তখন ধনী হওয়াটাই মহত্ত্ব
এবং ভিক্ষার চেয়ে কুকর্ম আর কিছু নেই।"

উইলিয়াম সেক্সপিয়ারের কিং জন নাটকে ফিলিপ এর মন্তব্য এই যে, "প্রায়শই বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের সাধারণ মূল্যায়ন আমাদের নিজস্ব বিশেষ স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।"

– নীতি ও ন্যায্যতা, অমর্ত্য সেন

শহীদ, সততই সহৃদয় সংবিৎ-উদার, মানবিক
প্রাতস্মিতা প্রবণ-সূর্য সজ্জন
শহীদ সততই এক অমর আত্মার
মর্ত্যপ্রাণ।

● লেখক : কবি ও সাংবাদিক

তানভীর মাসুদ

আমি এবং ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী

খুব ছোটবেলায় সম্ভবত তৃতীয় শ্রেণিতে পড়াকালীন বাংলা বইয়ের 'অপরাজেয়' নামক একটি রচনার দুটি লাইনে আমার চোখ আটকে গিয়েছিলো। এখনো যখন মাঝেমধ্যে আমি জীবনের খেই হারিয়ে ফেলি তখন ঐ বাক্যটি আমাকে উজ্জীবিত করে তোলে। আমি নতুন উদ্যম নিয়ে জীবনের সাথে তাল মিলিয়ে পথ চলতে শুরু করি। ওই অল্প বয়সে আমি রচনাটির মর্মার্থ কি বুঝেছিলাম জানি না তবে ঐ একটি বাক্য এখনো আমাকে তাড়িত করে। অবিরত আমি চলতে থাকি কিছু সৃষ্টির আশায়-নেশায়।

'প্রতিটি মানুষ যখন জন্ম নেয় তখন সৃষ্টিকর্তা তাকে
কিছু না কিছু দায়িত্বভার দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠায়।'

সুন্দর এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষের কিছু না কিছু অবদান রয়েছে। যে লোকটি কথা বলতে পারে না বা চলতে পারে না অথবা একেবারেই অক্ষম তাদেরও অবদান রয়েছে। পশু-পাখি, গাছপালা, জীব-জন্তু এমনকি বর্তমান সময়ের টেকনোলজি সবই সৃষ্টি হচ্ছে পৃথিবী এবং মানুষের জন্য। সেটা কল্যাণকর বা অকল্যাণকর। সবই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিকল্পনার অংশ মাত্র। আমরা এখনো জানি না সেই পরিকল্পনাটি কি বা আমরা আসলে কোথায় যাচ্ছি? আমরা শুধু একটি বৃহৎ পরিকল্পনার ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আমাদের শুধু সুযোগ রয়েছে মানব থেকে অতিমানব বা মহামানব হওয়ার। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী আমার দেখা একজন অতিমানব। যার রক্তের প্রতিটি বিন্দু কণায় মানবীয় গুণাবলির বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সকল শ্রেণি পেশার মানুষের সাথে তিনি খুব সহজেই মিশে যেতে পারতেন। মানুষের সেবা করাই ছিলো তার পরম ধর্ম। লোভ-লালসা, বিলাসিতা এসব ছিলো তার নীতির পরিপন্থি। আমার দেখা মতে মানুষের দেয়া ক্ষুদ্রতম উপহারটিও তিনি গ্রহণ করতেন না। সম্মানের সাথে ফিরিয়ে দিতেন। তিনি ছিলেন সরলমনা তবে প্রচণ্ড একরোখা এবং বদমেজাজি। লক্ষ্য অনুযায়ী যে করেই হোক কাজটা শেষ করতে চাইতেন।

সাল ২০১০। আমি একটি বিশেষ প্রয়োজনে ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে যাই। তখন আমি টগবগে তরুণ। সদ্য স্থাপত্য নিয়ে ডিগ্রি সম্পন্ন করেছি মাত্র। গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল থেকে আমাকে বলা হলো, আপনি 'বড়ভাই' এর সাথে কথা বলে দেখতে পারেন। সমাধান দিলে উনিই আপনাকে দিতে পারেন। 'বড়ভাই' শব্দটি শুনে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। উনি এলাকা বা পাড়া মহল্লার কোনো বড়ভাই না তো? আমার তরুণ মন তখন ধরেই নিয়েছিল উনি মাস্তান প্রকৃতির লোক। আমার বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহল্লার কিছু বড়ভাই ছিলো যাদের কর্মকাণ্ড খুব একটা সন্তোষজনক ছিল না। এই বড়ভাই এমন নাতো? যাক, আমি সেদিনই রাত ৯টা নাগাদ নগর হাসপাতাল থেকে তার বাসার ঠিকানা নিয়ে বাসার গেটের সামনে অপেক্ষা করছি। সামনে বিশাল বড় জায়গা নিয়ে তিনতলা বাড়ি। সম্ভবত ধানমন্ডির প্রটিকরেক বড় জায়গায় গড়ে ওঠা বাড়ির মধ্যে এই বাড়িটি একটি। বাড়ির সামনের দেয়াল সংযুক্ত সারি সারি চা-বিস্কুট এবং ফলমূলের দোকান। আমার ধারণা হলো, এসব ছোট ছোট দোকান থেকে উনি বেশ ভালো অংকের মাসোহারা পান। ধারণাটি আমার সম্পূর্ণ ভুল ছিলো। আমার এই বড়ভাইকে দেখার আগ্রহ বেড়ে গেলো। কল্পনায় বড়ভাইয়ের একটা অবয়ব আবিষ্কার করলাম। আমি নাছোড়বান্দা, বড়ভাইকে দেখেই আমি এখান থেকে যাবো। একজন লোক মারফত আমি জানতে পারলাম তিনি বাসায় নেই, তবে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বাসায় আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এর মধ্যে

সামনের চায়ের দোকানির কাছ থেকে আলাপে জানতে পারলাম উনার মূল নাম জাফরুল্লাহ চৌধুরী। নামের আগে ডাক্তার টাইটেল রয়েছে এই ব্যাপারে দোকানি আমাকে কিছু বললো না। বললে হয়তো ভয় থেকে কিছু স্বস্তি পেতাম। আমি আপন মনে তার নাম ধরে নিলাম জাফরুল্লাহ চৌধুরী বড়ভাই।
রাত তখন সাড়ে দশটা, একটা প্রোবক্স গাড়ি এসে বাড়ির মূল গেটে থামলো। একজন ভদ্রমহিলা গাড়িটি চালাচ্ছিলেন। একটা সময় পরে এসে আমি জানতে পারলাম সুহাসিনী ভদ্রমহিলা তার স্ত্রী। তার নাম 'শিরিন হক'। তিনিও নানা জনকল্যাণকর কাজে জড়িত। পাশের সিটে বসা একজন গাড়ির দরজা খুলে বের হয়ে এলেন। কাঁধ পর্যন্ত শুভ্র সাদা চুল। অতি সাধারণ কাপড়ে মোটামুটি লম্বা গড়নের একজন মানুষ। প্রথম দেখায় হয়তো অনেকে ভাবতে পারেন তিনি কোনো ফোক গানের দলের লোক। গাড়ি থেকে নেমে তিনি নিজে বাড়ির মূল গেটটি খুলতে যাবেন এমন সময় আমি আর কিছু না ভেবেই তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আমি জাফরুল্লাহ চৌধুরী বড়ভাইকে চাচ্ছি। তিনি কিঞ্চিৎ হেসে বললেন আমি সেই ব্যক্তি। তিনি জানতে চাইলেন, আমি কী বিষয়ে তার সাথে দেখা করতে এসেছি। আমি আমার প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু তাকে জানালাম। সব শুনে আমাকে আগামীকাল জানাবেন বলে আমার একটা কার্ড বা নাম্বার চাইলেন। আমি আমার নাম্বারটি তাকে দিয়ে চলে এলাম। চলতি পথে বড়ভাই বিষয়ক রহস্য আমার আরো বেড়ে গেলো। আমার ধারণা ছিল বড়ভাইয়ের বয়স ত্রিশ কিংবা পঁয়ত্রিশ হবে। এক্ষেত্রেও আমার ধারণা ভুল হলো।
পরেরদিন সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে টিএন্ডটি ফোন থেকে একটা কল এলো। আমি রিসিভ করলাম। অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে আসা কণ্ঠটি বললো আমি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলছি, আপনার কাজটি হয়ে যাবে। শুনে আমি আপ্লুত হলাম এবং তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম। সাথে তিনি যোগ করলেন, আপনি তো আর্কিটেক্ট। আমার একজন আর্কিটেক্ট লাগবে। আপনি কি আমার বাসায় এসে একটু দেখা করতে পারবেন? উল্লেখ্য, আমি ছাত্রাবস্থা থেকেই ছোটখাটো কিছু পেশাদারি স্থাপত্য কাজের সাথে জড়িত ছিলাম। একটি স্থাপত্য অফিসে সপ্তাহে তিন দিন করে পার্টটাইম কাজ করতাম। আমি তার বাসায় গেলাম। বেশ সাদামাটা একজন মানুষ। একটি লুঙ্গি এবং শার্ট পড়ে তিনি আমার সামনে এলেন। হাতে একগ্লাস খেজুরের রস আর সন্দেশ। আমরা আলাপে বসলাম। তিনি কাজের বিষয়ে আমাকে একটা ধারণা দিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের একজন প্রধান প্রকৌশলীকে ফোন করে আমার বিষয়ে বললেন, 'তিনি একজন তরুণ স্থপতি, তার সাথে বসে কথা বলো। আমার ধারণা তিনি ভালোভাবে কাজটি করতে পারবেন।' আমি পাশ থেকে বসে তার কথা শুনছিলাম। আমার মতো একজন তরুণ স্থপতিকে তিনি যে সম্মান দেখিয়ে টেলিফোনে কথা বললেন তাতে আমি মুগ্ধ হলাম। তখন নিজেকে সম্মানিত মনে হচ্ছিলো। কিন্তু তাঁকে নিয়ে আমার রহস্যের জট তখনো খুলছিলো না। কে এই বড়ভাই? বড়ভাইয়ের কাজটা আসলে কি? কিছুটা সংকোচের কারণে বড়ভাইকে কাজের বাইরে কোনো প্রশ্ন করে বিরক্ত করতে চাইছিলাম না। সাভার গণস্বাস্থ্যে নেমে আমি প্রথমে প্রধান প্রকৌশলীর সাথে দেখা করলাম। প্রধান প্রকৌশলী ইঞ্জি. অনিল কুমার ভৌমিক আমাকে প্রকল্পটির বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলেন। তারপর আমাকে নিয়ে গণস্বাস্থ্যের প্রতিটি সেক্টর ঘুরিয়ে দেখালেন। আমি গণস্বাস্থ্যের প্রতিটি কর্মযজ্ঞ ঘুরে দেখলাম এবং প্রতিনিয়ত বিস্মিত হতে লাগলাম। গণস্বাস্থ্য হাসপাতাল, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিটিক্যালস, নারীকেন্দ্র, গণস্বাস্থ্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সহ নানান প্রতিষ্ঠান আবিষ্কার করলাম। সেদিন থেকে গণস্বাস্থ্যে আমার পথচলা শুরু হলো। আমি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে কাছ থেকে আরো ভালোভাবে চিনতে শুরু করলাম। অসাধারণ কার্যকলাপের সাথে কী অতি সাধারণ এক ব্যক্তিত্ব! প্রথম দিনে আমার কল্পনার আঁকা সেই মাস্তান বড়ভাই উবে গিয়ে তিনি আমার জীবনে এক মহামানব হয়ে দেখা দিলেন। সাধারণ মানুষের ভালোর জন্য যা করার প্রয়োজন তিনি তাই করেছেন। শারীরিক নানা জটিলতা নিয়ে চষে বেড়িয়েছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। তার ধ্যান-জ্ঞানই ছিলো মানুষের সেবা করা। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের প্রতিটি মানুষই তার দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। আমরা হয়তোবা অনেকেই তা জানি কিংবা জানি না। একদিন যেমন করে তিনি বললেন, যেন আজকে সন্ধ্যায় মিরপুর হার্ট ফাউন্ডেশনে তার সাথে একটু দেখা করি। আমি সেখানে গেলাম। তার শরীরের ডায়ালাইসিসের ক্যানোলা ঢুকানো, তিনি ডায়ালাইসিস নিচ্ছেন। আমাকে বললেন, তিনি এরকম একটি ডায়ালাইসিস সেন্টার করতে চান যেখানে মাত্র পাঁচশ টাকায় সাধারণ মানুষ ডায়ালাইসিস নিতে পারবে। সরকারি কিডনি ফাউন্ডেশন তখন খুব সম্ভবত তেরশত টাকায় ডায়ালাইসিস সেবা দেয়া হতো। আমার হিসাব মিলাতে কষ্ট হচ্ছিলো। কিন্তু তিনি ঠিকই হিসাব মিলিয়ে দেখিয়েছেন।
খুব কম খরচে গণস্বাস্থ্য হাসপাতাল মানুষের স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে। হতদরিদ্র ও বয়স্ক মানুষের কথা চিন্তা করে তিনি স্বাস্থ্য বীমা এবং বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছিলেন। তার সকল প্রতিষ্ঠানে নারী এবং প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। স্বল্প শিক্ষিত নারীদের কর্মমুখী এবং স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে তিনি গণস্বাস্থ্য ট্রেনিং সেন্টার, শিল্পশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে নারীদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ, সেলাইয়ের কাজ, কাঠের কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। গণস্বাস্থ্যের বেশিরভাগ ড্রাইভার নারী এবং নিরাপত্তার কাজে নারীদের পাশাপাশি তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা সমানতালে কাজ করে যাচ্ছে। গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজ এবং গণ বিশ্ববিদ্যালয় কম খরচে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার সুযোগ করে দিয়েছে। পাশাপাশি দেশি এবং বিদেশি মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। 'দেশের স্বাস্থ্যের জন্য' এই মূলমন্ত্র ধারণ করে গণস্বাস্থ্য মানুষকে নানাভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে।
বঙ্গবন্ধুর প্রতি উনার মনে সম্মান, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা অনেকটা জায়গাজুড়ে বিস্তৃত ছিলো। একই সাথে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তার ছিলো অগাধ সম্মান, ভালোবাসা। রাজনৈতিক দলগুলো সব বিভাজন ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে সঠিক গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে দেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করবে এটাই ছিলো তার পরম ইচ্ছা। তার জন্য দেশের সংকটকালীন সময়ে বিভিন্ন দলের দলীয়

প্রধানদের সাথে দেখা করে তিনি বারবার সংলাপে বসার আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন।
আমার ভাবনা বা পথচলার অনেকটা অংশজুড়ে তিনি রয়েছেন এটা স্বীকার করতেই হবে। আমি ভাবি এতো কিছুর পেছনে তার স্বার্থটা কি? 'মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা' এটাই ছিলো তার জীবনের চালিকাশক্তি। কাজের সুবাদে তার সাথে বেশ কিছু জায়গায় আমি ভ্রমণ করেছি। গাড়িতে উঠেই রেডিও চালু করতেন। নানা রকমের পুরানো বাংলা গান বাজতে থাকতো। এর ফাঁকে আমাদের আলাপ চলতো। বেশিরভাগ সময়ে আমিই তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন

আমি তার রুম থেকে বের হয়ে ধানমন্ডি হয় নাম্বার থানার সামনের রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। এতক্ষণ বুকে চেপে রাখা আবেগ আর ধরে রাখতে পারলাম না। তার মুখটা চোখের সামনে ভেসে আসতেই মৃত্যু আর্তনাদে মুখটা আড়াল করে কেঁদে উঠলাম। মানুষের জীবনচক্র হয়তো এমনই। একজন বলিষ্ঠ সংগ্রামী মানুষের এমন নিষ্পাপ শিশুর মতো আচরণ, আমার মন মেনে নিতে পারছিল না।

করতাম। কথার ফাঁকে তিনি গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়তেন। খুব সম্ভবত ২০১৩ সালের কোনো এক সকালে আমি তার বাসায় গিয়েছি আমার ব্যক্তিগত একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমি বললাম সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তিনি আসবেন বলে কথা দিয়েছেন। তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদকে ফোনে ধরিয়ে দিতে। আমি ফোন ধরিয়ে দিলাম। তিনি বেশ খুশি মনে কয়েক মিনিট সাবেক প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বললেন। তারপর শুরু করলেন এরশাদ সাহেবের সময়ে করা তাদের ওষুধ নীতির গল্প। আশির দশকে এরশাদ প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়ে তাকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি স-সম্মানে সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।
১৯৬৪ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়াকালীন তিনি মেডিকেল কলেজের অনিয়ম এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তারপর ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে মৃত্যু অবধি রাজপথে সরব ছিলেন। দেশের যেকোনো ক্রান্তিলগ্নে সকলের সামনের সারিতে ছিলো তার অবস্থান। এক্ষেত্রে তরুণদেরও নানা দিক-নির্দেশনা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতেন।
করোনাকালীন সময় থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বেশিরভাগ সময় তিনি হাসপাতালেই থাকতেন। হাসপাতালে ছোট একটা কামরায় তার কাজকর্ম এবং চিকিৎসা চলতো। বাইরে থেকে কোনো আন্দোলনের ডাক এলে তাকে আর থামানো যেতো না। অসুস্থ শরীর নিয়ে হুইল চেয়ারে করেই ছুটে যেতেন। প্রচণ্ড রকমের কাজ পাগল মানুষ ছিলেন। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর বেশ কিছু পরিকল্পনার সাথে আমি যুক্ত ছিলাম। রাত একটা কিংবা ভোর দুটা আমাকে ফোন করতেন। মাঝেমধ্যে ছোট ছোট কাগজ বা ওষুধের প্যাকেটের গায়ে চিরকুট লিখে আমাকে পাঠাতেন। আমি তার ডাকে সবসময় সরব থাকার চেষ্টা করতাম। সুখে দুঃখে সবসময় অনেকের মতো আমাকেও আগলে রেখেছিলেন।
মৃত্যুর কয়েক দিন আগে, ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর নার্স আমাকে ফোন দিয়ে বললেন, বড়ভাই আপনাকে আসতে বলেছে। আমি গেলাম। গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে তার রুমে ঢুকে দেখলাম তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। পিঠের বালিশটা সরিয়ে উঠে বসলেন। আমি তার পাশে এসে দাঁড়ালাম। তিনি অপেক্ষা নীচু স্বরে অন্য দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন। প্রথমে গণস্বাস্থ্যের প্রজেক্টগুলোর কাজের খোঁজখবর নিলেন। তারপর নতুন একটা প্রজেক্ট শুরু করার বিষয়ে বললেন এবং সাথে যোগ করলেন আমি হয়তো এগুলো দেখে যেতে পারবো না। তুমি কাজগুলো ভালোভাবে শেষ করে দিও। আমার জন্য দোয়া করো। আমরা দুজন কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম। কথাগুলো আমার হৃদয়কে কম্পিত করে তুলছিলো। বুকটা হু হু করে উঠতেই আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম। পিঠে হাত রেখে বললাম, আপনি ঠিক হয়ে যাবেন। আপনার জন্য একটা বই নিয়ে এসেছি, নাম 'ইকিগাই'। বাংলায় অর্থ হচ্ছে 'জীবনের লক্ষ্য'। বইটা পড়তে আপনার ভালো লাগবে। তিনি বই পড়তে ভালোবাসতেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, এবার আমার সময় শেষ। তুমি ভালো থেকো।
বইটার মধ্যে আমি একটা ছোট চিরকুট ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। সেই চিরকুটে তাকে না বলা আমার মনের কথাগুলো ব্যক্ত করেছিলাম। জানি না তিনি পড়েছিলেন কি না? আমি তার রুম থেকে বের হয়ে ধানমন্ডি ছয়-এ থানার সামনের রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। এতক্ষণ বুকে চেপে রাখা আবেগ আর ধরে রাখতে পারলাম না। তার মুখটা চোখের সামনে ভেসে আসতেই মুখটা আড়াল করে কেঁদে উঠলাম। মানুষের জীবনচক্র হয়তো এমনই। একজন বলিষ্ঠ সংগ্রামী মানুষের এমন নিষ্পাপ শিশুর মতো আচরণ, আমার মন মেনে নিতে পারছিল না।
১১ এপ্রিল, ২০২৩। রমজান মাস। সন্ধ্যায় গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে ইফতারের পরে তার জন্য দোয়ার আয়োজন করা হলো। দোয়া শেষে আমি যখন বাসায় ঢুকছিলাম তখন খবর এলো ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী আর নেই। সৃষ্টিকর্তা তাকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন আর আমাদের কাছে অমর করে রেখে গেলেন।
ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ছিলেন ইতিহাস। এই ইতিহাস পাতার পর পাতা লিখেও শেষ করা যাবে না। অদম্য, পরোপকারী এই মানুষটির কথা বাংলাদেশ মনে রাখবে শতাব্দীর পর শতাব্দী। এভাবেই একজন 'বড়ভাই' নিজ গুণে জায়গা করে নেন লক্ষকোটি মানুষের হৃদয়ে।
নজরুলের কবিতার একটি লাইন দিয়ে সমাপ্ত করি,
"অশান্ত এ ধূমকেতুকে ঘুম পাড়াবে কোন মায়া?" ■

● তানভীর মাসুদ : লেখক ও সংগঠক

সৈয়দ মামুনুর রশীদ
উন্নয়নকর্মী ও কবি

সমাজ উন্নয়নের রোল মডেল শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট অধিকারকর্মী শামসুন্নাহার রহমান ২০১৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। উন্নয়ন সেক্টরে অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব পরাণ রহমান গণমানুষের কাছে 'পরাণ আপা' নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। মাঠ পর্যায়ের তৃণমূল নারীরা তাকে ভালোবেসে 'ঘাসফুল আপা' নামেও ডাকতেন। আমরা জানি ব্যক্তি তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে যায়। ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমান তেমন একজন মহীয়সী নারী ছিলেন। সত্তরের ১২ নভেম্বর স্মরণকালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে নেমে আসে ভয়াবহ দুর্যোগ। অসংখ্য মানুষ ভিটে-মাটি এবং পরিবারের স্বজনদের হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। জলোচ্ছ্বাসে বহু মানুষ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরাণ রহমান সে সময় মেয়েদের নিয়ে ত্রাণের কাজ শুরু করেন। সুবিধাবঞ্চিত এসব নারী ও নিষ্পাপ শিশুরাই ছিলো পরাণ রহমানের 'ঘাসফুল'। তিনি তাদের কাছে টেনে নিলেন পরম মমতায়। তাদের জন্য শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করলেন। খাদ্য, পানি, ওষুধ, স্যালাইন নিয়ে তিনি আর্ত-মানবতার পাশে দাঁড়ালেন। ক্ষুধার্ত শিশু ও অসহায় মানুষের জন্য তিনি প্রতিদিন রুটি-সবজি নিয়ে হাজির হতেন। এই কাফেলায় অন্যান্য মেয়েদের সাথে বড় মেয়ে পারভীন মাহমুদও ছিলেন। সত্তরের ক্ষত শুকাতে না শুকাতেই একাত্তরে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের সময় যেসব সাহসী নারী গোপনে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে যুবকদের ভারত সীমান্তে প্রশিক্ষণে পাঠাতে কাজ করেন তাদের মধ্যে পরাণ রহমান অন্যতম একজন। তিনি পাড়া-পড়শী যুবকদের উদ্দেশ্য করে বলতেন, পাকিস্তানিদের হাতে নিশ্চুপ নির্মম হত্যার শিকার না হয়ে বীরত্বের সাথে মুক্তিযুদ্ধে যাও, হয় শহিদ নয়তো গাজী হয়ে বীরত্ব লাভ কর। কাজটি সহজ ছিলো না। মারাত্মক ঝুঁকি জেনেও পরাণ রহমান দিনের পর দিন এলাকায় এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের জন্য যোদ্ধা খুঁজে বেড়াতেন। পরাণ রহমান মুক্তিযোদ্ধাদের পথ দেখিয়েছিলেন, তাদের খাবার সরবরাহ করতেন, সংবাদ আদান-প্রদান করতেন, অস্ত্র লুকিয়ে রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয়ে নিজের লেখাতে পরাণ রহমান লিখেছেন, ১৯৭১-এ শহিদ মির্জা লেইনের যুবক-তরুণেরা অতর্কিতে আক্রমণ, গেরিলা যুদ্ধ বা প্রতিরোধ গড়ার মহড়া, বন্দুক চালানো শিক্ষা নিয়েছিল। সে সময় তিনিসহ বেশ কয়েকজন নারী ও.আর নিজাম রোডে এলিট পেইন্টের মালিক সিরাজ সাহেবের খালি জমিতে একত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে ফার্স্ট-এইড শিক্ষার সাথে বন্দুক চালানো শিখেছিলেন কয়েকজন নারী। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক নারীদের যুদ্ধে আহতদের রক্ত বন্ধ করা ও ব্যান্ডেজ করা শিখিয়েছিলেন। আত্মরক্ষা ও ফার্স্ট-এইডে প্রশিক্ষণ দিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতিতে আত্মনিয়োগ করেন। শেষ বিজয় না আসা পর্যন্ত তিনি গ্রামে গ্রামে রিকশা নিয়ে ঘুরে ঘুরে যুবকদের দেশত্যাগে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি সত্যিকার অর্থে একজন মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক ছিলেন। অবশেষে ত্রিশ লক্ষ শহিদ ও দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আসে লাল-সবুজের পতাকা।

স্বাধীনতা ঘোষণার পর যেসব শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারা ফিরে আসতে শুরু করে। শুরু হয় চারদিকে হাহাকার। পর্যাপ্ত খাদ্য নেই, ওষুধ নেই, রাস্তাঘাট নেই, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, থাকার জায়গা নেই, আত্মীয়-স্বজন, মা-বাবা, যুবক সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে, যুদ্ধকালীন যৌন নির্যাতনের শিকার মা-বোনের দাঁড়াবার আশ্রয় নেই, সর্বত্রই যেন নেই আর নেই। এমন এক অবর্ণনীয় বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে পরাণ রহমান ঝাঁপিয়ে পড়লেন রিলিফ-ওয়ার্কে। তিনি পাড়া-পড়শী, আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ শুরু করে অসহায় দুর্গত মানুষের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কাজ শুরু করেন।

> আমার অস্তিত্ব, রক্ত মাংসে, অস্থি-মজ্জা জুড়ে রয়েছে 'ঘাসফুল'। এই সংস্থা আমার পেটে ধরা সন্তানের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। মমতাময়ী মা যেমন শুধু রক্ত-মাংসে শিশু অবস্থায় ছোট্ট সন্তানকে জীবনের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা, আন্তরিকতা, আশা এবং সবটুকু আবেগ দিয়ে তিলে তিলে বড় করেন। আমি অধমও ঘাসফুলের তেমন একজন জন্মদাত্রী।

যাত্রা শুরু হয় তার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের। জন্ম নেয় উন্নয়ন সংগঠন 'ঘাসফুল'। সংগঠনের মাঠ পর্যায়ে কাজের ক্ষেত্র হিসেবে তিনি প্রথমেই বেছে নেন চট্টগ্রামের লালখান বাজারস্থ 'পোড়া কলোনি' নামক দারিদ্র্য নিপীড়িত একটি জনপদ। স্বাধীনতার পরপর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু নির্যাতিত বীরাঙ্গনারা পরিচয় গোপন করে এখানে আশ্রয় নেয়। পরাণ রহমান অন্যান্য দুস্থ পরিবারের সাথে তাদেরও স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি কাউন্সেলিং দিতে শুরু করেন। নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখান। ঘাসফুলের ব্যানারে প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা নারী যারা শারীরিকভাবে অসুস্থ ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন, জরুরি ভিত্তিতে তাদের নিরাপদ সন্তান প্রসব করানো। এরপর প্রসূতি মায়ের মানসিক চর্চা ও দৈহিক যত্ন নেয়া। সেই থেকে ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রসূতি পরিচর্যা, শিশু যত্ন, চিকিৎসা কার্যক্রম চালিয়েছে। ঘাসফুল প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট পরাণ রহমানের ভাষায় 'মুক্তিযুদ্ধকালে ঘরবাড়ি ত্যাগ করা অসংখ্য প্রসূতি মায়ের প্রসবজনিত কষ্ট আমি দেখেছি। এ ছাড়া পাকিস্তানি বাহিনীর ধর্ষণের কারণে যেসব মহিলা গর্ভবতী হয়েছিলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এসব অনাকাঙ্ক্ষিত প্রসব ও প্রসূতি মায়ের যত্নের জরুরি তাগিদ থেকে আমি মা ও শিশুস্বাস্থ্য নিয়ে ঘাসফুলের ব্যানারে কাজ করতে থাকি।' পরাণ রহমান পোড়া কলোনি বস্তিতে অপরিকল্পিতভাবে বেড়ে ওঠা দরিদ্র পরিবারগুলোকে পরিবার পরিকল্পনা শিক্ষা দিলেন। স্কুলবিহীন বেড়ে ওঠা শিশুদের জন্য পড়ালেখার ব্যবস্থা করলেন। তারপর একাত্তরপরবর্তী দুর্ভিক্ষের পর দারিদ্র্যপীড়িত আরেক জনপদ মাইজপাড়াবস্তি, স্টেশন এলাকার বস্তি ও পূর্ব মাদারবাড়িস্থ তথাকথিত অচ্ছুত সম্প্রদায়ের বসতি সেবক কলোনিতে (সুইপার কলোনি) কাজ শুরু করেন। তখনকার সময়ে মানুষ সুইপার কলোনির পাশ দিয়েও হাঁটতো না, তাদের নোংরা বা অচ্ছুত ভেবে দোকানে বসতে দিতো না, পাশে দাঁড়াতো না। এরকম পরিস্থিতিতে পরাণ রহমান কলোনির ভেতরে বসে বৈঠক করতেন, তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতেন। তিনি সেবক কলোনির বাসিন্দাদের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কাজ শুরু করেন। সেখানকার বাচ্চাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করলেন একটি স্কুল, যা এখন 'ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র' নামে বিশাল সফলতা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। যে কলোনিতে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন কেউ ছিলো না, নোংরা পরিবেশে মাদক সেবন করে পড়ে থাকা ছিলো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, বর্তমানে সেখানকার বাচ্চারা এই বিকাশ কেন্দ্রের কল্যাণে প্রকৌশলী হয়েছে, শিক্ষক হয়েছে, বিবিএ, এমবিএ ডিগ্রি নিয়েছে। যে কলোনিতে যুগের পর যুগ মাদকসেবীদের খিস্তিতে দিনরাত সরগরম থাকতো সে অঙ্গন এখন মুখরিত হয় শিক্ষার্থীদের পদচারণায়। পরাণ রহমানের স্বপ্নে গড়া ঘাসফুল আজ একটি বহুমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, যার সুনাম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বেও বিস্তৃত। পিছিয়ে পড়া মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিবেদিত পরাণ রহমান শারীরিকভাবে প্রয়াণ করলেও তার দীর্ঘ কর্মময় জীবন যুগ যুগ ধরে মানুষের সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা হয়ে থাকবে। তাকে সমাজ পরিবর্তনের রূপকারও বলা যায়। সহমর্মিতার গভীর জীবন দর্শন, গবেষণাধর্মী মনোভাব, অসাধারণ সাংগঠনিক ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন তার পবিত্র জীবনব্যাপী বিস্তৃত। দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষার প্রসারসহ সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় তার দূরদর্শী চিন্তার সুফলভোগী আজ অসংখ্য পরিবার। তার কর্মনিষ্ঠ দ্যুতিময় জীবন-অধ্যায়ের জন্য আমরা গর্বিত। জ্ঞান, সাহস, মানবতা, দক্ষতা, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, স্বেচ্ছাসেবা তাকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তিনি ব্যক্তি থেকে যেন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি যেভাবে তার অভূতপূর্ব নেতৃত্বের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিস্তার ঘটিয়ে গেছেন তা অনুসরণযোগ্য। স্বাপ্নিক পরাণ রহমান দেখিয়ে গেছেন, চিন্তা-পরিকল্পনা-দক্ষতা-যোগ্যতার যথাযথ প্রতিফলন ঘটিয়ে কীভাবে দৃষ্টান্তযোগ্য কিছু করা যায়। নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষকে ছায়া দেওয়ার জন্য তিনি হয়ে উঠেছিলেন একটি ছায়া সু-শীতল বটবৃক্ষ।

মূলত সত্তরের দুর্ভিক্ষ, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা পরবর্তী মানুষের হাহাকারই পরাণ রহমানকে প্রাতিষ্ঠানিক সমাজসেবায় টেনে নিয়ে আসে। বাংলাদেশের মুক্তির জন্য সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পর সামসুজ্জামানের স্ত্রী পরাণ যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ আসলে শেষ হয়নি। কারণ স্বাধীনতা অর্জন মানে কেবল শত্রুপক্ষকে পরাজিত করে বিজয় অর্জন নয়। দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা এবং অর্থবহ করতে তুলতে সেই সৈনিকেরাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, যে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখবে। তিনি ভাবতেন নারী উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন করতে হবে যাতে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়, মানসিকভাবে স্বস্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। পরাণ রহমান তার সহকর্মী যারা ছিল, তাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং কঠিন সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজতেন। তিনি নিষ্পেষিত, পদদলিত এসব জনপদের প্রতীক হিসেবে তার প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের নামকরণ করেন 'ঘাসফুল'। ঘাসফুলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফুলটি আনাচে-কানাচে অনাদরে ফুটে থাকলেও ফুলের মর্যাদা পায় না, তেমনি সুবিধাবঞ্চিত তৃণমূল মানুষগুলো মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেও মানুষের মর্যাদা পায় না।

পরাণ রহমানের প্রতিষ্ঠিত ঘাসফুল আজ জাতীয় পর্যায়ের একটি উন্নয়ন সংস্থা। কাজ করছে দেশের সাতটি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ঘটিয়েছে মানব জীবনের ভ্রূণ থেকে কবর পর্যন্ত। কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য ইস্যুগুলোর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, শিশু সুরক্ষা, শিশু-কিশোরদের সাংস্কৃতিক বিকাশ, টিকা প্রদান, যুব উন্নয়ন, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন, প্রবীণ কল্যাণ,

পরাণ রহমান মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত বীরাঙ্গনাদের নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রাষ্ট্রীয় সম্মান তিনিও স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। উন্নয়ন সেক্টরে প্রতিটি শাখায় রয়েছে তার পদচিহ্ন, অনবদ্য অবদান। উন্নয়ন সেক্টরে এমন অনেক কাজ রয়েছে যার শুরু হয় উন্নয়নকর্মী পরাণ রহমানের হাত ধরে। চট্টগ্রামে তিনিই প্রথম হরিজন সম্প্রদায়ের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জীবন-মান উন্নয়নে কাজ শুরু করেন।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও পারিবারিক সহিংসতা রোধ, নিরাপদ কৃষি, সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম, পশুসম্পদ ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য সবুজ জ্বালানি, ক্রেডিটেল, চক্ষু চিকিৎসাসেবা, কমিউনিটি উন্নয়ন, নিরাপদ সবজি উৎপাদন, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রম।

পরাণ রহমান ১৯৪০ সালের ১ জুন চট্টগ্রামের 'মাদারবাড়িতে' জন্মগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, তার দাদা সুফি আবদুল আজিজ এবং দাদি কামরুন্নেসা কুমিল্লা জেলার সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। নানা সিরাজুল ইসলাম ও নানি মুজিবুন্নেসা ছিলেন চট্টগ্রাম জেলার বনেদি পরিবারের সদস্য। বাবা আমির হোসেন মজুমদার ছিলেন তৎকালীন ঋণ সালিশি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও জুরি বোর্ডের সদস্য। স্বামী মরহুম এম. এল রহমান ছিলেন বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা। পরাণ রহমান শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন এবং শিক্ষকতার মাঝে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বর্ণাঢ্য জীবনযাত্রার মাঝখানের দীর্ঘ সময় ধরে তিনি ঘাসফুল নিয়ে কাজ করেন। জীবদ্দশায় তিনি ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঘাসফুলের প্রধান হিসেবেও তিনি এক ধরনের শিক্ষকতাই করে গেছেন। পরাণ রহমান ২০১৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের অধ্যক্ষ পদে দায়িত্বে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল পরাণ রহমানের সারা জীবনের অর্জন। ঘাসফুলের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে তিনি জড়িয়ে আছেন। তার রেখে যাওয়া নির্দেশনা, স্মৃতি এখনো বাতিঘরের মতো পথ দেখায়। এখনো তিনি ঘাসফুলের আশপাশে থাকেন। কবির ভাষায় 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব/ থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে/ আরো ভালো আরো স্থির দিকনির্দেশের মতো চেতনায়/ পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজ/ কতো দূর অগ্রসর হয়ে গেল জেনে নিতে আসে'।

শামসুন্নাহার পরাণ বলতেন যদিও মানুষের জীবন পরিধি কম। কাজের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রাখলে মৃত্যুতেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, কর্মই ব্রহ্ম সেটাই ছিল তার জীবনী শক্তি। ঘাসফুল সম্পর্কে পরাণ রহমানের আত্মকথনের মধ্যে দিয়ে সেই প্রত্যয়ের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তিনি লিখে যান 'ঘাসফুল এবং আমি শামসুন্নাহার রহমান পরাণ' এ দুটি অস্তিত্বের মাঝখানে আমি কোনো ফারাক দেখি না। আমাকে যারা চেনেন এবং জানেন তারাও এ কথা এক বাক্যে স্বীকার করবেন বলে আমার বিশ্বাস। আমার অস্তিত্ব, রক্ত মাংস, অস্থি-মজ্জা জুড়ে রয়েছে 'ঘাসফুল'। এই সংস্থা আমার পেটে ধরা সন্তানের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। মমতাময়ী মা যেমন শুধু রক্ত-মাংসে পিণ্ড অবস্থায় ছোট্ট সন্তানকে জীবনের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা, আন্তরিকতা, আশা এবং সবটুকু আবেগ দিয়ে তিলে তিলে বড় করেন। আমি অবশ্যই ঘাসফুলের তেমন একজন জন্মদাত্রী"। পরাণ রহমান আরো উল্লেখ করেন, 'আমি চেষ্টা করেছি, স্বপ্ন দেখেছি যেখানে মানবতার আহাজারি সেখানেই ভরসা নিয়ে যাবে ঘাসফুল। কোনো ধর্মের প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়, যাবে সত্যিকারের সেবার মন-মানসিকতা নিয়ে। আমাকে এখন জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনেকে চেনে। নাম শুনলেই অনেকে আমার সম্পর্কে বলতে পারে দুয়েক কথা। সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছা। আমার এই যৎকিঞ্চিত অর্জন তা কোনোভাবেই আমার যোগ্যতা দিয়ে নয়, তা আমি পেয়েছি মানুষের খেদমত করতে গিয়ে। অসংখ্য মানুষের অকৃত্রিম দোয়া এবং আমার চতুষ্পার্শ্বের কিছু একান্ত আপনজনের উৎসাহ, সহযোগিতা সর্বোপরি যথার্থ পরামর্শ নিয়েই সম্ভব হয়েছে আমার আজ এই অবস্থানে আসা।'

পরাণ রহমান মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত বীরাঙ্গনাদের নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রাষ্ট্রীয় সম্মান তিনিও স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। উন্নয়ন সেক্টরে প্রতিটি শাখায় রয়েছে তার পদচিহ্ন, অনবদ্য অবদান। উন্নয়ন সেক্টরে এমন অনেক কাজ রয়েছে যার শুরু হয় উন্নয়নকর্মী পরাণ রহমানের হাত ধরে। চট্টগ্রামে তিনিই প্রথম হরিজন সম্প্রদায়ের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জীবন-মান উন্নয়নে কাজ শুরু করেন। বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের গোড়ার দিকে পোশাক কারখানার নারী শ্রমিকদের দক্ষতা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা নিয়ে প্রথম কাজ শুরু করেন তিনিই। আশির দশকে চট্টগ্রামে সে-অব-বেঙ্গল প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় জেলেদের দক্ষতা উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে সর্বপ্রথম কাজ শুরু করেন পরাণ রহমান। বেসরকারি পর্যায়ে বিশেষ করে এনজিও ফুলতলাতে চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম সরকারি বই প্রাপ্তি নিশ্চিত করেন তিনি। পরাণ রহমান নগরের বিস্তারের মানুষদের নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের মাধ্যমে সফলতার সাথে ট্রেডিশনাল বার্থ এ্যাটেন্ডেন্ট (টিবিএ) কার্যক্রম প্রবর্তন করেন আশির দশকে। একজন উন্নয়নকর্মী হিসেবে তিনি ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, চীন, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডা ভ্রমণ করেন। শুধু এনজিও সেক্টর নয়, তিনি তার কর্মব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন মানব কল্যাণের প্রতিটি শাখায়। পরাণ রহমান সত্তরের দশকে তৎকালীন চট্টগ্রাম পৌরসভার ওয়ার্ড কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৭-৮৮ সালে 'লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং' এর প্রেসিডেন্ট হন। এছাড়াও তিনি ১৯৯৫ সালে 'লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত' এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট এবং ২০০৮ সালে 'লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত এলিট' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি লায়ন্স-৩১৫বি৪ এর একজন সম্মানিত মেলভিনজোনস্ ফেলোশিপ (এমজেএফ)। ১৯৮৯-১৯৯৩

সাল পর্যন্ত তিনি 'বাংলাদেশ মহিলা সমিতি' চট্টগ্রাম এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ১৯৮৯ সাল থেকে টিটাগাং ওয়ার্কিং ওমেন কো-অপারেটিভ লি. এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম কারাগারের কারা-পরিদর্শক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

পরাণ রহমান একদিকে বঞ্চিত মানুষের জন্য মাঠে-ময়দানে নেমে কাজ করেছেন, অন্যদিকে লেখালেখিতেও ছিলেন সমান অনবদ্য। জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিকে সমসাময়িক বিষয়ে কলাম লেখার পাশাপাশি তিনি রচনা করেছেন ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ। তার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- সৃজনে মননে, উপলব্ধির আঙিনায়, একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে, পুষ্প পরাগ, গল্প মঞ্জুরী, তৃণমূলের অভিজ্ঞ রজনীগণ, মুক্তিযুদ্ধের কথকতা, আরশীতে সোনালী দহন, সুবচন সঞ্চয়, ছোটমণিদের বর্ণ-শব্দ-বাক্য শেখা, ছোটমণিদের লেখা শেখা উল্লেখযোগ্য। তিনি সম্পাদনা করেছেন আভা (ত্রৈমাসিক), মর্মর (মাসিক), ঘাসফুল বার্তা (ত্রৈমাসিক), আমরা একত্রে বাঙালী নামের বিভিন্ন প্রকাশনা।

পরাণ রহমান বিভাজন থেকে বন্ধনকে আবিষ্কার করতেন বেশি এবং বন্ধুত্বের সেতুবন্ধনে আবদ্ধ করেছেন অনেক মানুষকে। তিনি বেগম রোকেয়া, সুফিয়া কামালসহ নারী উন্নয়নযাত্রার মহীয়সী নারীদের এক সার্থক প্রতিনিধি। পরাণ রহমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সূচনা করেছিলেন চট্টগ্রামে, যা আজ সারা দেশে

ছড়িয়ে পড়েছে। পর্দা ও সামাজিক বিধিনিষেধের মধ্যে তখনকার একজন নারীর জন্য কাজগুলো ছিলো চ্যালেঞ্জিং। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের শুরু থেকেই চট্টগ্রাম শহরে ছিল তার সরব উপস্থিতি। সময়ের প্রতিনিধিত্বশীল উন্নয়ন সংগঠন 'ঘাসফুল'কে ঘিরে ছিল তার সৃজনশীল ভাবনা, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা। নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখায় বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালে তাকে বেগম রোকেয়া পদকে ভূষিত করেন। বাংলাদেশের উন্নয়ন সেক্টরে যারা কাজ করছেন পরাণ রহমান এখনো তাদের পথের দিশা, আলোকবর্তিকা। তার জীবনী উন্নয়নকর্মীদের জন্য একটি বিকল্প পাঠশালা। একজন উন্নয়নকর্মী হিসেবে পরাণ রহমান আমাদের চেতনার উৎস। তিনি বেশ পরলোকে বসে বলছেন, 'চলি আমি, এই লণ্ঠনের আলো যে, চায় তাকেই পৌঁছে দিও।'

পরাণ রহমানের মৃত্যুর পরপর বহু জাতীয় ব্যক্তিত্ব তার সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করেন, যা তার কর্মজীবনের একটি প্রতিফলনও বলা চলে। মন্তব্যকারীদের মধ্যে সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকার সম্পাদক নূরজাহান বেগম বলেন, 'ঘাসফুল'- এককথায় চট্টগ্রামে নারীদের অগ্রগতির বাহক। যখন নারীদের নিজস্ব মতামত বলে কিছুই ছিল না তখন পরাণ রহমান নারীদের নিয়ে সংগঠন করা ও তাদের সুসংগঠিত করার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। ইপসার প্রধান নির্বাহী মো. আরিফুর রহমান বলেন, 'শামসুন্নাহার রহমান পরাণের নাম বাদ দিয়ে চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের উন্নয়ন (এনজিও) সেক্টরের ইতিহাস লেখা কখনো সম্ভব নয়'। স্যার ফজলে হাসান আবেদ বলেন, 'পরাণ রহমান ছিলেন সদা হাস্যময়ী প্রাণবন্ত একজন মানুষ।'

বিশিষ্ট নারীনেত্রী সুলতানা কামাল বলেন, 'পরাণ রহমান খুবই নিষ্ঠাবান ও অত্যন্ত দেশপ্রেমিক মানুষ ছিলেন।' ঘাসফুল-চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী বলেন, 'পরাণ রহমান ছিলেন অগ্রবর্তী চিন্তার একজন নারী। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এমনকি সমাজ চিন্তকেরা যা এখন ভাবছেন, পরাণ রহমান তা তিন দশক আগেই ভেবেছেন এবং সীমিত সামর্থ্য নিয়ে সমাজ প্রগতির ধারাকে বেগবান করেছেন সমাজের অবহেলিত, অভাবী, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে পদদলিত অবস্থা থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছেন আজীবন এবং এ ক্ষেত্রে তার সফলতা স্বীকৃত, প্রশংসিত ও ঈর্ষণীয়।' সাংবাদিক ও লেখক আবুল মোমেন বলেন, 'বাংলাদেশের নারী সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্য মানুষ ছিলেন পরাণ রহমান।'

বিশিষ্ট নারীনেত্রী খুশি কবির বলেন, 'আমাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে একজন সমাজকর্মী কাকে বলে; তা হলে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে পরাণ আপা।'

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম বলেন, 'পরাণ রহমান সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন। গরিব ঘরে কেউ জন্ম নিলে গরিব হয়ে থাকবে তা বিশ্বাস করতেন না। গভীর ভালোবাসা দিয়ে কাজটি করতেন। একজন সমাজকর্মী কাকে বলে; তার উদাহরণ ছিলেন পরাণ রহমান।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, রক্ষণশীল পরিবারের রক্ষণশীল সমাজে জন্ম নিয়েও পরাণ রহমান যেভাবে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে গেছেন, শুধু প্রেরণা দেননি, উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন। তিনি ছিলেন রোল মডেল। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'নারী ও শিশুদের ব্যাপারে পরাণ রহমানের যে একটা প্রগাঢ় দরদ ছিলো, তাদের নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে- আমি বলবো এটি একটি অনন্য উদাহরণ। ওনার যে সমাজ চেতনাবোধ ছিলো, এটা ঐ সময়ের অনেকেরই ছিলো না; এর মাঝে তিনি একটা রোল মডেল হিসেবে দাঁড়িয়েছেন এবং অন্যদেরকেও তার সঙ্গে নিয়েছেন।'

নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'যারা সুবিধাবঞ্চিত তাদের সাথে কাজ করা পরাণ রহমানের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তিনি সংগঠন করেছিলেন ঘাসফুল, সংগঠনের নাম আমাদের খুবই পছন্দের। আমরা সাধারণত প্রাণস্পর্শী নিয়ে কথাবার্তা বলি, সাধারণত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের করে না যাদের মধ্যেও ফুল হয়। সেটাই মনে হয় তিনি করাতে চেয়েছিলেন, সেটাই করেছেন, নিবেদিত প্রাণ, তার কোনো সংকোচ ছিল না। ঘাস থেকে ফুল হয় আমরা সাধারণত জানি না।' পরাণ রহমান দেখিয়েছেন। 'যারা সুবিধাবঞ্চিত মানুষ তাদের সঙ্গে কাজ করা পরাণের একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো।'

উন্নয়নযাত্রার সহকর্মী হিসেবে তার স্মৃতি, উপদেশ, মমতা এখনো আমাদের হৃদয়ে অমলিন। কবির ভাষায় 'যেতে আসে শ্রাবণের বৃষ্টিধারা যার নামের ওপর/কখনো ধুলো জমতে দেয় না যাওয়া।' ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা মরহুম শামসুন্নাহার রহমান পরাণের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।■

মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যে নারী

যুদ্ধ মানে শুধু সম্মুখ সমরে গুলি ছোঁড়া নয়। যোদ্ধা মানে শুধুমাত্র রাইফেল হাতে শত্রুর মুখোমুখি হওয়া নয়। যুদ্ধ ও যোদ্ধার সংজ্ঞা আরো উন্মুক্ত, আরো বিস্তৃত। একই সাথে, যুদ্ধ শুধু পুরুষের নয়, যুদ্ধ নারীরও। চতুর্থ শতকের চৈনিক হুয়া মুলান থেকে বিংশ শতকের বাঙালি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার একই সাথে নারী ও যোদ্ধা। তাদের মধ্যবর্তী, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে তাদের মতোই অগণিত নারী যোদ্ধারূপে আবির্ভূত হয়েছেন বাড়ির আঙিনায় কিংবা সম্মুখ সমরে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসও সমৃদ্ধ হয়েছে এমন অসংখ্য মহীয়সীর কীর্তিগাথায়। একাত্তরে এদেশের নারীরা শুধু যে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন কিংবা সম্ভ্রম হারিয়ে যুদ্ধের শিকারে পরিণত হয়েছেন তা নয়; বাঙালি নারীরা যুদ্ধ করেছেন, যোদ্ধা হয়ে উঠেছেন বীরবিক্রমে। তাদের কেউ কেউ যুদ্ধ করেছেন মুক্তিবাহিনীকে খাদ্য দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে কিংবা

চিকিৎসা দিয়ে। কেউবা মুক্তিসেনার অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। কেউবা গেয়েছেন গান, পাঠ করেছেন কবিতা মুক্তিসেনায় মনোবল বাড়াতে। বাঙালি নারীরা যুদ্ধ করেছেন নিজের সন্তানকে যুদ্ধে পাঠিয়ে। আবার কেউ কেউ সরাসরি হাতে তুলে নিয়েছেন ভারী রাইফেল, পুরুষের সাথে একই সমরে গুলি ছুড়েছেন শত্রুর দিকে। সিতারা বেগম বীরপ্রতিক, তারামন বিবি বীরপ্রতিক, কাঁকন বিবি, গীতা কর, শিরিন বানু মিতিল ও রওশন মহল দিলরুবা বেগম তেমনই কয়েকজন। সবার নাম আমরা জানি না, ইতিহাসে হয়তো সবার নাম লেখাও হয় না। কিন্তু ইতিহাস যতটুকু উদার হওয়ার দাবি রাখে ততটুকুও যদি না হয় তখনই তৈরি হয় ক্ষোভ কিংবা আক্ষেপ। কারণ ইতিহাস রচিত হয় মানুষের হাতেই।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীদের বীরোচিত অবদান দীর্ঘ সময় চাপা পড়ে থাকলেও গত কয়েক দশকে ধীরে ধীরে সব প্রজন্মের কাছে উন্মোচিত হচ্ছে। নাম ধরে ধরে না হলেও মুক্তিযুদ্ধে সামগ্রিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে নারীর বহুমাত্রিক অংশগ্রহণ ও বীরত্ব। এই স্বীকৃতির বহিঃপ্রকাশের একটি মাধ্যম মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য। শুধু রাজধানীতে নয়, জেলা পর্যায়ে নির্মিত ভাস্কর্যগুলোতেও পুরুষের পাশাপাশি অবয়ব পাচ্ছে নারী মুক্তিযোদ্ধাও। আমাদের এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন শুধু বাঙালি নারীর নয়, বরং পুরো জাতির প্রগতির নিদর্শন।

নারীর হাতে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ভাস্কর্যটির নাম 'বিজয় একাত্তর'। জেলা পরিষদের অর্থায়নে রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ মোড় চত্বরে এটি উদ্বোধন করা হয় ২০২১ সালের মহান স্বাধীনতা দিবসে। ডিজাইনার ও নির্মাতা মো. গোলাম আলী। আর নারীর হাতে রাইফেল ভাস্কর্যটির অবস্থান ফরিদপুরের রাজবাড়ী মোড়ে। এই ভাস্কর্যটির নাম কিংবা নির্মাতার কোনো তথ্য চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। ■

লেখা ও আলোকচিত্র ● বিদ্যুৎ খোশনবীশ

কবিতা

নদী-দুহিতা

জরিনা আখতার

প্রিয় মাতৃভূমি, স্বদেশ আমার
তোমারও জননী আছে
তুমিও দুহিতা কারো
তুমি তো নদীমাতৃক,
নদীর স্তন্য পান করে
একটু একটু করে বেড়ে উঠেছ তুমি হাজার হাজার বছর ধরে,
পলিময় হয়েছে তোমার শরীর
একটু একটু করে লাবণ্যময়ী হয়েছ–
আজ অপরূপ এক অনন্ত যৌবনা,
নির্ঝর পর্বত অরণ্যে শোভিত তুমি
নিসর্গের অলংকারে তুলনাহীনা;
ধরিত্রীর অপরিহার্য অঙ্গ তুমি
ধরিত্রীর মতোই সর্বংসহা–
এই যে তোমার মৃত্তিকা চষে নিচ্ছি আমরা অমৃতের আকর,
জীবন ধারণ করছি তোমারই আচ্ছাদনে,
ঋতুচক্রের আবর্তনে নানা রূপে আবির্ভূত তুমি,
আমাদের শূন্য জীবন ভরিয়ে দিয়েছ
তোমার অকৃপণ দানে,
তুমিই তপ্ত মরুভূমি, সজল মরূদ্যান
তুমিই দুপুরের খর রোদ, সন্ধ্যার শীতল প্রচ্ছায়া
পাখি ডাকা ভোরের স্নিগ্ধতা তুমি–
ঝিঁঝিঁপোকা ডাকা নিঝুম মধ্যরাতে
নিরুপদ্রব শান্তির ছায়াপথ।

দহনবেলা

সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য

মামা, বকুলসুখ আর হাসের কিলানের তলায়
পাড়া সংসারটি ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যখন
চোখের সামনে হু হু শ্মশানপুরী

একবুক সমান জলের ওপর সাজানো পানসিতে
ছেলেটি একদিন বলেছিল আমি নির্জনতা পছন্দ করি
টিনটিন ব্যথার তখন দহন

একটু পরেই গনগনে চাঁদ আগুন জ্বালাবে
মাই মাই সোনা মন মেলিয়া সাজোয়ারা সমাবেশে
আবির ও গন্ধম ছুঁয়ে ভিজে যাবে টাঁদোয়ার নীচে

অবধি আবহমান

রোকেয়া ইসলাম

তুমি বিহীন কষ্টবেলার এই পাট
নিয়মের করাত টানে ভাঙে
এই যে নৈমিত্তিক উন্মাত্ত
অন্তরের অভিঘাত
তার অবচেতন কতোটুকু বা কে জানে।
চৈত্রের তিয়াস
শুকিয়ে যাওয়া অপলাপের লোনতা নিঃসরণ অথবা
ঝরে যাওয়া টুলটাপ রক্তকরণ
আজ খুব প্রাসঙ্গিক;
বেখেয়াল বাতাসের অনুরণনের অতীত যাপন
ঘড়ঘোর এই উপাখ্যান....
কেউ জানে না সীমান্ত তোমার
কেউ চেনে না ধমনী প্রবাহে পথ
জোয়ার-ভাটার নিরবধি বয়ে চলা জীবনে
মেনে নেই নি অন্যথা...
পথ চলতেই পথের খোঁজ
চমকে উঠি থমকে দাঁড়াই
নির্দ্বিধায় হররোজ।
অবধি আবহমানে
কেউ নেই আশেপাশে
কেউ নেই নিশ্বাসে
সেই একান্ত আপন;
তবুও অপার আগ্রহেই বয়ে যায়–
নিদারুণ অচেনা যাপন....

ফুসফুসে আঁকবো তোমায়

নাসরীন রশীদ

আজ আঁকবো তোমায়
চুল থেকে নখ, হাতের সিগারেটটাও,
খুলোটে পাঞ্জাবি, কাঁধের ব্যাগ
অর্থবিহীন মানিব্যাগসহ
বিত্তহীন তোমাকে।
কবিতায় তুমি, মলাটের রঙের ভেতর
ডুবে থাকা তুমি,
এলোমেলো বিক্ষিপ্ত তোমাকে।
তোমার চোখ দুটো সমুদ্র
আঙুলগুলো রংতুলি,
শাত সকালের কুয়াশার মত
ঠান্ডা তোমার কপাল
শুধু ভাবনাগুলো তপ্ত পিচঢালা পথ।
আজ আঁকবো তোমায়
পুরোনো সাইকেল
হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি
আর শান্ত সুবোধ
দু চায়ের কাপ হাতে তোমাকে।
তোমাকে আঁকবো
গ্রাফাইট পেন্সিলে, কাঠকয়লায়
সন্ধ্যার আবছা রঙে
লাল লাল ফুসফুসে
হৃদপিন্ডের খুব কাছেই।

ত্রিধা

পারুল কর্মকার

ক্রমশ একটি ঘূর্ণায়মান চক্রে প্রবাহিত হচ্ছে
সৃষ্টি-স্থিতি এবং আত্মসিদ্ধির গতি।
কিছু গল্প থেকে বিচ্ছুরিত হয় হীরক দ্যুতি,
কিছু গল্প থেকে বিচ্ছুরিত হয় সোনা-কাদা-জল।

এখানে কতোজন আসে-যায়,
কত্তো সাথে সম্পর্ক তৈরি হয়
আবার ভেঙেও যায়।

বোধনের ঘন্টা বেজে ওঠে
আমি শীত কুয়াশায় জড়িয়ে নেই
জলজীবনের এলোমেলো কথা।
নিরুপ কথারা চুপটি করে
লেখে থাকে কবিতার খাতা।

আর তুমি! সমস্ত কৌণিক বিন্দু ছুঁয়ে
এঁকে দিচ্ছো একটি চিত্রকলা।

'ত্রিধা' তবে এসো—
ত্রিবেণী সঙ্গম পেরে
কিছু স্বপ্ন তুলে আমি নীলাদ্রি গভীরতা।
তুমি তার বিশালতায় ভাসো
আমি তার রূপরেখা খুঁজি।

সাদ্ধ্য গল্প

নাজনীন চৌধুরী

দিন যেমন তেমন কাটে
মধ্যরাতে আচমকা জেগে উঠি
হুড়মুড় করে
মনে হয় কে যেন ডেকে গেলো চেনা গলায়
আজকাল আর আগের মতো মনে পড়ে না অনেক কিছু
চকের সেই বাবলা গাছের বাঁকানো ডাল ধরে গল্প করা
গাঁও গেরামের কিশোরী আবদার দুই পয়সার টাকা
খাওয়া, লাল-হলুদ স্যাকারিন দেওয়া আইসক্রিম খাওয়া
যা কিছুই আর সামনে আসে না।

এপাড়া ওপাড়া টইটই করে ঘুরে বেড়ানো
আজ মনে করলে নিজেই হাসি
কতো বকুনিঝকুনি মায়ের— তারপরও স্নেহের আঁচলের
কোনা ধরে মধুর ক্লান্ত ঘুম নেমেছে।

এখন সান্ধ্য গল্প হয় চায়ের কাপে চুমুকের
অবসরে
সে গল্প শুধুই নিজেকে নিয়ে।

মানুষ

রুবাইদা গুলশান

ইচ্ছে করে মাথার খেলায় আলোর ছায়ায়
যাই উড়ে যাই চুপটি করে
বাঁধনহারা প্রজাপতির রঙিন ডানায়।
নরম মেঘের আলতো ছোঁয়ায়
যাই ভেসে যাই দূর অজানায়।
সেই খানেতে নীলচে মেঘের গল্প জমে দূর পাহাড়ের গায়ে গায়ে
সেইখানেতে ভিড় করে রোজ দলছে সাদা মেঘের মেয়ে।
সেই মেয়েটির হাসির সুরে
যাবো ভেসে দূর থেকে দূর আরো দূরে!
কী যেন নেই, কী যেন নেই ভেবে ভেবে
হঠাৎ পথে
একটু থেমে আসবে তুমি আমার মনে।
দেখব তখন পেছন ফিরে
একলা আমি যাচ্ছি ভেসে
যাচ্ছি উড়ে অনেক দূরে, আসছে ভোর, আসছে সকাল,
দেখছি বিকাল এই তো জীবন কাটছে এমন।

যাচ্ছি আমি অনেক দূরে,
সূর্য তখন কিরণ ঝরে,
সেই মেয়েটির এলোচুলে সন্ধ্যা এলে ভয় পেয়ো না,
আবার আমি আসবো ফিরে
তোমার কাছে মানুষ হয়ে।

ছোটগল্প

নামহীন

দিলারা মেসবাহ

সত্যি চমৎকার হয়েছে রাতের ঘুম। আড়মোড়া ভেঙে দেখি শিথানে সদ্য সকাল! মনোরম শান্তিময়। আজ পুরো দিন আমার কব্জায়। আয়েশের দিন– আহা ছুটির দিন। প্রতিটি মুহূর্ত হিসেব করে কঞ্জুসের মতো খরচ করতে চাই।

বিশ বছরের খানাবুয়া পুতলির মা আমবাতের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে শয্যাগত। আর পারিনা! দিক সঁপে চলে যাক যেদিকে চায়। দিন কাটছে, তবে হেসে খেলে রসে বশে নয়।

বিজলি নামে এক নও

যুবতী আসেন সগৌরবে, ছুটাবিবি। কেন সে গোড়ালি ফাটা ঠ্যাঙের পায়ে রুপার নূপুর বাজায়, বুঝি না বিলকুল। ঝিকিমিকি বোরকা তার, পোশাকে নানা কিসিমের গহনাদি। একজোড়া শুঁয়াপোকা, দুই ভ্রু নাচিয়ে বিজলি ঘোষণা দিল আজ। আমার সহাস্য সকালে, 'টাইম শর্ট কইলাম মেডাম। বান্দবীর পোলার বাতচে। কালিয়াকৈর যাওন লাগব।'...

বাতাসে কানকথা ওড়ে। কান দেবার সময় নেই। ঘরের মানুষ ছেড়া। ডজনখানেক মর্দা মানুষের সাথে আশনাই তার।

ডেমোক্রেসি শব্দটি ব্যাপক। আমার রাজত্বে ধারণাটি বিপাকে পড়ে টিকে আছে বটে।

আমি মানুষটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকল্যাণ বিষয়ে পড়াই। মহিলাদের আত্মজাগরণের ওপরে আমার নিত্য ফোকাস। ভারী ভারী নিবন্ধ লিখি। সভা-সমিতিতে ডাক পড়ে। মাঝেমধ্যে সহি উচ্চারণে বক্তব্য রাখি। করতালি মুহুর্মুহু, এন্তার ঘোষা।

জানালার ওপারে জারুল গাছটি পুষ্পময়। দুটো চন্দনা টিয়া ডালে বসে হিক্কা অথবা প্রেমালাপ করছে।

তারস্বরে বেজে ওঠে রিংটোন। আজ ওটার গলা টিপে রাখব ভেবেছিলাম। বেমালুম ভুলে গেছি। মোহসিনা মণি, দেবর কন্যা। আমুখাদি থেকে ভেসে আসে তার রুপসী কণ্ঠ। মুহূর্তে সকালটুকু কালো পাথর। চাচিমা মা হসপিটালাইজড। সিরিয়াস কন্ডিশন। আইসিইউতে আছেন। আরোগ্য নিকেতন, গ্রীনরোড। একবার যদি দেখেন। আপনি যাকে খুব ভালো... বসির স্বর রুদ্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহ ভরসা আওড়াতে আওড়াতে তৈরি হয়ে গেলাম। আপন মা। বিবেক বিবেচনা না থাকলে মানুষ আর অমানুষে ফারাক কোথায়? পুরনো বাড়ীবাগ লেকের কোলে একান্নবর্তী পরিবারে কাটিয়েছি একযুগ। ভুলি কেমনে! সেই বড় পুরনো কাসুন্দি।

শাহ আলমের বিবি বৌকেলা থেকে বোলাকোলা। চিররুগ্ন। বেচারির ফ্যাকাসে মুখ। নিরাসক্ত ভাবভঙ্গি। সহস্র নিন্দামন্দ ব্রেক তার মাথার ওপর দিয়ে যায়। হজমশক্তি নেহায়েত কাহিল। কিন্তু ভালোমন্দ খেতে চায়। ও মোটামুটি হোপলেস। আমায় কতদিন ইলিশ পাতুড়ি খেতে চেয়েছিল। বলেছি একটু ফ্রি হয়ে নেই।

সংসারের গুরু দায়িত্ব কাঁধে। কেমন করে সামাল দিয়েছি জানি না।

তিনজন রান্নাঘরিনী ননদিনী। জানতাম শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত করা লাগে। কিন্তু ননদিনীদের ভালোমন্দ, রুটিন মাফিক গরম ভাত ব্যাঞ্জন, সেও সিলেবাসের মধ্যে পড়ে। স্বামীধন বাণী চিরন্তনী শোনাতেন, সোনা পুড়ে পুড়ে খাঁটি হয়।

প্যাচাল পাড়ার অভ্যাস দিন দিন বাড়ছে। আমার দুই বাচ্চা রুনু, ঝুনু। গরুর কাঁধের জোয়াল আর কত ভারী! দৃশ্যমান, তাই সভ্য সমাজ আহারে উহুরে করে। প্রথম বছরের মাথায় শাহ আলমের পুত্র হলো। তারপর আরও দুই কন্যা। শিং, মাগুর, আমলকী, কাঁচকলা, শৈশবের আমদানি পাতের ঘরে। শাহ আলম পৌষ্টিক নয়, কিন্তু সন্তানের মাতৃদুগ্ধ পান বিষয়ে কড়া নজর। যে কারণে পথ্য, বিশ্রামের আয়োজনে ঘাটতি নেই।

হিরা, চুনি, মনির মায়ের প্রতি এক অভাবিত করুণাময় স্নেহ উথলে ওঠে আমার। কল্যাণী সেবা প্রসঙ্গ তোলা থাক। এত পীড়াদায়ক ভালো না। আলম শিং মাছের ঝোল ঢেলে দিয়ে নসিহত করে, কাঁচকলা দিয়ে ঝোল করে দিলেন। হিরার ব্রেস্ট ফিডিং ঠিকমতো হচ্ছে না।

হিরার মা ঘুমিয়ে থাকে ঘুমন্ত শিশুর পাশটিতে। সারাদিন কি এত ঘুমায় বেচারি, নাকি সংসার থেকে পালিয়ে থাকে।

আমি মরিয়া হয়ে ডাকি, 'ওঠ খোকন সেরে নাও। তোমার একটু বেশি সময় লাগে। পরে ওরা স্কুল থেকে ফিরলে লাইন লম্বা হবে।' বেচারি পাশ ফিরে শোয়। 'উঠমুনে, বাইতে হিরা ঘুমাইছে। ভয় হয় নাই।'

আরে এমন কত বিনিদ্র রজনী কেটেছে মানিক। মাফ নাই। সকালে জোয়াল কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে।

পেরাছালি চলছে। ফাঁকে ফাঁকে রোকেয়া রচনাবলি মুখস্থ করি। আমার বাইবেল, সমুজ্জ্বল গীতাবলি। তখনো প্রভাবক হিসেবে অর্জন করিনি।

আরোগ্য নিকেতনের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। এখন আমরা কলুবাড়ির সংসার পেতেছি। মেয়েরা আমার মেধাবী মাশাল্লাহ। ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্সে পড়ে। শুধু বলা হয়নি আমার ছেলে আলমের কথা। রুনু-ঝুনুর পর আলম এসেছে কোলে। ও এখন মেডিক্যাল কলেজের ফার্স্ট ইয়ার।

করোটি জুড়ে যাত্রার স্মৃতির জোনাক। মনির মায়ের ফ্যাকাশে মুখে কোন সুখের চিহ্ন আঁকা থাকত জানি না।

মনির মা ইলিশ পাতুরি খেতে চেয়েছিল। আমি ফ্রি হতে পারিনি। আবদার রাখতে পারিনি। আচ্ছা আইসিইউ থেকে মানুষ ফিরেও তো আসে? আহারে।

হাইওয়ে জুড়ে মাস্তানার জ্যাম। অনিঃশেষ পথ। ভয় করে হিরা চুনি মনির মা। শ্রাবণের এক দুপুরে বলেছিল, আপনের হাতের চিনিগুঁড়া চালের ভুনি খিচুড়ি খাইছি হবে। এখনো মুখে লাইগা আছে। রাঁধবেন, ভাবি। হিরার আব্বুরে কমুনে খাসির গোশত আনতে।

সে পর্বও মুলতবি হয়ে গেছে।

স্বামীবাগ সেকেন্ড লেনের একান্নবর্তী পরিবারে মনের কথা বলার মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। আলমের বৌয়ের ভাবলেশহীন অবয়ব। আর তিন ওয়াক্তের আহার্যের চিন্তায় ব্যাকুল মানুষটার সাথে কি আলাপ চলে। তারচেয়ে পুতলির মায়ের লড়াইয়ের গল্প, স্বামীর তিন নম্বর বিয়ের বিবরণ শোনা অনেক কিছু। ওর গল্পে জীবনের খোঁজ খুঁজে পেতাম। আমার কাঁচাখাল।

ঘুরে ফিরে কেবল মনির মায়ের নির্জলা চিত্রচিহ্ন দেখছি। কবেকার আমাদের যৌথ বাগানের ইতিকথা। ফিরে এলো মনির মা। আসতেই হবে। ইলিশ পাতুরি খাওয়াব। আমি এখন অনেকটা ফ্রি। ভুনি খিচুড়ি তুলসীমালা চালের। অনলাইনে কিনেছি।

সেই যে তুমি! নার্সিসাস প্রেমের দেবী? মনে পড়ে পাকের ঘরের কোনটি কোনায় একটা জলচৌকি পাতা ছিল, ওখানটায় তুমি শিং মাছের থানকুনি ঝোল মেখে জোয়াল সেঁকে সেঁকে ভাতের গ্রাস চিবুতে। প্রায় একঘণ্টা পেরিয়ে যেত। কোন খবর নেই। আহা বেজারি। মায়া আর বিরক্তি দুটোই জাগত বটে।

এদিকে খানার টেবিলে মৃদু হল্লা। বাকি ৯ জন ফ্যামিলি মেম্বারের আহার পর্ব। কলকাঠিটি আমাকেই নাড়তে হতো। ননদিনীরা হাত ধুয়ে খেতে বসত। ভাঁটকি বিটিকলা দিয়ে খাঁটি। রুই মাছ বেগুন দিয়ে। ঘন মাসকলাই ডাল ইত্যাদি। কোনদিন বোনটি তুমি বাথরুম আটকে গোসল করতে, সেও ঘন্টার কাঁটা পেরিয়ে যেত। সবাই ওৎ পেতে থাকত। উনি কি ঘুমিয়ে গেছেন। কে কি বলল, কি ভাবল এসব বিষয় নিয়ে বিন্দুমাত্র
ভ্রূক্ষেপ ছিল কি তোমার? তুমি কেমন গো! সংসারে থেকেও নেই।

হিরা চুনি মনিকে শাশুড়ি মা একরকম বাধ্য হয়ে নাওয়া খাওয়া করাতেন। তার ছোট ছেলের মাথা গরম।

অবশেষে
হসপিটালের কাছাকাছি। করোটিতে
তখনও শুশ্রূষাকারীর মতো
স্মৃতির বহর। চোখ ভরে
যাচ্ছে অশ্রু দানায়।
আহা আমার
সন্তানদের

বেলায় নবদেবাও হাততোলা নবাব। পুতলির মা আমার রক্ষাকবচ। পড়ার নেশা ছিল খুব। রাত জেগে পড়তাম পুরনো পাঠ প্রাগৈতিহাসিক, অতসী মামী, কবি, শেষের কবিতা, কপালকুণ্ডলা।
ও বাড়ির কারো শরৎচন্দ্র পড়ার নেশা ছিল বলে মনে হয়নি। আহারে আলমের বৌটা। ফিরে আসো বোনটি। গলার কাছে কেমন ধরে আসে।
ছিমছাম আধুনিক হসপিটাল। আইসিইউ ১১ তলায়। হুড়মুড় করে লিফট ধরলাম। মাস্ক টেনে দিলাম আবারও। পা দুটো একটু কাঁপছে কেন জানি। আমার হার্ট শক্তপোক্ত নয়।
আজ আমার কি হয়েছে জানি। নাক পর্যন্ত স্মৃতি জলে ডুবে যাচ্ছি। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। বয়স বাড়লে মানুষের মাথা বাতিক বাড়ে।
শাহ আলমের ব্যবসা এখন দাঁড়িয়ে গেছে। বৌটি ফিরে এলো। নিজের হাতে পাত পেড়ে খাওয়াব। আস্তে আস্তে ভালো করে টিকিয়ে দেও। তারপর একটা হজমি বড়ি খাইয়ে দেবো। লিফট বোঝাই দর্শনার্থী। তাদের চেহারায় লেপ্টে থাকা অস্থিরতা চুয়ে চুয়ে পড়ছে। সবার ভীষণ তাড়া। একমুহূর্তের অপচয় করতেও নারাজ। ঠ্যালাধাক্কায় আমি পিছিয়ে পড়লাম। চিরকালই আমার এমন দশা। মেনে নিতে পারি।
হসপিটালের করিডোর পার হচ্ছি। পা দুটো একটু একটু কাঁপছে। হাঁটছি আইসিইউ বরাবর। সুনশান ঝকঝকে তকতকে করিডোর। কেমন একটা নিস্তব্ধ শূন্যতার বুঁদবুঁদ চারপাশে। মনির মায়ের এনিমিক মুখখানি, সেই মায়া নিরাসক্ত অবজ্ঞা ডকুমেন্টারি ফিল্মের মতো করোটির মনিটর জুড়ে বসেই আছে।

দ্রুত হেঁটে যাই আরেকটুখানি সামনে। যোলদুরন্ত সুদর্শনা নার্স কথা বলছিল মোবাইলে। মাকের ডগা লাল, গালের চারপাশও। প্রেমালাপ হতে পারে। মেয়েটি হাসছে, কপট রাগ দেখাচ্ছে। আমি খানিক অপেক্ষা করলাম। কথা বেশ ফুরায় না তার। একসময় দয়া করে চোখ তুলে তাকাল সে।
আমি বিনীত অনুরোধ করে বললাম, 'সিস্টার আমার দেবরের ওয়াইফ, আইসিইউতে এডমিটেড। আমি তাকে একনজর দেখতে চাই। মিসেস শাহ আলম। ড. রাব্বানির পেশেন্ট। কাইন্ডলি একটু দূর থেকে দেখার পারমিশন দিন।'
'পেশেন্টের নাম বলুন।'
'নাম?'
আমি থতমত খেয়ে গেলাম। কোন শব্দ খুঁজে পেলাম না সহসা। শাহ আলমের বৌ। ছিরা চুনি মনির মা। ব্যস। এটুকুই পরিচয়। নাম? ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল শুক্রকলা সেবিকা। ঘাবড়ে যাচ্ছি। আমার যবান বন্ধ।
কথা বলাই যার কাজ। সভা-সমাবেশে আমার কদর কত?
আমি পুচকে মেয়েটিকে জাইবা দিচ্ছি। অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি।
আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'না মানে গতরাতে উনি এডমিশন নিয়েছেন। ব্রেন স্ট্রোক। মিসেস শাহ আলম।'
'সরি। এভাবে সম্ভব নয়।'
আমি ঢুলসে গেছি। পা সরছে না। মনে হয় প্রেশারটা এক লাফে বেড়ে গেছে।
সেবিকা হাই হিলের শব্দ তুলে খটখট করে হেঁটে গেল। দিশাহারা অধ্যাপিকা আমি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলাম।
একজন মাঝবয়েসী ডাক্তার সাহেব হেঁটে আসছিলেন। আমি প্রায় দৌড়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। একনজর চোখ তুলে বললেন, 'বলুন।' আমি বললাম সবিনয় করে, 'স্যার আমার দেবরের ওয়াইফ এখানে এডমিটেড। মিসেস শাহ আলম। গতরাতে স্ট্রোক করেছিল। ওর হাসবেন্ড ঢাকার বাইরে। একনজর দেখার পারমিশন দিন স্যার। চিরকৃতজ্ঞ থাকব। ওর মেয়ে আনুখালীতে। বসে থাকবে আমার কথা শোনার অপেক্ষায়। স্যার আমি অধ্যাপনা করি।'
'পেশেন্টের নাম বলুন'
'ও ও আমার প্রিয় জা। ছিরা চুনি মনির মা।'
বোকা বোকা কথাগুলো আমি বললাম! আবার রিপিট করলাম, 'মিসেস শাহ আলম। আমার আপন জা।'
রিস্টওয়াচ দেখলেন একনজর। ভ্রু কুঁচকে তাকালেন। ঠোঁট শীতল দূরু দিলেন, স্মিত হেসে বললেন, 'দেখুন আমাদের হসপিটালের গাইডলাইন আছে। ডিসিপ্লিন কড়া। আপনি পেশেন্টের নামই বলতে পারছেন না। এক্ষেত্রে আপনি কি আশা করতে পারেন।'
ড. দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। আমি কেন জানি পিছু নিলাম।
স্বগোতক্তির মতো বললেন, 'নরমাল কমনসেন্সের বালাই নেই।' বাতাসে ভাসতে লাগল কথার ঝাপটা।
অপমানের লজ্জায় আমার সকল বাকবিতণ্ডা পাথর হয়ে গেল।
ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি জোরে জোরে বললেন, 'প্লিজ ডোন্ট বি সিলি। এটা রেস্ট্রিকটেড এরিয়া। আপনি আসুন।'
ভগ্ন মানুষের বুঁদবুঁদ বুকে নিয়ে দূর কর্তব্যের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।
আমরা একসাথে দশ বছর কাটালাম। আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ছিলাম। ছিরা চুনি মনির মা, শাহ আলমের স্ত্রী এর বাইরে তার কি পরিচয় দরকার? কী দরকার?
শাশুড়ি ডাকতেন, 'ও ছিরার মাও।' আমসোজ্জ্বীন এক চিরকাল্লা জননী।
আমার থাম গোছল আর সমাপন হয় না। এত সাহিত্য পাঠ করেছি, অলক্ষির অধ্যাপক আমি। রাত জেগে কত চরিত্রের সাথে একাত্ম হয়েছি। ত্রিভুবনের বিচিত্র বেশে, অশিষ্যসুন্দর সাদা চরিত্রের নাম ধরে ধরে পরিচিত হয়েছি। অক্ষরের স্রোতের তোড়ে বাণিত জীবন দেখেছি। নামধাম জেনেছি।
আমি দাঁড়িয়ে থাকি। দাঁড়িয়েই থাকি। বিড়বিড় করে অন্ত মন, ওগো আত্মীয়া তোমার নাম কি?
উন্মাদের মতো আমি নিজের নামটির গায়ে হাত বুলাতে থাকি। বুলাতেই থাকি।■

জাহাঙ্গীর আলম

প্রযুক্তির উন্নয়নে নারী ও নারীর উন্নয়নে প্রযুক্তি

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নে নারীরা যুগে যুগে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। যদিও তাদের অর্জনকে প্রায়ই উপেক্ষা করা বা অবমূল্যায়ন করা হলেও তারা থেমে থাকেনি। প্রতিনিয়ত করে গেছেন বিজ্ঞান চর্চা এবং অবদান রেখে গেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে। নারীরা বিজ্ঞানের নতুন উদ্ভাবন, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, ভাষা বিকাশ, অ্যালগরিদম তৈরি, হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার ডিজাইন এবং আরও অনেক কিছুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আবার প্রযুক্তিও নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিভিন্নভাবে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে।

বিজ্ঞানের বিকাশের ইতিহাসের দিকে যদি তাকাই তা হলে প্রথমেই যার কথা মনে পড়ে তিনি হলেন মারি কুরি। তিনি ১৯০৩ সালে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের জন্য পদার্থ বিজ্ঞানে ও ১৯১১ সালে রসায়নে রেডিয়াম পৃথকীকরণের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। এছাড়া কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বিকাশে যার অবদান অসামান্য তিনি হলেন কম্পিউটার বিজ্ঞানী অ্যাডা লাভলেস। বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার হিসেবে বিবেচিত, অ্যাডা লাভলেস অষ্টাদশ-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে চার্লস ব্যাবেজের বিশ্লেষণাত্মক ইঞ্জিনের জন্য একটি মেশিন দ্বারা প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে প্রথম অ্যালগরিদম লিখেছিলেন।

আমাদের নিশ্চয় রাশিয়ান মহাকাশচারী ভ্যালেন্টিনা তেরেশকোভার কথা মনে আছে। ১৯৩৭ সালে জন্ম নেওয়া ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা বিশ্বের প্রথম নারী মহাকাশচারী। 'ভোস্তক সিক্স' মিশনের অংশ হয়ে মহাকাশে গিয়েছিলেন। তিনি মাত্র তিন দিনে পৃথিবীতে ৪৮ বার প্রদক্ষিণ করেছিলেন। তেরেশকোভাই একমাত্র মহিলা যিনি একক মহাকাশ মিশনে ছিলেন। এই মহাকাশচারী নারীর পথ অনুসরণ করে এখন অনেক নারী মহাকাশের পথে পাড়ি জমান, নিয়োজিত থাকেন মহাকাশ চর্চায়।

মার্কিন নারী বিজ্ঞানী গ্রেস হপার 'মাদার অফ COBOL' হিসাবে পরিচিত, তিনি ছিলেন একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানী এবং মার্কিন নৌবাহিনীর রিয়ার অ্যাডমিরাল যিনি প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষা, COBOL বিকাশে সহায়তা করেছিলেন। যা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বিকাশে এক যুগান্তকারী অবদান।

ইন্টারনেটভিত্তিক যে তৃতীয় শিল্প বিপ্লব পেরিয়ে আমরা এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যা হয়তো সম্ভব হতো না যদি রাদিয়া পার্লম্যান ইন্টারনেট আবিষ্কারের সূত্রপাত না করতেন। রাদিয়া পার্লম্যান 'ইন্টারনেটের মা' হিসাবে পরিচিত, তিনি স্প্যানিং ট্রি প্রোটোকল (STP), একটি সমালোচনামূলক নেটওয়ার্কিং অ্যালগরিদম তৈরি করেছেন যা আধুনিক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তৈরি করতে সক্ষম করেছে।

আমরা ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন বা তারবিহীন যোগাযোগের জন্য ব্লুটুথ ও ওয়াই-ফাই ব্যবহার করছি তা সৃষ্টির পেছনে যার অবদান, তিনি হলেন হলিউড অভিনেত্রী হেডি লামার। ১৯৩০ এবং ৪০ এর দশকে হলিউড অভিনেত্রী হেডি লামার একটি ফ্রিকোয়েন্সি হপিং সিস্টেমের সহ-আবিষ্কার করেছিলেন যা আধুনিক ব্লুটুথ এবং ওয়াই-ফাই প্রযুক্তির ভিত্তি হয়ে ওঠে।

এছাড়া আমেরিকান গণিতবিদ এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানী ক্যাথরিন জনসন, গ্রাফিক ডিজাইনার সুসান কেয়ার, কম্পিউটার বিজ্ঞানী এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞ ফেই-ফেই লিসহ আরো অনেক নারী বিজ্ঞানী যাদের বাদ দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চিন্তা করা যায় না।

ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক নারী বিজ্ঞানীর অবদান রয়েছে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়। আমাদের দেশের নারী বিজ্ঞানী ডক্টর সেঁজুতি সাহা যিনি একজন অণুজীব বিজ্ঞানী। আণবিক জিনতত্ত্বের এই গবেষক ২০২০ সালের কোভিড মহামারিতে বাংলাদেশের কোভিড-১৯ শনাক্তকরণের কাজে নতুন করোনাভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স সফলভাবে উন্মোচন করেন। এছাড়া ২০২৩ সালে নিউজ এজেন্সি ইউএনবি খবর অনুযায়ী গবেষণায় অবদানের জন্য তিন বাংলাদেশি নারী বিজ্ঞানী 'সেরা ও উজ্জ্বল ১০০ এশিয়ান বিজ্ঞানীদের' তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন। যা বাংলাদেশ নারীদের এক অনন্য সাফল্য।

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য বাংলাদেশের তথ্য ও প্রযুক্তি খাতকে করেছেন প্রসারিত। তথ্য ও প্রযুক্তি সেবা পৌঁছে দিয়েছেন মানুষের দোরগোড়ায় এবং প্রযুক্তিকে করেছেন সহজলভ্য। তিনি বিজ্ঞানী না হলেও সবার মাঝে প্রযুক্তি চর্চার যে সুযোগ তিনি করে দিয়েছেন তার এই অবদান বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় অনন্য।

প্রযুক্তির উন্নয়নে আমরা যেমন নারীর অসামান্য ভূমিকা দেখলাম ঠিক তেমনি প্রযুক্তিও নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিভিন্নভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। প্রযুক্তি নারীদের জন্য শিক্ষাকে করেছে আরও সহজলভ্য, বিশেষ করে প্রত্যন্ত বা অনগ্রসর এলাকায়। নারী তার গন্ডির বাইরে থেকে জ্ঞান আহরণের সুযোগ পাচ্ছে ইন্টারনেট ও বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার মধ্যেও নারী প্রযুক্তির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনে পিছিয়ে নেই এখন তারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে সহজেই নিজেকে নিতে পারছে। অনলাইন কোর্স, ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম এবং অন্যান্য ডিজিটাল রিসোর্স মহিলাদেরকে নতুন দক্ষতা শেখার এবং জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দিয়েছে যা তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সাহায্য করছে। প্রযুক্তি নারীদের তাদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার বিষয়ে অধিক সচেতন করেছে। টেলিমেডিসিন মহিলাদের জন্য দূর থেকে স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলো প্রাপ্যতা সহজ করেছে। অ্যাপস এবং ফিটনেস ট্র্যাকার এর মাধ্যমে এখন নারীরা পুষ্টি ট্র্যাক করতে পারে, মাসিক চক্র নিরীক্ষণ করতে পারে, স্বাস্থ্য টিপস এবং পরামর্শ পেতে পারে।

ইতিমধ্যে প্রযুক্তি নারীদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে গিগ ইকোনমি এবং রিমোট ওয়ার্ক ব্যবস্থাপনায় নারীরা বাসা থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে। প্রযুক্তি নারীদের নিজেদের ব্যবসা শুরু করতে এবং অনলাইনে পণ্য ও পরিষেবা বিক্রি করতে সক্ষম করেছে।

এছাড়া প্রযুক্তি নারীদের নিরাপত্তায় নানাভাবে অবদান রেখেছে। জিপিএস ট্র্যাকিং ডিভাইস এবং মোবাইল প্যানিক বোতাম জরুরি পরিস্থিতিতে মহিলাদের সাহায্য করতে পারে। আবার নারীরা তাদের মত প্রকাশ ও অধিকার নিশ্চিতের জন্য বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও প্রযুক্তিগত সহায়তা গ্রহণ করতে পারছে।

শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ পর্যায়ের নারীরা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে গ্রামীণ অর্থনীতিতে। সরকারের পাশাপাশি ব্র্যাক, আশা ও বুরো বাংলাদেশ এর মতো সামাজিক উন্নয়ন সংস্থাগুলো বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীর উন্নয়ন, নারীর প্রযুক্তিগত অন্তর্ভুক্তি ও নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে মহিলাদের মধ্যে অর্থনৈতিক সেবার সাথে প্রযুক্তিগত সেবা দিয়ে নিশ্চিত করছে নারীর প্রযুক্তি ব্যবহার।

রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও নারী প্রযুক্তির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনে পিছিয়ে নেই এখন তারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে সহজেই নিজেকে নিতে পারছে। অনলাইন কোর্স, ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম এবং অন্যান্য ডিজিটাল রিসোর্স মহিলাদেরকে নতুন দক্ষতা শেখার এবং জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দিয়েছে যা তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সাহায্য করছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে নারীরা যে অবদান রেখেছে প্রযুক্তিও তার প্রতিদান নিশ্চিত করছে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে। নারীর ভিন্নভাবে দেখার ক্ষমতা ও সৃজনশীলতা প্রযুক্তিকে দিয়েছে এক ভিন্নমাত্রা। নারীর হাতে প্রযুক্তি যেমন উৎকর্ষতা পায় তেমনি প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় নারী অর্জন করেছে নিজেকে তুলে ধরার সাহস ও শক্তি। সবাই মিলে নারীর অধিকার রক্ষা করি ও নারীবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করি।

লেখক । কর্মকর্তা-আইসিটি
বুরো বাংলাদেশ

এ বি এম তাজুল ইসলাম

কৃষির উন্নয়নে নারীর ভূমিকা এবং বাস্তবতা

কৃষি এবং নারী ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য আলোকিত গল্প। নারীর অনেক কাজের মধ্যে কৃষিই উল্লেখযোগ্য। আদি পেশা কৃষির সূচনা হয় নারীর হাত ধরেই। ঘরের কাজের পাশাপাশি তারা কৃষিকাজও করে আসছে বহুকাল থেকে। আগে গ্রামীণ সমাজে মাঠ কৃষির কার্যক্রমে পুরুষরাই ছিল অগ্রগামী অন্যদিকে রান্নাবান্না আর সন্তান লালন-পালন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকত নারী। কিন্তু সময়ের আবর্তনে নারীদের এখন ঘরে-বাইরে কর্ম করে খাওয়া লাগে। গৃহিণী নামক গৃহস্থালি ব্রতপালনের পেশা দিয়ে আর পরিবার চলে না। পরিবারের সবাইকে রেঁধে খাওয়ানোর আগে ক্ষেত্রবিশেষ বাজারটাও তাদেরই করা লাগে এখন। গৃহস্থালি কর্মের সাথে ফসলি মাঠ থেকে টিসিবির ট্রাকের সারি পর্যন্ত সর্বত্র নারীরাই এখন অগ্রগামী।

কৃষিতে এখন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হচ্ছেন নারীরা। কৃষি খাতের উন্নয়নের সাথে দেশের বিপুল জনসংখ্যার খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তাই খাদ্যনিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কৃষি খাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। আর এর অন্যতম অংশীদার এ খাতের নারী শ্রমিক ও উদ্যোক্তারা, বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারির সময় গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতি সচল রাখতে এ খাতের নারীরা ব্যাপক অবদান রেখেছেন।

শ্রমশক্তি জরিপ (২০১৭) অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬ শতাংশ কৃষি শ্রমের সাথে যুক্ত। পরিসংখ্যান বলছে, বৃহত্তর কৃষি অর্থনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমেই বাড়ছে। গত ৫০ বছরে কৃষিতে নারীর সংখ্যা শতকের ঘর থেকে কোটিতে পৌঁছে গেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ (২০১৭) অনুসারে, কৃষিতে এখন নারীর অংশগ্রহণের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ১১ লাখ। শতাংশের বিবেচনায় যা ১৮.৩ শতাংশ। ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০১৬-২০১৭ সময়ে দেশে কৃষি, বন, মৎস্য, হাঁস-মুরগি, পশুপালন ও কৃষিকাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৩৭ লাখ থেকে বেড়ে প্রায় ১ কোটিরও বেশি আর ৭২ শতাংশই অবৈতনিক পারিবারিক নারী শ্রমিক। গত ২০ বছরের সময়ের তুলনায় বর্তমানে কৃষি, বন ও মৎস্য খাতে পুরুষ শ্রমিকের অংশগ্রহণ ১১ শতাংশ কমলেও বেড়েছে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ। অথচ ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দেশের খাদ্যনিরাপত্তা উন্নয়নে অবদান রাখা এসব নারীর অবদানের স্বীকৃতি আলোচনার মধ্যেই নেই।

'রাইট টু ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ওয়াচ-২০১৯' বলছে, বিশ্বব্যাপী যে পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হয়, তার ৮০ শতাংশই আসে পারিবারিক কৃষি থেকে। চাষের জন্য জমি প্রস্তুত থেকে শুরু করে ফসল ঘরে তোলা ও বাজারজাতকরণের পূর্ব পর্যন্ত কৃষি খাতের ২১ ধরনের কাজের মধ্যে ১৭টিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। ফসলের প্রাক-বপন থেকে শুরু করে ফসল উত্তোলন, বীজ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার অধিকাংশে নারী এককভাবেই করে। বাড়ির বাইরে ফসল ও সবজি চাষ, মসলা উৎপাদন, শুঁটকি ও মাছ প্রক্রিয়াকরণ, বসতবাড়িতে শাকসবজি, ফল, ফুল চাষ, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, জ্বালানি সংগ্রহ থেকে কৃষি বনায়ন এর প্রায় সব ক্ষেত্রেই নারীরা প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। এ ছাড়া চা-শিল্পের মতো দেশের একটি সমৃদ্ধ খাত যেখানে নারী শ্রমিকরাই এর মূল চালিকাশক্তি।

ইউএন উইমেনের তথ্য বলছে, পর্যাপ্ত সুযোগ ও প্রযুক্তিগত বাধা দূর করতে পারলে নারী শ্রমিকদের মাধ্যমে কৃষিতে উৎপাদনশীলতা ২.৫ থেকে ৪ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। এছাড়া নারীদের কৃষিতে সরাসরি নিয়োজিত করা গেলে পরিবারের অপুষ্টি কমার গতি বৃদ্ধি পেতে পারে ১২-১৭ শতাংশ পর্যন্ত।

পুরুষদের মধ্যে যত সংখ্যক পুরুষ কৃষিকাজে যুক্ত, তার চেয়ে নারী কর্মজীবীদের মধ্যে অনেক বেশিসংখ্যক নারী কৃষিকাজে সম্পৃক্ত। পুরুষরা মূলত শহরে পড়াশোনা, চাকরি ও ব্যবসার দিকে বেশি ঝুঁকে যাওয়ায় গ্রামীণ কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। এমনিতেই কৃষি উদ্যোক্তাদের নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এই চ্যালেঞ্জের মাত্রা আরো বেশি। এক্ষেত্রে ভূমির মালিকানা একটি বড় ফ্যাক্টর। বর্তমানে ভূমির মালিকানায় পুরুষের আছে ৮১% নারীর মাত্র ১৯%। বাড়ির মালিকানা ক্ষেত্রে পুরুষের ৮৬% বিপরীতে নারীর ১৪%।

উদ্যোক্তা হিসেবে আর্থিক সংকট, ঋণ না পাওয়া, ভূমির মালিকানায় সম-অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া এবং উৎপাদিত পণ্যের সঠিক বিপণন ব্যবস্থার অভাব এবং গ্রামীণ হাটবাজারে প্রবেশসহ যোগাযোগ অবকাঠামো ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকা ইত্যাদি নানাবিধ প্রতিকূলতার কারণে নারীরা কৃষি খাতে উদ্যোক্তা হতে উৎসাহিত হয় না।

ভূমির মালিকানায় নারীর অংশগ্রহণ কম থাকার কারণে উদ্যোক্তা হিসেবে নারীদের আর্থিক সহায়তার জন্য ব্যাংক ঋণ পাওয়া খুবই জটিল এবং কষ্টসাধ্য একটি বিষয়। এক্ষেত্রে বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে দেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো নারী উদ্যোক্তাদের পাশে থেকে আর্থিক সহায়তায় অসামান্য অবদান রাখছে এবং নতুন নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। তবে সমাজ ও পরিবারে নানামুখী অবদান রাখা সত্ত্বেও এখনো নারীরা মজুরির ক্ষেত্রে পিছিয়ে থেকে বৈষম্যের ক্ষেত্রে এগিয়ে।

কৃষিনির্ভর অর্থনীতির দেশে কৃষিকে যেমন উপেক্ষা করা যায় না, তেমনি এ খাতে নারীর অবদানকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। নারী কর্মজীবীদের মধ্যে কৃষিতে প্রায় ৬০ শতাংশ নারী যুক্ত থাকায় অর্থনীতিতে নারী কৃষকদের ভূমিকা ব্যাপক কিন্তু ভূমির মালিকানা না থাকায় তারা সরকারি সুবিধাদি, কৃষি কার্ড, ভর্তুকির সুবিধা পান না। কৃষি খাতে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের স্বীকৃতি ও ন্যায্য মজুরি প্রদান নিশ্চিত করতে পারলে দেশের কৃষি উৎপাদন কাজে নারীরা আরো আগ্রহী হবে। এর ফলে কৃষি খাতের উৎপাদন বাড়বে, জিডিপিতে কৃষির অবদানও বাড়বে। তাই কৃষিকাজে জড়িত নারী শ্রমিকদের মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। ভূমির মালিকানা থেকে শুরু করে নারী শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার রক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেওয়াসহ বিপণন ব্যবস্থায় নারীকে সম্পৃক্ত করতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি উদ্যোক্তা হিসেবে নারীকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি। ■

লেখক : সহকারী কর্মকর্তা-কৃষি
ব্যুরো বাংলাদেশ

ফটো অ্যালবাম

বালিয়াটি জমিদার বাড়ি

মানিকগঞ্জ

বালিয়াটি জমিদার বাড়ি মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলায়। সাতটি সুবিশাল ভবন নিয়ে প্রায় ছয় একর জায়গায় ওপর ১৯ শতকে নির্মিত হয়েছিলো এই কমপ্লেক্স। গোড়াপত্তন করেছিলেন গোবিন্দ রাম সাহা নামক একজন লবণ ব্যবসায়ী। তবে জমিদার বাড়ির সব ভবন একই সময়ে নির্মিত হয়নি। কালের পরিক্রমায় গোবিন্দ রামের উত্তরসূরিরা এই ভবনগুলো নির্মাণ করেছিলেন। কিশোরীলাল রায় চৌধুরী ও রায়বাহাদুর হরেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী তার উত্তরসূরিদের মধ্যে অন্যতম। কিশোরীলাল রায় চৌধুরীর উদ্যোগেই ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো জগন্নাথ কলেজ, যা বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়। জগন্নাথ রায় চৌধুরী ছিলেন তার বাবা।

বালিয়াটি জমিদার বাড়ির প্রবেশমুখে একই সারিতে আছে চারটি ভবন। মাঝখানের দুটি তিতল আর দুই পাশের দুটি দ্বিতল। চারটি ভবনের সামনে চারটি সিংহমূর্তি বিশিষ্ট প্রবেশদ্বার। আবাসিক ও প্রশাসনিক কাজে এই ভবনগুলো ব্যবহৃত হতো। এগুলোর একটি এখন ব্যবহার করা হয় মিউজিয়াম হিসেবে। দুই তলা লোহার সিন্দুক, বেলজিয়াম আয়না আর বিভিন্ন আসবাবপত্র সংরক্ষিত আছে এখানে। প্রায় দুইশ বছর আগের বেলজিয়াম আয়নায় নিজের নিখুঁত প্রতিবিম্ব দেখে যে কেউ বিস্মিত হবে। জমিদার বাড়ির অন্দর মহলে আছে আরো চারটি সুবিশাল ভবন ও একটি বড় দীঘি। ছয়টি ঘাট থাকায় এটিকে বলা হয় ছয়ঘাটা দীঘি। জমিদার বাড়ির পূর্ব ও পশ্চিম পাশে আছে দুটি কুয়া। সব মিলিয়ে ঘুরে দেখার মতো স্থান এই প্রাসাদ-বাড়ি। ১৯৬৮ সাল থেকে বালিয়াটি জমিদার বাড়ি সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতায় সংরক্ষিত রয়েছে। রবিবার পূর্ণ দিবস ও সোমবার অর্ধদিবস সাপ্তাহিক বন্ধ এবং প্রবেশমূল্য ২০ টাকা।■

● আলোকচিত্র
বিদ্যুত খোশনবীশ, নির্বাহী সম্পাদক, প্রত্যয়

আব্দুর রহমান

রুনা বেগমের স্মার্ট কৃষি

রাজশাহীর পোদাশাড়ী উপজেলার বিরইল গ্রামের মোছাম্মৎ রুনা বেগম একজন ক্ষুদ্র প্রান্তিক ও বর্গা কৃষাণী। তার বয়স প্রায় ৪৫ বছর। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে সংসারের শুরু থেকেই বিভিন্ন স্বপ্ন ছিলো তার। এ স্বপ্ন পূরণ করার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে আসছেন তিনি। রুনা বেগমের এক মেয়ে, এক ছেলে। চার সদস্যের সংসার। বর্গা ও নিজস্ব সর্বসাকুল্যে তার মোট খাদী জমির পরিমাণ ১২৫ শতাংশ। বসতবাড়ি ১০ শতাংশে জমির ওপর। অনেক বছর ধরেই ধান চাষ করছিলেন তিনি কিন্তু কখনো খরচের টাকা উঠলেও আশানুরূপ বাজারমূল্য না পেয়ে লোকসানের বোঝা বহন করছিলেন। তিনি স্থানীয় ব্যুরো বাংলাদেশ, কৃষি অফিস ও প্রাণিসম্পদ অফিসের পরামর্শে গত কয়েক বছর ধরে ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু করেন ধান চাষ, গরু, কবুতর ও রাজহাঁস পালন। এতে লাভের মুখ দেখলেও পুঁজির অভাবে বাড়তে পারেনি গরু মোটাতাজাকরণ ও ধান চাষের পরিধি। তার ঊদ্যম ও কঠোর পরিশ্রমের মানসিকতা দেখে এসএমএপি প্রকল্পের আওতায় পুঁজির যোগান দিতে এগিয়ে আসেন ব্যুরো বাংলাদেশের রাজাবাড়ীহাট শাখা।

প্রথম ধাপে ২০২২ সালে ব্যুরো বাংলাদেশ তাকে রাজাবাড়ীহাট শাখার সদস্য করে বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাইকার আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত এসএমএপি প্রকল্পের আওতায় এক লাখ টাকা ঋণ প্রদান করে। এসএমএপি সদস্য হিসেবে টেকনিক্যাল ওরিয়েন্টেশন পাওয়ার পর সেই টাকা দিয়ে ১টি ছোট ষাঁড় গরু, ৮টি কবুতর ও ২টি রাজহাঁস ক্রয় করেন তিনি। পরবর্তীতে ষাড়টি ১ লাখ ১০ হাজার টাকায় বিক্রি করেন। ষাঁড় গরু বিক্রি করে ৪০ হাজার টাকা লাভ হয়।

বর্তমানে রুনা বেগমের ৬টি গরু, ২০টি কবুতর ও ৬টি রাজহাঁস রয়েছে যার মূল্য প্রায় ৫ লাখ ৫৫ হাজার টাকা। দ্বিতীয় ধাপে ২০২৩ সালে পুনরায় এক লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন তিনি। ঋণের টাকা দিয়ে আধুনিকভাবে গরু মোটাতাজাকরণ, ব্রি-৩৪ ধান চাষ শুরু করেন ১১৫ শতাংশ জমিতে। তার ধান চাষে খরচ হয় ৫২ হাজার টাকা এবং বিক্রি করেছেন ৯৪ টাকার। এই বছরে তিনি ধান বিক্রি করে ৪২ হাজার টাকা আয় করেছেন। রুনা বেগম বলেন, ব্রি-৩৪ স্থানীয় চিনিগুঁড়া বা কালিজিরা চালের মতোই সুগন্ধি, ফলনও দ্বিগুণ প্রায়। এ ধরনের ধান চাষে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। বর্তমানে রুনা বেগমের ৬টি গরুর মধ্যে ১টি ষাঁড় গরু দাম প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা, তিনি এ বছর গরু বিক্রি করে ৬০ হাজার টাকা আয় করবেন বলে আশাবাদী।

দরিদ্র রুনা বেগম ও তার স্বামী একসময় অন্যের বাড়িতে দিনমজুরি করে অভাবের সংসার চালাতো। এখন তাদের নিজের বাড়িতে গোয়ালভরা গরু, গোলাভরা ধান, উঠানভরা কবুতর ও হাঁস রয়েছে। এলাকার একজন সফল স্মার্ট কৃষাণী হিসাবে সবার কাছে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন তিনি। রুনা বেগমের এমন বহুমুখী সফলতায় গ্রামের মানুষের কাছে এখন তিনি স্মার্ট কৃষাণী হিসাবে পরিচিত।■

● লেখক: আরপিও-কৃষি, এসএমএপি প্রকল্প
রাজশাহী ও সওগী অঞ্চল, ব্যুরো বাংলাদেশ

ব্যুরো বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালকের

শোকবার্তা

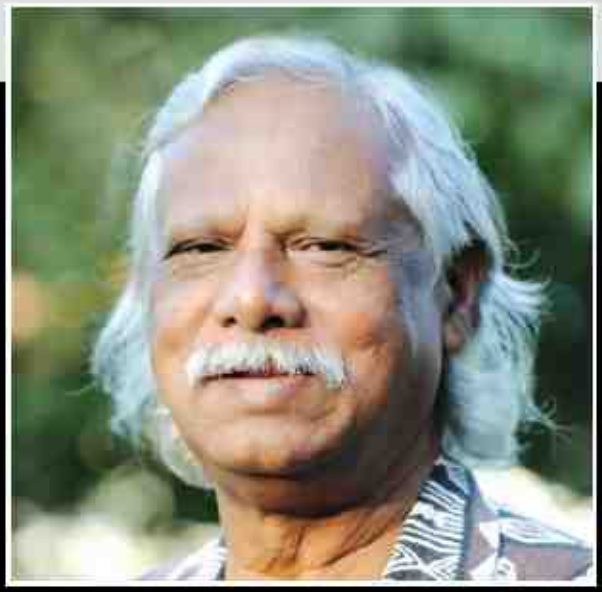

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী

শাহরিয়ার মো. ফিরোজ

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী গত ১১ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। দীর্ঘদিন ধরেই কিডনি জটিলতা ও বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। তার মতো একজন কিংবদন্তির চিরবিদায়ে আমি শোকাহত ও শোকস্তব্ধ। ব্যক্তিত্ব, নীতিবোধ, কর্মপ্রয়াস ও নিষ্ঠা একজন ব্যক্তিকে যে কিংবদন্তিতুল্য করে তোলে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ছিলেন তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর জন্ম ১৯৪১ সালের ২৭ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের রাউজানে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাজ্যে অধ্যয়নরত ডা. জাফরুল্লাহ অধ্যয়ন ও অভিজাত জীবন ত্যাগ করে ভারতের আগরতলায় মেলাঘরে গেরিলা প্রশিক্ষণ নেন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এসময় তিনি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ত্রিপুরায় 'বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল' গড়ে তোলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে এই হাসপাতাল তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলো। শুধু চিকিৎসাসেবাই নয়, যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বাঙালি চিকিৎসকদেরকেও তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংগঠিত করেছিলেন। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে গণমানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহযোগিতায় তিনি গড়ে তুলেছিলেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র। স্বল্পমূল্যে উন্নত চিকিৎসাসেবা, প্রশিক্ষিত কর্মীর মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, অসহায় নারীদের কর্মসংস্থান ও চিকিৎসা খাতে নানা উদ্ভাবনী অবদানের জন্য তার এই হাসপাতাল সব শ্রেণির মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য চিন্তাবিদ ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও ওষুধ ব্যবস্থাপনাকে গণমুখী করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। মূলত তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই দেশে জাতীয় ওষুধনীতি প্রণীত হয়, যার সুফল গত কয়েক দশক ধরে আমাদের ওষুধ শিল্প ভোগ করছে। তার উদ্যোগেই বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো স্বাস্থ্যবীমা চালু হয়েছিলো। বাংলাদেশের বেসরকারি উন্নয়ন খাতে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর অবদান বিশেষ স্মরণযোগ্য। তিনি ছিলেন ফেডারেশন অব এনজিও'স বা এফএনবি'র প্রতিষ্ঠাতা। দেশের এনজিও-এমএফআই সেক্টরে তার প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটির সঙ্গে আমি যুক্ত আছি দীর্ঘদিন ধরে। আমি এফএনবি'র সব সদস্য সংস্থার পক্ষ থেকে তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আমরা বিশ্বাস করি, ডা. জাফরুল্লাহর মতো একজন অকুতোভয়, প্রতিবাদী ও সাহসী মানুষের মৃত্যু নেই, তারা কর্মের মাধ্যমেই মানুষের মাঝে বেঁচে থাকেন যুগ যুগ ধরে।■

ব্যুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকালীন সংগঠক ও উপ-পরিচালক-প্রশিক্ষণ শাহরিয়ার মো. ফিরোজ গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ৭৪ বছর বয়সে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমার এক সময়ের সহকর্মী শাহরিয়ার মো. ফিরোজের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। শাহরিয়ার ফিরোজ ছিলেন একজন সৎ, আত্মত্যাগী ও ন্যায়পরায়ণ মানুষ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একজন নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক হিসেবে তিনি সম্পৃক্ত হয়েছিলেন ব্যুরো টাঙ্গাইল এর সাথে। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া গণমানুষের জীবনমান উন্নয়নে ব্যুরো টাঙ্গাইলকে একটি উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে তার সাংগঠনিক অবদানের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যুরো বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি তার সেই অবদানকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

শাহরিয়ার মো. ফিরোজ ব্যুরো টাঙ্গাইল এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত। এরপর তিনি তার নিজ জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিরে যান এবং প্রগতিশীল রাজনীতিতে সক্রিয় হন। ফিরোজ ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি। সমাজ বদলের সংগ্রামে অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া শাহরিয়ার ফিরোজ ছিলেন জেলা কৃষক সমিতিরও সভাপতি। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই পুত্র সন্তান রেখে গেছেন।

ব্যুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকালীন সংগঠক শাহরিয়ার মো. ফিরোজকে হারিয়ে আমি ও ব্যুরো পরিবার গভীরভাবে শোকাহত ও ব্যথিত। আমরা তার শোকসন্তপ্ত পরিবার ও স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন ও তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।■

বুরো বাংলাদেশের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নবনির্বাচিত গভর্নিং বডি

গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে বুরো বাংলাদেশের ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা। ডা. সাঈদা খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় সাধারণ পরিষদের ১৮ জন সদস্য এবং গভর্নিং বডির সদস্য সচিব সংস্থার নির্বাহী পরিচালক তাহির হোসেনসহ অপারেশনাল বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর সকল সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

সভার শেষ অংশে গভর্নিং বডির নবনির্বাচিত ৭ সদস্যের নাম ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল আউয়াল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার ইনাফি বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক মাহবুবা হক এবং এফএনবিবি'র কো-অর্ডিনেটর নিমাইচন্দ্র মন্ডল।

২০২৩-২৫ মেয়াদে এই গভর্নিং বডির চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হয়েছেন ড. এম এ ইউসুফ খান। ভাইস চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হয়েছেন ডা. সাঈদা খান ও কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম।

গভর্নিং বডির নির্বাচিত অন্য চার জন সদস্য হলেন: ড. মো. নূরুল আমিন খান (মাহবুব সালিক), মাহবুবা হাসানাত, আব্দুল লতিফ খান ও কাজী মোহাম্মদ শোয়েব।

বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন এফএনবি'র চেয়ার পুনর্নির্বাচিত

ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ এর চেয়ার হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। গত ৬ মে ২০২৩ তারিখে আশা'র প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে নির্বাচনের এই ফলাফল ঘোষণা করা হয়। একই সাথে ভাইস চেয়ার ও ট্রেজারার হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে ব্র্যাক পরিচালক কাজী আবু মোহাম্মদ মোর্শেদ ও আশা'র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. তৌফিকুল ইসলাম চৌধুরী।

১৯ সদস্য বিশিষ্ট এফএনবি'র জাতীয় কার্যনির্বাহী বোর্ডের অন্য নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ হলেন।

জাগ এর এএইচএম নোমান, আলোর সোশ্যাল সার্ভিসেস বাংলাদেশ এর মিনারা বেগম, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের মো. সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল, আসমুল এর আফতাবুর রহমান জাফরী, পপি'র মুর্শেদ আলম সরকার, রাজবাড়ী উন্নয়ন সংস্থা রাস এর মো. লুতফর রহমান লাবু, সংগ্রাম এর চৌধুরী মো. মাসুদ, এসআরপিভি এর শহীদুল হক, এসজিএস এর রাবেয়া বেগম, এসকেএস ফাউন্ডেশন এর রাসেল আহমেদ লিটন, টিএমএসএস এর সুশান্ত কুমার প্রামানিক, অপকা'র মো. আলমগীর, রাশি'র মো. ফজলুল হক খান, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'র মো. সাইফুল ইসলাম, আকশী উন্নয়ন সমিতির বেগম রোকেয়া এবং উন্নয়ন সংঘ এর রফিকুল আলম মোল্লা।

এফএনবি'র এই নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং বিশিষ্ট ব্যাংকার ও উন্নয়ন পরামর্শক জনাব ড. এমএ ইউসুফ খান ও অন্য নির্বাচন কমিশনার বাপ-এর নির্বাহী পরিচালক খোন্দকার রেবেকা সান-ইয়াত নির্বাচন পরিচালনা ও ফলাফল ঘোষণা করেন।

বার্ষিক সাধারণ সভার শুরুতে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীসহ অন্যান্য প্রয়াত সদস্যদের শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক প্রস্তাব পাস ও এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভার শেষে জাগরণের প্রধান নির্বাহী এএইচএম নোমান রচিত গ্রন্থ 'আল-কুরআনের সহজ সূত্র' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

মতবিনিময় সভায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব শেখ মো. মনিরুজ্জামান গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২২, শনিবার টাঙ্গাইলে বুরো বাংলাদেশের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন প্রকল্প ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির গ্রাহকদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত বুরো বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ও বিভিন্ন প্রকল্পের গ্রাহকদের সাথে যুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা নেন এবং বুরো বাংলাদেশের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করেন। ভবিষ্যতেও বুরো বাংলাদেশের গণমুখী কর্মসূচি ও প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীরা ফলপ্রসূভাবে উপকৃত হবেন বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। টাঙ্গাইল স্থানীয় কার্যালয়-২ এ অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন বুরো বাংলাদেশের পরিচালক-অর্থ এম মোশাররফ হোসেন, বিশেষ কর্মসূচি বিভাগের সমন্বয়কারী এসএমএএ রাকিব, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক-টাঙ্গাইল হারুন অর রশিদ এবং ঊর্ধ্বতন অফিস ব্যবস্থাপক বিদ্যুত খোন্দকার।

জাইকা প্রতিনিধির SMAP প্রকল্প পরিদর্শন

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) বাংলাদেশ অফিসের প্রধান প্রতিনিধি ইচিগুচি তোমোহিদে SMAP প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ইচিগুচি তোমোহিদে SMAP এবং Bangla-SHEP প্রকল্পের সুবিধাভোগী কৃষকদের সঙ্গে কৃষি খাতে অগ্রগতি সাধনে বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধানের উপায় নিয়ে মতবিনিময় করেন। তিনি SMAP প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের একই জমিতে 'মিশ্র ফসল' চাষ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, কৃষি বৈচিত্র্যকরণ এবং জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষিতে অর্থায়ন এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে SMAP প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এনজিও/এমএফআই সেক্টরে বুরো বাংলাদেশ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ করদাতা

জাতীয় ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা, ২০১০ (সংশোধিত) বিধান অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় আদেশক্রমে ১৪১টি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ২০২১-২২ কর বর্ষের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ট্যাক্স কার্ড ও সম্মাননা প্রদান করে। এনজিও/এমএফআই ক্যাটাগরিতে বুরো বাংলাদেশ-কে ২০২১-২২ কর বর্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ করদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ট্যাক্স কার্ড এবং সম্মাননা প্রদান করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিনিয়র সচিব জনাব আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাতীয় ট্যাক্স কার্ড ও সম্মাননা প্রদান করেন।

আরো উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব ফাতিমা ইয়াসমিন। বুরো বাংলাদেশ-এর পক্ষে সম্মাননা এবং ট্যাক্স কার্ড গ্রহণ করেন পরিচালক (অর্থ) মো. মোশারফ হোসেন। সংগঠনের পক্ষে আরো উপস্থিত ছিলেন মো. শফিকুল ইসলাম, হেড অব ফাইন্যান্স এবং বিদ্যুত খোশনবিশ, সিনিয়র অফিস ম্যানেজার।

ভাষা শহিদদের প্রতি বুরো বাংলাদেশের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও ভাষা শহিদ দিবসে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে বুরো বাংলাদেশ। একই সময় মাইক্রোফাইন্যান্স রেগুলেটরি অথরিটি-এমআরএ পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ পর্বেও অংশগ্রহণ করে বুরো বাংলাদেশ। এমআরএর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সংস্থাটির এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো. ফসিউল্লাহসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

বুরো বাংলাদেশে পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মো. মুস্তাফিজুর রহমান রাহাত, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক-ঢাকা উত্তর রফিকুল ইসলাম, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক-ঢাকা উত্তর শাহজাহান মিয়া, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক-ঢাকা দক্ষিণসহ সংশ্লিষ্ট এলাকা এবং শাখা ব্যবস্থাপকগণ।

এইচএসবিসি ও বুরো বাংলাদেশের মধ্যে ঋণচুক্তি

সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বুরো বাংলাদেশকে ১৮০ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা দেবে হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন (এইচএসবিসি)। দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং কৃষি ও এসএমই খাতের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা দিতে এই অর্থ পাচ্ছে বুরো বাংলাদেশ। বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় গত ১৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে। এই অনুষ্ঠানে এইচএসবিসির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন করপোরেট কান্ট্রি হেড রিয়াজ আহমেদ চৌধুরী, কান্ট্রি হেড অব ইন্টারন্যাশনাল নওশাদ একরামুল্লাহ, হেড অব লোকাল করপোরেট মাহবুব রেজা এবং ভিপি ও রিলেশনশিপ ম্যানেজার শাকব হাসান খান।

বুরো বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক-অর্থ এম মোশাররফ হোসেন, পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচি মো. সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রাণেশ বণিক, পরিচালক-অপারেশনস ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফারমিনা হোসেন এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক ও বুরো বাংলাদেশের চুক্তি স্বাক্ষর

বুরো বাংলাদেশ ও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি. এর মধ্যে সম্প্রতি ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস বিষয়ক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির আওতায় এমটিবি বুরো বাংলাদেশকে ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করবে। ব্যাংকটির গুলশান প্রধান কার্যালয় এমটিবি সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমটিবির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন্ড সিইও সৈয়দ মাহবুবুর রহমান ও ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন্ড সিডিও খালিদ মাহমুদ খান। বুরো বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক-অর্থ এম মোশাররফ হোসেন, পরিচালক-অপারেশনস ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফারমিনা হোসেন, অর্থ ও হিসাব বিভাগের প্রধান শফিকুল ইসলাম এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান।

চারঘাটে সবজি চাষে আনোয়ারের সাফল্য

নিরাপদ পদ্ধতিতে বিষমুক্ত শাকসবজি চাষ করে সাফল্য পেয়েছেন রাজশাহীর চারঘাটের কৃষক আনোয়ার হোসেন। তিনি বুরো বাংলাদেশের একজন সদস্য। উপজেলার শলুয়া ইউনিয়নের বালুরদিয়া এলাকায় স্ত্রী শাহিদা বেগমকে সঙ্গে নিয়ে ১৫ কাঠা জমিতে লাউ ও লালশাক চাষ শুরু করেন তিনি। বুরোর কাছ থেকে মাত্র ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এখন পর্যন্ত তিনি আয় করেছেন ৬৫ হাজার টাকা।

সবজি চাষের জন্য গত বছর অক্টোবর মাসে আনোয়ারের

স্ত্রী শাহিদা বেগম বুরো বাংলাদেশের বানেশ্বর শাখা থেকে জাইকা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত এসএমএপির আওতায় এক লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বুরো বাংলাদেশের আঞ্চলিক কৃষি কর্মসূচি সংগঠক আব্দুর রহমান বিষমুক্ত নিরাপদ সবজি চাষের জন্য এলাকার কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করেন। হাতেকলমে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে জৈব বালাইনাশক তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিনামূল্যে ফেরোমেন ফাঁদ, হলুদ আঠালো পেপার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সহায়তা দেন কৃষকদের। বুরো'র এই উদ্যোগের ফলে কৃষক আনোয়ার হোসেন আব্দুর রহমানের দেখানো পদ্ধতিতে সবজি চাষ শুরু করেন। তিনি জানান, ১৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে ইতিমধ্যেই ৬৫ হাজার টাকা সবজি বিক্রি করেছি। আরো ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকার শাক ও লাউ বিক্রি হবে। আমার অর্ধেক জমিতে গরুকে খাওয়ার জন্য ঘাস চাষ করেছি। কিন্তু কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শে বাকি জমিটুকুতেই বিষমুক্ত সবজি চাষ করে সাফল্য পেয়েছি।

অপরচুনিটি ইন্টারন্যাশনাল জার্মানির প্রতিনিধি দলের বুরো বাংলাদেশের মৌলিক স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন

৩১ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত Opportunity International Germany-এর একটি প্রতিনিধি দল রংপুর অঞ্চলে বুরো বাংলাদেশের মৌলিক স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন আন্তর্জাতিক এই সংস্থার প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর ইয়োটা ওয়েরেমেন্ট এবং সংস্থাটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও জার্মান সংগীত শিল্পী আন্দ্রেস ডোমেনিক ওঁইস। তারা রংপুর অঞ্চলের শ্যামপুরহাট ও তাঁরাগঞ্জ শাখায় তত্ত্বাবধানে মৌলিক স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন এবং সেবা গ্রহণকারীদের সাথে তাদের অভিজ্ঞতা, শিখন ও এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন।

পাঁচ দিনের পরিদর্শন শেষে ইয়োটা ওয়েরেমেন্ট তার অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, মাঠ পর্যায় থেকে সেবা গ্রহণকারীদের সাথে সরাসরি মতবিনিময়ের মাধ্যমে যে তথ্য ও ধারণা তিনি পেয়েছেন তা পরবর্তীতে এই প্রকল্পকে আরো সমৃদ্ধ করতে সহায়ক হবে। পাশাপাশি এই প্রকল্পের কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারী ও কিশোরীদের মধ্যে মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত যে সচেতনতা ও এর চর্চা গড়ে উঠেছে তা দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। জার্মান সংগীত শিল্পী আন্দ্রেস ডোমেনিক ওঁইস জানান, প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে এসে তিনি মুগ্ধ। বিশেষ করে এ দেশের গ্রামীণ অঞ্চল ভ্রমণ তার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে। আন্দ্রেস একজন ফটোগ্রাফারও। তিনি মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্পের উপকারভোগীদের ছবি তুলেন এবং তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। Opportunity International এর প্রতিনিধি দলের সাথে ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের বিশেষ কর্মসূচি বিভাগের সমন্বয়কারী এনামুল রকিব, মৌলিক স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্পের ব্যবস্থাপক মো. আসাদুজ্জামান ও প্রশাসন বিভাগের ঊর্ধ্বতন অফিস ব্যবস্থাপক বিদ্যুত খোন্দকার। রংপুর বিভাগের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান রিপন, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক বাহাদুর আলম এবং সংশ্লিষ্ট এলাকা ও শাখা ব্যবস্থাপকসহ বুরো বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্মীরা এই প্রতিনিধি দলের সাথে মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, প্রাথমিক স্বাস্থ্যশিক্ষা ও এর চর্চার মাধ্যমে গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে বুরো বাংলাদেশ ২০১৯ সাল থেকে Australian Aid এবং Opportunity International Australia-এর সহযোগিতায় মৌলিক স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে Opportunity International Germany এই কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত হয়। ইতিমধ্যে ৩৫২,৬৫৪টি পরিবারের কাছে মৌলিক স্বাস্থ্যশিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া হয়েছে এবং ২২০,৮৮৩টি পরিবারের মাঝে কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের আওতায় ৬টি বুরো কমিউনিটি হেলথ কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সাশ্রয়ী মূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য, রোগ নির্ণয় ও টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

এছাড়া বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে ১ হাজার জন কিশোরীকে ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সচেতন করা হয়েছে যাতে তারা আরো কার্যকরভাবে বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা করতে পারেন এবং তাদের সমবয়সি কিশোরী ও নিকট আত্মীয়দের এ বিষয়ে সচেতন করতে পারেন।

আনোয়ার উল আলম শহীদ স্মরণে মিলনায়তন উদ্বোধন ও স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ

গত ১০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে পালিত হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা, একাত্তরের কাদেরীয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রধান, সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত প্রয়াত আনোয়ার উল আলম শহীদ এর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী। এ উপলক্ষে সুরো বাংলাদেশ ও আনোয়ার উল আলম শহীদ এর পরিবারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত একটি স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় সুরো বাংলাদেশের মানসম্পন্ন উন্নয়ন কেন্দ্র টাঙ্গাইলে। স্মরণ সভার শুরুতে নবনির্মিত এই মানসম্পন্ন উন্নয়ন কেন্দ্রের একটি সুপরিসর মিলনায়তনের নামকরণ করা হয় প্রয়াত আনোয়ার উল আলম শহীদ এর নামে। একই অনুষ্ঠানে সুরো বাংলাদেশের উদ্যোগে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ 'রণাঙ্গনের রণদূত। আনোয়ার উল আলম শহীদ' এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের বক্তব্যে প্রয়াত আনোয়ার উল আলম শহীদের বর্ণাঢ্য জীবন সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি তার সরল ও সাধারণ ব্যক্তি জীবনের কথাও স্মরণ করেন।

সুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন জাতীয় সংসদ সদস্য আতাউর রহমান খান ও হাসান ইমাম খান, জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিনুল হক দোহেল, সরকারি সা'দত কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ কবি মাহবুব সাদিক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মনজুরুল আলম হীরা, আনোয়ার উল আলম শহীদ এর স্ত্রী ও সুরো বাংলাদেশের ভাইস চেয়ারপার্সন ডা. সাবিনা খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মো. এনায়েত করিম, সুরো বাংলাদেশের পরিচালক- অর্থ এম মোশাররফ হোসেন, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা খন্দকার নাজিম উদ্দিন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপতি ও টাঙ্গাইল ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ, সাধারণ গ্রন্থাগারের সদস্য সচিব কবি মাহমুদ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা ও গণসঙ্গীত শিল্পী এলেন মল্লিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউনুস আলী, প্রত্যয় সম্পাদক ফেরদৌস সালামসহ আরো অনেকে।

এ ছাড়া সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের হারুন হাবিব, চলচ্চিত্র প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান, সমাজ ট্রাস্টের সদস্য সচিব বিধান চন্দ্র পাল, প্রকৌশলী মনিরুজ্জামান বাবু ও আনোয়ার উল আলম শহীদের প্রবাসী কন্যা র‍্যামোনা আনোয়ার ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রত্যয় এর নির্বাহী সম্পাদক বিদ্যুত খোশনবীশ।

শাহিদা আক্তার, সংকরদি, রাজৈর, মাদারীপুর

শাহিদা আক্তার বুরো বাংলাদেশের গ্রাহক হয়েছেন এক বছরও হয়নি। স্বামী আব্দুল সামাদ আগে ছোট একটি অটোরিকশা চালাতেন। যে আয় হতো তা দিয়ে পাঁচজনের সংসার চালানো খুব একটা সহজ ছিলো না। কিন্তু অসচ্ছলতার মাঝেও দিন বদলের স্বপ্ন দেখতেন শাহিদা। সেই স্বপ্নের রূপায়ণের জন্য তিনি খুঁজে নিয়েছিলেন বুরো বাংলাদেশকে। ঋণের টাকায় স্বামীকে কিনে দিয়েছেন বড় একটি অটোরিকশা। এতে আগের চেয়ে উপার্জন বেড়েছে, সংসারে সচ্ছলতা এসেছে। শাহিদার এক ছেলে ও দুই মেয়ে, সবাই স্কুলে যায়। সংসারের আয় বাড়ানোর জন্য দুই কাঠা জমি কেনার পাশাপাশি বর্গা নিয়েছেন আরো দশ কাঠা। এই জমিতেই ঋতুভেদে বিভিন্ন ফসল আবাদ করেন তিনি। তবে এতোটুকুতেই থেমে থাকতে চান না শাহিদা। পরেরবার ঋণ নিয়ে একটি উন্নত জাতের গাভি কিনতে চান তিনি। তার বিশ্বাস, একটি গাভি একদিন পরিণত হবে একটি খামারে। শাহিদার মতো নিম্ন আয়ের নারীদের এমন ছোট ছোট প্রয়াসের সাথেই আছে বুরো বাংলাদেশ।

আলোকচিত্র ● বিদ্যুত মোশনবীশ

বুরো বাংলাদেশ এর রেমিটেন্স পার্টনার

সরকার ঘোষিত ২.৫% প্রণোদনাসহ প্রিয়জনের পাঠানো
রেমিটেন্সের টাকা গ্রহণ করুন
বুরো বাংলাদেশের যে কোন শাখা থেকে।

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | এক্সপ্রেস মানি | প্লাসিড | ট্রান্সফাস্ট | ক্যাশ এক্সপ্রেস

বি এ এক্সচেঞ্জ (UK) | আল জাদিদ | মার্চেন্টট্রেড | প্রভু মানি ট্রান্সফার | সিবিএল মানি ট্রান্সফার

ইজেড রেমিট | রিয়া | মানিগ্রাম | এশিয়া এক্সপ্রেস এক্সচেঞ্জ | ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ

01733220859, 01733220914
01733220913 01762621999

হুন্ডি বা অবৈধ উপায়ে টাকা প্রেরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ